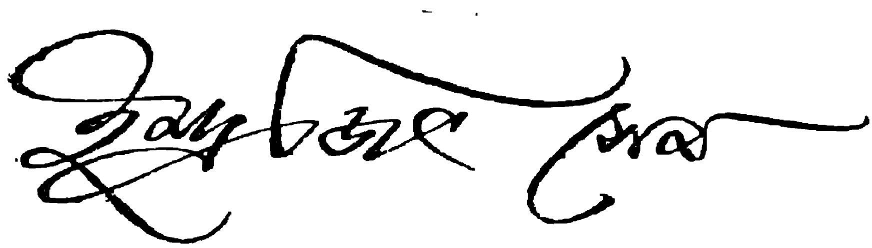
আরব-কাঁটা ইজরায়েল

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯



আরব-কাঁটা ইজরায়েল



প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩৭১
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
প্রচ্ছদ ও আলোকচিত্র মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯
গ্রন্থণ
প্রহ্লাদ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
কলিকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীবঙ্কিমবিহারী রায়
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭।এ, বলাই সিংহ লেন
কলিকাতা-৯।

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ও

শ্রীসুনীলকুমার মণ্ডল

বন্ধুবরেষু

ঘটনাচক্রেই আমি জলন্ত আরব-ইহুদি সমস্যার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলাম। একবার নয়, দুবার—বাইশ বছরের ব্যবধানের ঘটনাবলীতে। দুবারই আমার ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের, কিন্তু ঘটনার পারম্পর্য আমাকে দুবারই এই বিরাট নাটকের এক ক্ষুদ্র ভূমিকায় এনে দাঁড় করিয়েছিল।

আরবভূমিতে ইহুদি-রাষ্ট্র ইজরায়েল প্রতিষ্ঠা পাশ্চাত্য শক্তির কূটনীতির খেলা। আরব-ইহুদি বিরোধ এক দুঃস্বপ্নের ইতিহাস এবং তার স্রষ্টা মুখ্যত ব্রিটেন ও আমেরিকা। ইউরোপে ইহুদি-বিদ্বেষ এবং বিশেষতঃ নাৎসি-জার্মানিতে ইহুদি-নিধন মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। মানবিক অধিকারে বঞ্চিত ইহুদিরা পশ্চিমী রাষ্ট্র এবং মানুষের ওপর সমস্ত বিশ্বাস স্বাভাবিক কারণেই হারিয়ে ফেলেছিল। তাই তারা চেয়েছিল তাদের সম্প্রদায়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র—যেখানে তারা অত্যাচার, অবিচার, অপমান এবং নির্মূল হওয়ার হাত থেকে আত্মরক্ষা করে সুস্থ ও স্বাভাবিক মানব-জীবন যাপন করতে পারবে। সেইজন্যই তাদের জিয়ন-আন্দোলন এবং তারই ফলস্বরূপ ইঙ্গ-আমেরিকান আশীর্বাদ-পূত আরবভূমিতে আরব অধিবাসীদের দেশচ্যুত করে ইহুদি-রাষ্ট্র ইজরায়েল। ইঙ্গ-মার্কিন খল-নীতি আরববাসীরা ভুলতে পারে নি। তারা মেনে নিতে পারে নি এবং মেনে নেয়ও নি ইজরায়েলকে। ইহুদিরাও আরবভূমিতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে আরবদের সহজমনে গ্রহণ করে নি। যে নির্যাতন তারা ভোগ করেছে নাৎসি-জার্মানিতে তারই নতুন সংস্করণ তারা প্রয়োগ করেছে আরবদের উৎখাতে।

মাত্র উনিশ বছরের রাষ্ট্র ইজরায়েল। তারই মধ্যে তিনবার তারা সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে আরব-রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে এবং তিনবারই তারা পাশ্চাত্য শক্তির সমর্থনে জয়ী হয়েছে। ১৯৬৭ সনের যুদ্ধে তাদের জয়লাভ সামরিক ইতিহাসে বিরল। মাত্র ছয় দিনের যুদ্ধে ইজরায়েল তার রাজ্যের আয়তন চতুর্গুণ বৃদ্ধি করে ফেলে। কিন্তু আরবরা পাশ্চাত্য শক্তির বিশ্বাসঘাতকতা ভোলে নি, ভুলবেও না।

১৯৪৫ সনে ছায়াছবির কাজে প্যালেষ্টাইনে গিয়ে আমি প্রত্যক্ষ করেছি আরব-ইহুদি বিদ্বেষ, তাদের সংগ্রাম। ১৯৬৭ সনে বেইরুতে থেকে তাদের আবার সংগ্রামে লিপ্ত হতে দেখেছি। দুবারই যাদের সঙ্গে মিশেছি, যাদের সঙ্গে কথা বলেছি, যাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়েছি, তাদেরই চোখ দিয়ে দেখা আমার এই ছবি। সুতরাং এ ছবি পূর্ণাঙ্গ না-ও হতে পারে এবং এ ছবির আর এক দিক থাকাও স্বাভাবিক। প্রচারের চাতুরিতে ও ব্যাপকতায় এবং আধুনিক রাজ-নীতির কূটচক্রে জনসাধারণের আপাত-দৃষ্টি ক্ষণ-বিভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু প্রচারিত ঘটনাই সবসময় সত্যকার ইতিহাস নয়।

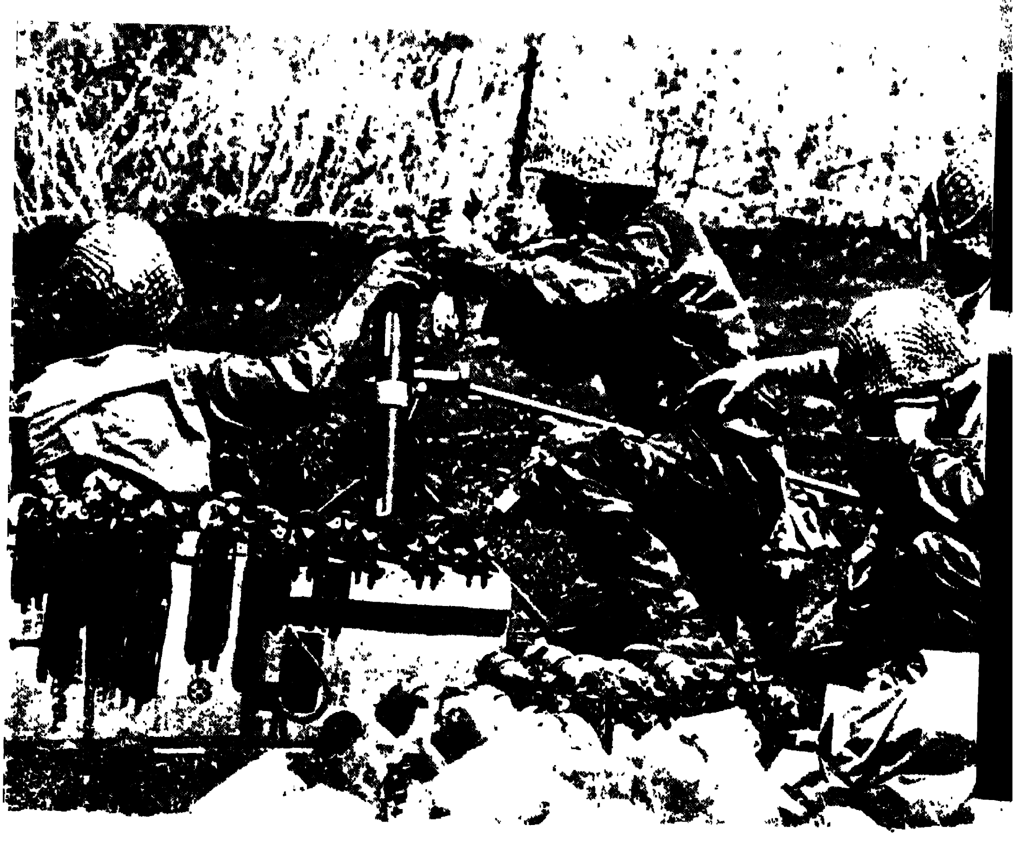
ইতিহাস মিথ্যা বলে না।

ইন্দ্রজিৎ সেন

ইউনিয়ন পার্ক, চেম্বুর,
বোম্বে।

উত্তর সিনাই-এর এল আরিশের উত্তপ্ত বালুর ওপরে
সতর্ক প্রহরাধীনে উপবিষ্ট বন্দী মিশরীয় সৈন্য।





সিনাই মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ একটি কূপ দেখতে পাওয়ায়
পরাজিত ও হতাশ্বাস আরব সৈন্যদের আনন্দ প্রকাশ।





জনসন

এশকোল

কোসিগিন

উইলসন









প্রথম সারি । নাসের, হুসেন, ফয়জল

দ্বিতীয় সারি । আরিফ, মেহগাব, বুতেফ্লিকা



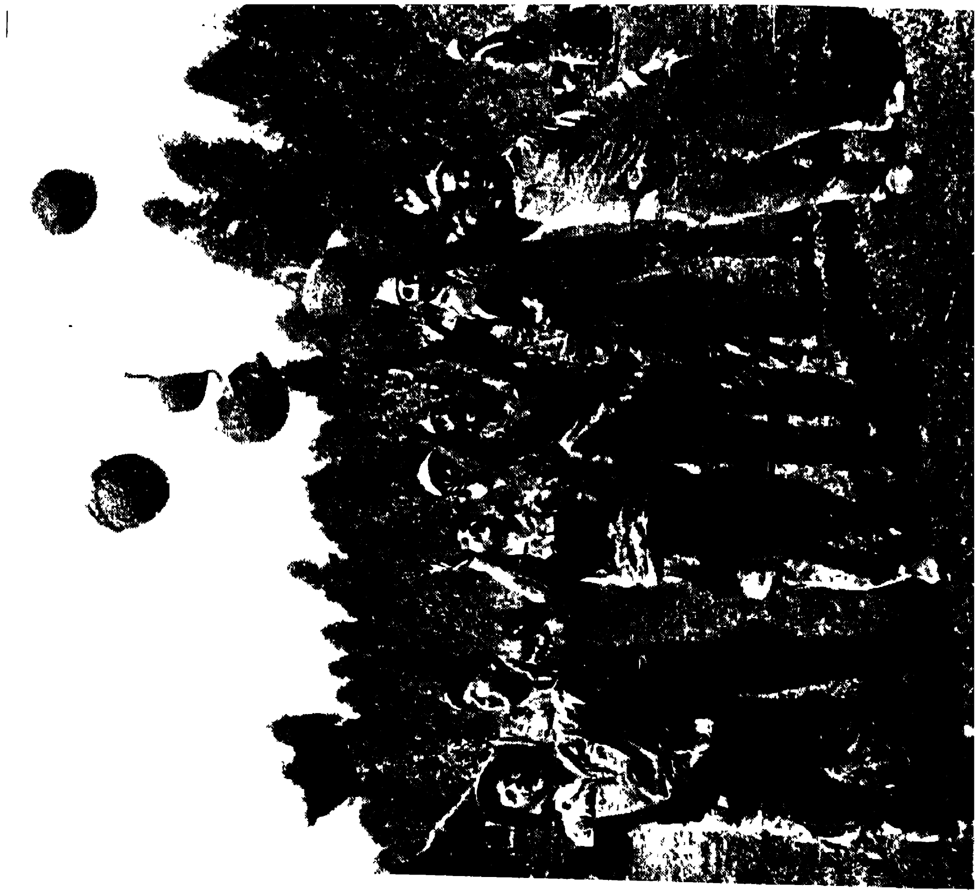
কায়রো থেকে শেষ ট্রেন।

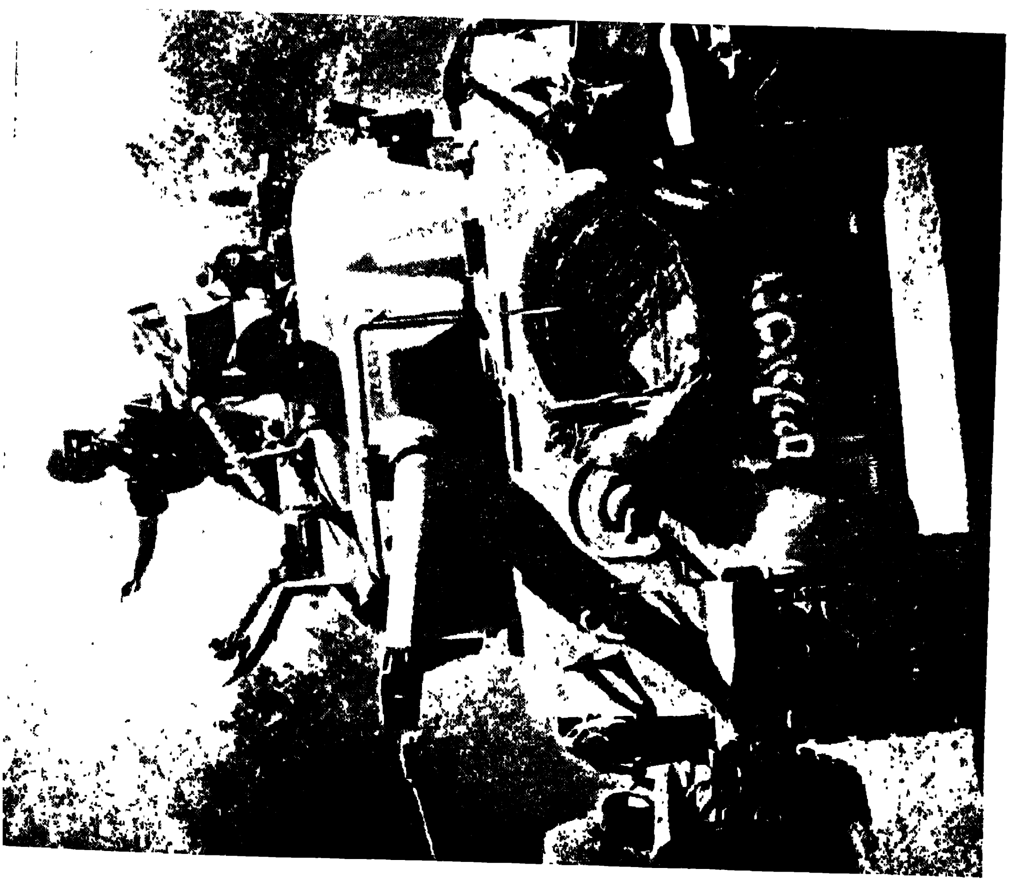
ইজরায়েলি আক্রমণে উৎখাত দুই আরব বাস্তুহারা

সিনাই মরুভূমির ভেতর দিয়ে চলেছে [illegible] [illegible] অভিমুখে



[illegible]







'ডোম অব দি রক'-এর ওমর মসজিদের ভেতর দিয়ে আরবদের হাত মাথায় তুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক দৃশ্য।



জেরুজালেম অধিকারের পর ওয়েলিং ওয়ালে প্রার্থনারত ইহুদী।

সদ্য-থামা ইতালিয়ান সুরের রেশ তখনও মৃদু পদক্ষেপে যেন পায়চারি করছে।

কাসিনো দ্য লিবাঁর রাত্রির স্বপ্নময় পরিবেশ। টেবিলে টেবিলে পান-পাত্র ঘিরে সর্ববয়সের পুরুষ, সঙ্গ দিতে রয়েছে পেশাদারী নারী—বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন দেশের—নাইট ক্লাবেরই পোষ্যা। চাপা গুঞ্জন, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের উচ্ছল হাসি এবং স্খলিত পুরুষ-কণ্ঠে হ্রেষাধ্বনি।

তবু···তবু সেই ইতালিয়ান সুরের তখনও নীরব পদচারণা। ঘর জুড়ে, মন জুড়ে।

বাইরে তখন গভীর নীল রাত্রির চোখ বুজে এসেছে। ঘরকন্না-ক্লান্ত সুন্দরী গৃহস্থবধূর গভীর রাত্রির মধুর অলস অবিন্যস্ত শয়নের মত নিষ্পাপ, চিত্রময়। নক্ষত্রের চোখের সমস্ত প্রশ্ন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। প্রশান্তির মসলিনে অবগুণ্ঠিত বাইরের রাত।

নাইট ক্লাবের ভেতরে রক্তে উন্মাদনা।

নাচের বাজনা বেজে ওঠে। প্রায় সমস্ত টেবিল থেকে জোড়ায় জোড়ায় নর-নারী উঠে দাঁড়ায়। অনেকেরই সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি নেই, সঙ্গিনীদের বাহুতে নিজেদের দেহের ভার ও ভর সমর্পন করে পিসার হেলানো টাওয়ারের মত কোনরকমে খাড়া থাকা। নাইট ক্লাব-রক্ষিতা, প্রসাধন-রঞ্জিতা সুন্দরীদের বিলোল কটাক্ষ, আমন্ত্রক হাসি আর দেহ-বল্লরীর ফুল্ল আনন্দ-ভরা সনির্বন্ধ অনুরোধে

তাঁদের স্কচ-রূপী মহাসমুদ্রে সুদূর দুরন্ত অভিযানে বেসামাল অবস্থা। দুলিতেছে ঘর, টলিতেছে পা, ভাণ্ডারী হুঁসিয়ার!

এক কোনে একটি টেবিলে আমি একা, আর তিনটি শূন্য চেয়ার নিয়ে বাসর-জেগে বসে আছি। একটু পরেই আসবে ডাটন আর আলি মহম্মদ—আশ্বাস দিয়ে গিয়েছে। বেরিনও ঠিক হাজির হবে। মিনিট খানেকের জন্য এসে বসেছিল ধরমপাল সুদ, কিন্তু একটি আরব-ললনার কুক্ষিগত হয়ে সে কোথায় চলে গেছে। ভালই হয়েছে, হাড়-জ্বালানো ছেলে—ওর ব্র্যাভেডোর কাহিনী শুনতে গেলে কান লাল হয়ে ওঠে।

সামনের টেবিলের ওপরে গেলাসে বিয়ারের ফেনা অনেকক্ষণ মরে গেছে, তবুও অর্ধেক শেষ হয় নি। ধর্মভীরু মুসলমানদের একেবারে বাদ দিলে এ-রকম নাইট ক্লাবে আমার মত শুধু বিয়ার-পায়ী খরিদ্দার সুদুর্লভ, কিন্তু আমি বিয়ারের চেয়ে আর কোন কড়া পানীয় সহ্য করতে পারি না। অবশ্য বিয়ারও আমার ধাতে সয় না। ছেলে-বেলা থেকে চিরতার জলে আমার বিতৃষ্ণা এবং ভয়—বিয়ারও সেই চিরতার জল ছাড়া আমার কাছে আর কিছু মনে হয় না। মুখে ঠেকানো মাত্রই কেমন তেতো আর বিস্বাদ লাগে—গেলাসটা নামিয়ে রাখি। এক গেলাস নিয়ে সারা রাত কেটে যায়।

অবশ্য এ ছাড়াও পানীয় আছে। আমার পাশের টেবিলের শেখ সাহেবের মত তিনটি হুরি পরিবেষ্টিত হয়ে আইস-কোল্ড কোকা-কোলা খেতে পারি। কিন্তু আমি তো আর কুয়াইত, কাতার বা সৌদি আরবিয়ার তেল-মসৃন অর্থ হাতে নিয়ে এখানে আসি নি যে বোকার মত কলকাতার পানের দোকানের চার আনার জল একশ' টাকায় চেখে দেখব! শেখ সাহেবদের পক্ষে সবই সম্ভব। প্রচুর টাকা ফেলে কোকা-কোলা গিলে প্রচুর টাকা ছড়িয়ে এই হুরিদের মনোরঞ্জন করে চা-চা নাচের শেষে লায়লা জারিনের ঘরে একটা ঢাউস মানিব্যাগ নিয়ে গিয়ে হাজির হবেন। পকেটে একটা দামী

হীরের নেকলেসও থাকতে পারে। লায়লা বা শাহজাদী বা সায়রার নেকনজরে পড়ার জন্য চাই ট্রেডমার্ক, মানিব্যাগে যা আঁকা থাকে। সবই তকদির কী খেল। এই শেখ সাহেবরা আমাদের সেই স্বপ্নময় ঐতিহাসিক আরব-বেদুইনের অকৃত্রিম বংশধর। এঁদের পূর্বপুরুষেরা উটের পিঠে ঘর-সংসার চাপিয়ে আরব উপদ্বীপের উষর মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতেন। জীবন-নির্বাহের জন্য কি দুরন্ত সংগ্রাম তাঁদের করতে হয়েছে। যাযাবরী মন যখন স্থিতিশীল হল, তখনও অবস্থার পরিবর্তন হয় নি। পাহাড়, পাথর আর বালির সমুদ্রে কি ফসল তাঁরা ফলাতে পারেন? সমগ্র আরব উপদ্বীপ যুগ যুগ ধরে জীর্ণাশীর্ণা মুমূর্ষু এক বৃদ্ধার মত পৃথিবীর আনন্দোজ্জ্বল উৎসবমুখর বাসরঘরের এক কোনে পড়ে। চোখ তুলে একবার তার দিকে তাকানোরও কারও ফুরসৎ নেই।

হঠাৎ সেই বালির নীচে পাওয়া গেল খনিজ তেল। ব্রিটিশ ব্যবসায়ী এল, আমেরিকান ব্যবসায়ী এল—ব্যাঙ্কের টাকা জলের মত ঢালতে লাগল সেই আরব-মরুভূমির বুকে। শহর বসল, বাজার বসল—বেদুইনের আদি দেশের রূপ বদলে গেল। আর বদলে গেল এই দেশের লোকেরা। এখন তাদের পকেটে অর্থের অভাব নেই, এখন আর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রমের বালাই নেই। সৌদি আরব একঘেয়ে লাগলে চলে এস বেইরুতে, চলে এস এখানকার নাইট ক্লাবে—ফ্লোর শো, চা-চা ড্যান্স, বল, বেলি ড্যান্স এবং তার চেয়েও বড় লায়লা, শাহজাদী, সায়রা, নাহরিন অপেক্ষা করে আছে। ফেল কড়ি, মাখো তেল—এরা কি তোমার পর!

পাশের টেবিলের শেখ সাহেবের রঙদার মজলিসে মনে মনে ঈর্ষান্বিত যে হচ্ছিলাম না,—তা নয়, কিন্তু কোথায় বহু-ক্রোড়পতি শেখ সাহেব আর কোথায় ফিল্ম-ক্যানভাসার আমি ইন্দ্রজিৎ সেন! টেবিলের ওপর ছায়া পড়ে। চমকে উঠি এবং এবার বিপন্নই বোধ

করি। নিঃসঙ্গ আমাকে সঙ্গদানে উৎসুকা এক নাইট ক্লাব-সুন্দরীর আবির্ভাব। ইতিমধ্যে দুজনকে নির্লজ্জের মত বিদায় দিয়েছি। ইনি তৃতীয়া।

সামনের চেয়ারে হাত দিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে-পড়া অধোন্মুক্ত ব্লাউসের ফাঁক দিয়ে সুপুষ্ট বক্ষের কারুকার্য প্রদর্শিনী এই মায়াবিনী স্প্যানিশ সুন্দরীর হাসিতে মুক্তো ঝরে পড়লেও সে মুক্তো কুড়োতে আমার সাহস হয় নি। আগে থেকেই আমাকে হার্ব ডাটন সাবধান করে দিয়েছে। ডাটন অভিজ্ঞ—বহুদেশ, বহু জীবন তার দেখা। দেশ দেখাই যেন তার পেশা। আমি বিদেশ ভ্রমণে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। প্রায় বাইশ বছর আগে প্রথম যৌবনে একবার কয়েকদিনের জন্য মাত্র এসেছিলাম মধ্য-প্রাচ্যে, এবারও মাত্র কয়েকদিনের জন্য। মাত্র এই কয় বছরে কি বিরাট পরিবর্তন! এই দেশ যেন আর চিনতে পারি না, লোকদেরও নয়।

ডাটনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই সে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল —এই সুন্দরীদের টেবিলে বসিয়েছ কি মিটার বেড়ে একেবারে দ্বিগুণ তিনগুণ হয়ে যাবে। এক লিরা যার দাম, চোখের নিমেষে তা হবে তিন লিরা। ফোর্ড কিংবা রথ্‌স্‌চাইল্ড হও তো সুন্দরীদের চোখে চোখ রেখ। নয়তো ভ্রমর-কালো হরিণী-চোখের ফাঁদে পড়ো না।

সুতরাং বোকার মত আবার আমায় ঘাড় নাড়তে হল। আমি এদের ভাষা বুঝি না, ইংরাজিতে কোন রকমে কাজ চালাই। তাই ইংরাজি অনভিজ্ঞের সঙ্গে আমার মূক-অভিনয় করা ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই। মাঝে মাঝে এদের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে দু'একটা চোস্ত হিন্দি গালাগাল ঝাড়তে ইচ্ছা করে, কিন্তু চুপ করে থাকি— বেরসিকের দল, আমাদের রাষ্ট্রভাষার কদর এরা কি বুঝবে?

এবারে কিন্তু সুন্দরীটির মুখে আর মুক্তো দেখা গেল না; সুন্দর চোখ দুটোতে বিষধর সাপের হিংস্রতা। নাছোড়বান্দা। যে-মেয়ে সমস্ত

পৃথিবী ঘুরে এসে আমার দিকে নজর দেয় তার চেয়ে হতভাগিনী বোধহয় পৃথিবীতে আর কেউ নেই, কারণ অর্থের আর রূপের কোন কৌলিন্যই আমার নেই।

কমলির মত মেয়েটি বোধহয় তার শেষ ভরসা আমাকে ছাড়তে চাইল না। বসার জন্য তাকে চেয়ার টানতে দেখে আমার হৃদ্‌কম্প সুরু হয়ে গিয়েছিল, আমার পকেটের অবস্থা সেই স্প্যানিশ সুন্দরী জানবে কি করে?

পালাব কি পালাব না ভাবছি, এমন সময় দূর থেকে হেঁড়ে গলায় চীৎকার—হেই—অফ্‌—অফ্‌—

মনে সাহস ফিরে এল। ডাটনের গলা। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল ডাটন, সঙ্গে আলি মহম্মদ।

ডাটনের প্রায় সাত ফুট লম্বা চেহারা দেখে এবং বিকট হুঙ্কার শুনে স্প্যানিশ সুন্দরী রণে ভঙ্গ দিল। দাঁতে দাঁত চেপে আমার দিকে তাকিয়ে অস্ফুট-স্বরে যে কথা বলল তা নিশ্চয়ই বাংলা শ-বাচক কোন প্রিয় সম্ভাষণ হবে।

ডাটন আর আলি মহম্মদ দুটো চেয়ার টেনে বসল।

বিয়ার! এঃ—নাক মুখ কুঁচকিয়ে বলে উঠল ডাটন।—তবু ভাল যে তুমি নাইট ক্লাবে বসে সেক্রেড গ্যাঞ্জেস ওয়াটার অর্ডার দাও নি। উন্নতি হয়েছে, আরো হবে।

আলি হেসে উঠল হা হা করে।

আমারও হাসতে হয়।

এদের দুজনের সঙ্গেই আমার আলাপ কায়রো থেকে বেইরুতে আসার পথে, প্লেনে। তিনজনেই আমরা কমার্শিয়াল ট্র্যাভেলার, আরও সহজ ভাষায় ক্যানভাসার—যদিও জাতে উঁচু, কারণ আমাদের ক্যানভাসিং দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে। অবশ্য ডাটন আমাদের মধ্যে জাতে কুলে সবচেয়ে উচ্চশ্রেণীর—পৃথিবীখ্যাত আমেরিকান ফার্মাসি-উটিক্যাল ও কেমিক্যাল কোম্পানির লোক। প্রচুর আয়, প্রচুর

হাত-খরচ পায়। বেইরুতে থাকে ফিনিসিয়া হোটেলে, যার এক দিনের খরচে আমার সারা মাস চলে যায়।

আলি মিশরের একটি এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির ট্র্যাভেলার। আর আমি ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পের। আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যে হিন্দী ফিল্মের চাহিদা বাড়ানো, ব্যবসায়িক সম্প্রীতি রক্ষা এবং আরব-ভারত যৌথ প্রচেষ্টায় নিয়মিত ছবি তোলার ব্যাপারে অনুসন্ধান করে বোম্বেতে গিয়ে রিপোর্ট পেশ করাই আমার বর্তমান কাজ।

সব দেশেই এক জাতের লোক একত্রে থাকতে চায় এবং নিজেদের স্বতন্ত্র কলোনি গড়ে তোলে। কলকাতায় আমরা দেখেছি দক্ষিণ ভারতীয়েরা একই পাড়ায় সন্নিবিষ্ট, গুজরাতিরা এক পাড়ায়, মাড়োয়ারিরা এক জায়গায়। বাঙলাদেশের বাইরে বাঙালীরাও কাছাকাছি একই পাড়ায় তাদের বাসা বাঁধে। সেইরকম দেশে বিদেশে যেখানেই যান না কেন, একই ধরনের কাজের লোক একত্রিত হয়ে পড়বেনই। চেহারা দেখলেই স্বজাতিকে চেনা যায়। আমরা তিনজনই কমার্শিয়াল ট্র্যাভেলার—সুতরাং আমাদের জগৎ এক। এই স্টেশনে সমস্ত কমার্শিয়াল ট্র্যাভেলার এসে থামবেই।

প্রথম দিনই আলাপ হয়েছিল ফরাসী লাকোস্তে, ইংরেজ রবার্ট শার্প, স্কচ ম্যাকগুয়ের ও জার্মান অটো ভেইসের সঙ্গে। তাদের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। দুদিন দম নেবার ইচ্ছা থাকলেও সাহসে কুলোচ্ছে না। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব জটিল হয়ে আসছে। পশ্চিম আকাশে একটা কালো মেঘ ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তেই সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলতে পারে। তারা নাম-ঠিকানা লিখে হাত মুচড়ে বিদায় জানিয়ে চারদিকে ছিটকে পড়েছে। সবে সন্ধ্যায় আলাপ হয়েছে বেরিনের সঙ্গে। জাতে ইহুদি, দেশ লেবানন। জিয়নিষ্ট আন্দোলনে বিশ্বাসী। ইজরায়েল তার তীর্থস্থান; কিন্তু খাস মিশর-অধিবাসী আলি মহম্মদের সঙ্গে তার বন্ধুত্বে কোন খাদ নেই। দুইদেশের মধ্যে চরম তিক্ত রাজনৈতিক কলহ কমার্শিয়াল

ট্র্যাভেলারের ধর্মে আঘাত হানতে পারে নি।

আলি জিজ্ঞাসা করল—বেরিন এখনো আসে নি?

আর বেরিন আসবে?—উত্তর দিল ডাটন।—তোমরা যে-রকম ইজরায়েলকে ধমকাতে স্থুরু করেছ, তাতে বেরিন কেন—আমার প্রাণ নিয়েই টানাটানি!

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন, কি হল আবার?

উত্তর হল—কি হয় নি? হু'জ দিস্ হার্ব ডাটন? এক ডাক্তারের কাছে গিয়েছি। তিনি আমাকে বললেন—ইট'স্ ভেরি আনফেয়ার। ইউ স্থড নট হ্যাভ প্রেসিপিটেটেড দিস্ ক্রাইসিস্।—এখন সামলাও। ঝগড়া করে মরছে ইজিপ্ট, সিরিয়া, জর্ডন আর অন্যান্য আরবদেশ ইজরায়েলের সঙ্গে, আর কথা শুনতে হচ্ছে আমাকে।

আলি বলল—আ-হা, ইউ মানে এখানে তুমি নও—আমেরিকা।

বাট হোয়াই দেন টু মি?—প্রায় চীৎকার করে উঠল ডাটন।—হোয়াই নট স্পীক টু লিণ্ড জনসন?

জনসনকে হাতের কাছে না পেলে তোমাকে ছাড়া আর কাকে বলবেন? বি ফেয়ার অলসো টু হিম—বলল আলি।

হেসে উঠল ডাটন। এ ধরনের লোক। এক মুহূর্তে গরম হয়ে ওঠে, পর মুহূর্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

বলল—ও. কে। বল যত খুশি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে আমেরিকা এই ব্যাপারে এতটুকু দায়ী।

আমি বললাম—আজই রেডিওতে শুনেছি, প্রেসিডেণ্ট জনসন বলেছেন যে ইজরায়েলকে আমেরিকা সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

কিন্তু ছোট্ট একটা দুর্বল দেশকে যদি চারদিক দিয়ে সমগ্র আরবজাতি পিষে মারতে চায়, তবে আমেরিকা কি করতে পারে?—বলল ডাটন।

আলি কি যেন বলতে যাচ্ছিল, চুপ করে গেল। বেরিন এসে আর একটা চেয়ারে বসল।

এস, এস—বলে উঠল ডাটন।—তুমি আর আমি এখন একদলে। এরা বলছে যে আমেরিকা আরবের বিরুদ্ধে ইজরায়েলকে সাহায্য করছে। তুমি কি বল?

বেরিন প্রশ্নটাকে এড়াতে চাইল। মুখের চেহারা তার খুব প্রসন্ন নয়, মনের চেহারাও বোধ হয় তাই।

উত্তর দিল—এরকম সুন্দর রাতে রাজনীতি আলোচনা করার প্রয়োজন কি?

আলির বিপরীত চরিত্র আজ বেরিন। আলি আত্মবিশ্বাসপূর্ণ, উচ্ছল এবং কিছুটা আগ্রাসী; বেরিন দ্বিধান্বিত, বিষণ্ণ ও সঙ্কোচ-কাতর। আজই রেডিওতে ঘোষণা শুনেছি, নাসের আকাবা উপসাগর এবং তিরান প্রণালী ইজরায়েলের জাহাজের জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন। আরব জগৎ জুড়ে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। এমন আরব রাষ্ট্র নেই যেখান থেকে ইজরায়েলের ওপর হুসিয়ারি ছুঁড়ে মারা না হচ্ছে। এক এবং অদ্বিতীয় শত্রু ইজরায়েলের বিরুদ্ধে পরস্পর বিবদমান আরব রাষ্ট্রগুলি একত্রে রাখী বেঁধে একজাতি একপ্রাণ একতার শপথ গ্রহণ করে তাল ঠুকছে।

আলি উত্তর দিল—তাই ভাল। রাজনীতি-চর্চা কমার্শিয়াল ট্র্যাভেলারের ধর্ম নয়।

হো হো করে হেসে উঠল ডাটন। হাসির ধমকে হাতের গেলাস থেকে ছলকে কিছুটা পীতাভ পানীয় পড়ল টেবিলের ওপর।

বলল—কমপ্লিট সমারসল্ট, আলি! এ্যাঁ—একেবারে ডিগবাজি!

সমারসল্ট নয়। আই ডোণ্ট লাইক—বলে উঠল আলি।

আলির কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠল ডাটন—বাট আই ডু লাইক। আমি জানতে চাই দুই দেশের বক্তব্য। তুমি আর বেরিন দুজনেই আরব—যদিও তুমি এ্যাণ্টি-জু আর বেরিন প্রো-জু। ইজরায়েলের বক্তব্য বেরিন পরিষ্কার করে বলতে পারবে না—এটা সত্য, তবুও লেট হিম ট্রাই।

আলি অনেকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল টেবিলের দিকে। তারপর বলল—সমগ্র আরব জগৎ মনে করে পাশ্চাত্য শক্তির কূটচালে সৃষ্ট আরব রাজ্যের মধ্যে এই এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ইজরায়েল। আরবদের নিজেদের দেশ থেকে আরবদের তাড়িয়ে তৈরী করা হয়েছে ইহুদিদের এই রাষ্ট্র—এবং সেটা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে। আরবেরা যদি পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধাচরণ কোনদিন করে তবে তাদের মিত্র-রাষ্ট্র ইজরায়েল তাদের দেবে নিজের দেশকে সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে; কারণ ইজরায়েল জানে যে ইজরায়েলের জন্ম এবং স্থিতি দুই-ই হয়েছে পাশ্চাত্য শক্তির দয়ায় এবং রাজনীতির কূটচক্রে। আরবেরা ইহুদিদের কোনদিন তাড়িয়ে দিতে চায় নি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ইহুদিরা এদেশে আরবদের সঙ্গে একত্রে বাস করত এবং তারা নিজেরাই এই দেশ থেকে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আজও তারা আরব দেশে ছড়িয়ে আছে—বেরিনের মত অনেকেই। ইহুদিরা প্যালেষ্টাইনে থাক, কিন্তু আরবদের তাড়িয়ে দিয়ে নয়—প্যালেষ্টাইন আরবদের বাস ভূমি।

বেরিন উত্তর দিল—আর ইজরায়েল দাবী করে, হিব্রু জাতির বা ইহুদিদের আদি বাসভূমি এই প্যালেষ্টাইন। আরবেরা তাদের তাড়িয়ে এখানে এসেছে। পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রে তারা মাথা তুলে বাঁচতে পারে নি, তারা বাঁচবার জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমি চায়। সুতরাং ইহুদিদের স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র এই প্যালেষ্টাইনেই হওয়া উচিত। কিন্তু আরবেরা ইহুদিদের বাঁচবার সুযোগ দিতে চায় না, ইজরায়েলকে তারা একটি রাষ্ট্র বলেই স্বীকার করে না। আরবদের অধীনে একদা ইহুদিরা ছিল—একথা সত্য। কিন্তু কোথায় আরবেরা ইহুদিদের সমান সুযোগ সমান মর্যাদা দিয়েছে? অপমান নির্যাতনেই কি ইহুদিরা দেশছাড়া হয় নি?

তার জন্য দায়ী তারা—বলল আলি।—ইহুদিরা যে দেশে বাস করেছে

সেই দেশের লোকের সঙ্গে মিশে সেই দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারে নি, হতে চায়ও নি। চিরকাল স্বতন্ত্র এক জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব কল্পনা করে এসেছে। ইহুদিরা মনে করে তারা ঈশ্বরের 'নির্বাচিত লোক'—Chosen people. সুতরাং তারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের চেয়ে বড়। এই অহমিকার জন্য তারা কোনদিন কোন রাষ্ট্রের কাছ থেকে সহানুভূতি পায় নি।

কিন্তু তুমি কি অস্বীকার কর যে প্যালেষ্টাইন হিব্রুজাতির আদি বাসভূমি নয়? আরবেরা কি তার পরে প্যালেষ্টাইনে আসে নি?—বেরিন প্রশ্ন করল।

উত্তর দিল আলি—তোমাদের ধর্মগ্রন্থ 'ওল্ড টেষ্টামেণ্ট' পড়ে দেখ। তোমার প্রশ্নের উত্তর ওই বাইবেলেই পাবে। নতুন রাজ্য পত্তন করার সময় হিব্রুজাতি কম অত্যাচার কম নির্যাতন করে নি—ফলস্বরূপ ভবিষ্যতে অনুরূপ নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। বর্বরোচিত অত্যাচার ও নিপীড়নে পিষ্ট ইহুদিদের জন্য আরবজাতির কম সহানুভূতি ছিল না, কিন্তু ইহুদিরাও সেই একই পথ বেছে নিল কি করে?

বেরিন আস্তে আস্তে বলল—উত্তর আছে, কিন্তু দিলাম না। আমাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিপরীত, যেমন বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী ইজরায়েল ও আরব রাষ্ট্রগুলির। তর্ক করে আমরা কোন সমাধানে আসতে পারব না। সুতরাং অন্য কথায় আসা যাক। তবে—'ওল্ড টেষ্টামেণ্ট' আমি বার বার পড়েছি—তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারি নি, একথা স্বীকার করছি।

হঠাৎ সমস্ত আলো নিভে গেল। ডায়াসের ওপর একটা আলোর ফোকাস এসে পড়ল। অর্কেষ্ট্রার রূপ বদলে গেছে। 'বেলি ড্যান্স' সুরু হয়েছে।

২

হে জেরুজালেম, যদি আমি কখনও তোমাকে বিস্মৃত হই, তাহলে যেন আমার দক্ষিণ বাহু চির-পঙ্গু হয়।
আমার সমস্ত সুখের ওপর যদি আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি, তাহলে যেন আমার জিহ্বা বিদীর্ণ হয়, বাকশক্তি লোপ পায়।

রাত্রির নির্জন অন্ধকারে জেরুজালেম থেকে নির্বাসিত সমস্ত বন্দী হিব্রুজাতির আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার এই আর্তি, দেশ-মাতৃকার প্রতি চির-আনুগত্যের এই করুণ শপথ আমার অস্থির হৃদয়ে অনুরণিত হয়ে ওঠে।
বাইবেলের 'ওল্ড টেষ্টামেন্ট'—হিব্রুজাতির ধর্মগ্রন্থ। তারই পাতায় পাতায় ভাস্বর হয়ে আছে এই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, ঈর্ষা-প্রেম, উত্থান-পতনের বিচিত্র ইতিহাস।
জেরুজালেমকে তারা ভোলে নি, ভুলতে পারে নি। সেদিনও না—আড়াই হাজার বছর পরে আজও না।
বন্ধন ছিন্ন হলে আবার তারা ফিরে এসেছিল—সকলে নয়, সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। কিন্তু সে অন্য ইতিহাস।
আর এক ইতিহাস তারা রচনা করেছিল ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে। ছল, চাতুরী, হত্যা, লুণ্ঠন ও সশস্ত্র সংগ্রামে কলঙ্কিত সে কাহিনী।

প্যালেষ্টাইন।
আরব-মরুভূমির মাথার মুকুট। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে উর্বর অর্ধচন্দ্রাকৃতি একফালি সবুজ মাটি। পূর্বে জর্ডন, উত্তরে সিরিয়া, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর ও মিশর, দক্ষিণে সৌদি আরব।

বর্তমান নাম ইজরায়েল।
একদিকে সমুদ্র, তিন দিকে মরুভূমি। সমুদ্রতীরবর্তী ভূমি ছাড়া সমস্ত দেশই অনুর্বর। উত্তরাঞ্চল শস্যশ্যামল, দক্ষিণাঞ্চল পার্বত্য ও বালুময়।
সমুদ্রতীরে বন্দর মাত্র কয়েকটি, তা-ও ফিনিসীয়দের কুক্ষিগত। দৈনন্দিন কঠোর পরিশ্রমে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থায় সতত ব্যাপৃত এই দরিদ্র কৃষক ও পশুপালক অধিবাসীরা তাই তাদের প্রতিবেশী নীল, তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদী-বিধৌত দেশগুলির মত না গড়ে তুলতে পেরেছে কোন ঐতিহাসিক সভ্যতা, না পেরেছে গড়তে কোন দুর্বার রাজনৈতিক শক্তি।

চার হাজার বছর আগে সেই আদি বাইবেলের যুগে আমি ফিরে যাই যেন।
তুর্কি ও সিরিয়ার সীমান্তে হারান উপত্যকা, তারই মাঝে কৃষক ও মেষ-পালক অধ্যুষিত ছোট্ট একটি শহর হারান। ক্যালডীয় সম্রাটের অধীনে এই হারান উপত্যকা।
এখানে বাস করতেন মহাপ্রবর আব্রাহাম—হিব্রুজাতির জনক।
তখনও তাঁর নাম আব্রাহাম নয়,—আব্রাম। স্ত্রীর নাম সারা নয়,—সারাই।
পঁচাত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ আব্রাম, উট ও মেষ-ব্যবসায়ী, সঙ্গতি-সম্পন্ন। ঈশ্বর এসে দেখা দিলেন আব্রামকে। বললেন ঃ তোমার দেশ, তোমার পিতৃ-পুরুষের বাসভূমি ত্যাগ করে চল আর এক দেশে, সেই দেশ আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব।
এত সমৃদ্ধির থেকে এই বৃদ্ধবয়সে ঘরবাড়ি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব—সব কিছু ত্যাগ করে অনিশ্চয়তার মাঝে ঝাঁপ দেওয়া কম কথা নয়। কিন্তু আব্রামের ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস। তাছাড়া ঈশ্বর তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন যে তিনি এক বিরাট জাতির জনক হবেন ; কিন্তু এই বয়সে

সন্তানের পিতা হওয়া কি আর তাঁর পক্ষে সম্ভব ? তখনো পর্যন্ত তিনি নিঃসন্তান।

ভ্রাতুষ্পুত্র লট এবং স্ত্রী সারাইকে নিয়ে তিনি ঈশ্বর-নির্দিষ্ট পথে বেরিয়ে পড়লেন। ক্যানান ঈশ্বরের নির্দিষ্ট দেশ, কিন্তু যখন তাঁরা সেখানে এসে পৌঁছুলেন তখন সেখানে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। ক্যানানে থাকা আর হল না, মিশরের পথ ধরলেন।

মিশরে এসে পৌঁছুলেন তাঁরা। স্ত্রীর দিকে তাকালেন আব্রাম—সারাই তখনো সুন্দরী, যৌবনদীপ্তা। ভয় হল তাঁর। বিদেশ-বিভূঁইয়ে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সারাইকে আব্রাম বললেন—দেখ, তুমি এখনো অপূর্ব সুন্দরী। তোমাকে দেখলেই মিশরবাসীরা চীৎকার করে উঠবে, 'এই মেয়েটি ওর স্ত্রী'। তারপর তোমাকে পাওয়ার লোভে তারা আমাকে হত্যা করবে। সুতরাং তুমি সকলকে জানিও যে তুমি আমার ভগ্নী। তবে আমার প্রাণহানি হবে না।

সারাই সম্মত হলেন। সারাই-এর রূপে মুগ্ধ হলেন মিশরের ফারাও। সারাইকে তুলে নিয়ে এলেন নিজের প্রাসাদে। স্থান দিলেন অন্দরমহলে।

ফারাও-এর অনুগ্রহ প্রবলভাবে বর্ষিত হল আব্রামের ওপর। আব্রাম মিশরের এক সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যবসায়ী হয়ে উঠলেন কিছুদিনের মধ্যেই। কিন্তু সারাইকে সম্ভোগ করার জন্য ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হলেন ফারাও-এর ওপর এবং দেশে মড়ক এনে দিলেন। মড়কের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে ফারাও সারাইয়ের প্রকৃত পরিচয় পেলেন এবং অনুতপ্ত হয়ে সারাইকে আব্রামের হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

এরপরে আর তাঁর মিশরে থাকা সম্ভব হল না, ঘুরে ফিরে আবার সেই ক্যানানে ফিরে এলেন। আব্রাম ঘর বাঁধলেন হেব্রোনে কিন্তু লট চলে গেলেন সোডোম নগরীতে। আব্রামের মনে সেই এক দুঃখ —তিনি নিঃসন্তান, কি করে ঈশ্বরের আশীর্পূত জাতির জনক হবেন?

সারাই স্বামীর মনোবেদনা বুঝতে পেরে তাঁর নিজের মিশরীয় দাসী হাগারকে দিলেন আব্রামের কাছে। হাগারের গর্ভে আব্রামের এক পুত্র হল—নাম ইশমায়েল। কিন্তু তবু আব্রামের মনে শান্তি নেই—তিনি তাঁর স্ত্রী সারাইয়ের গর্ভে এক উত্তরাধিকারী চান।

ঈশ্বর এসে তাঁদের নাম পরিবর্তন করে দিলেন। আব্রাম হলেন আব্রাহাম, সারাই হলেন সারা। নাম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ভাগ্যেরও পরিবর্তন হল! সারা-র এক পুত্র হল—আইজাক। জ্ঞাতি-কন্যা রেবেকার সঙ্গে তিনি আইজাকের বিবাহ দিলেন। রেবেকার ছুই যমজ পুত্র হল ঈশ এবং জেকব। মা ভালবাসতেন জেকবকে বেশি। ঈশ-এর দেহ ছিল লোম-বহুল, জেকব ছিলেন মসৃন-দেহী। মা আর জেকব তুজনে স্থির করলেন যে চালাকি করে ঈশকে ফাঁকি দিয়ে আইজাকের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন জেকব। অন্ধ আইজাক একদিন ঈশকে ডেকে মাংস রান্না করতে বললেন এবং জানালেন যে সেইদিনই তিনি তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকারী ঘোষণা করবেন।

একথা শুনতে পেলেন রেবেকা। ঈশ পশু শিকার করতে বনে চলে গেলে তিনি মাংস রান্না করে জেকবের হাতে ছাগলের চামড়া জড়িয়ে দিয়ে জেকবের হাত দিয়েই সেই মাংস পাঠালেন আইজাকের কাছে। মাংস খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন আইজাক, জেকবের হাত ধরে ঈশ-এর হাত ভেবে প্রতারিত হলেন। বললেন—হাত তুটি ঈশ-এর হাত, কিন্তু কণ্ঠস্বর জেকবের।

কিন্তু প্রতিজ্ঞামত তিনি সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে দিলেন ঈশ-এর ছদ্মবেশী জেকবকে।

ঈশ-এর আক্রোশ থেকে আত্মরক্ষার জন্য জেকব মাতুলালয়ে পালালেন। মামা লাবানের এক মেয়ে র‍্যাচেলের রূপে মুগ্ধ হয়ে জেকব তাঁর প্রেমে পড়লেন। লাবান র‍্যাচেলের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিতে স্বীকৃত হলেন ঠিকই, কিন্তু একটি সর্ত আরোপ করলেন: বিবাহের পূর্বে

সাত বৎসর সেই বাড়িতে তাঁর দাসত্ব করতে হবে। প্রেমোন্মাদ জেকব তাইতেই সম্মত হয়ে সেখানে রয়ে গেলেন। সাত বৎসর পরে বিবাহের সময় লাবান চাতুরী করে তাঁর আর এক কন্যা লিয়ার সঙ্গে বিবাহ দিলেন জেকবের।

হাল ছাড়লেন না জেকব। র‍্যাচেলকে জয় করার জন্য সেখানেই রয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত র‍্যাচেলকেও তিনি বিবাহ করলেন। লিয়ার গর্ভে তাঁর অনেক সন্তানসন্ততি হয়, র‍্যাচেলের গর্ভে মাত্র এক পুত্র জোসেফ।

দারাপুত্রপরিবার নিয়ে এতদিনে জেকব ফিরলেন ক্যানানে। ক্যানানে প্রবেশ করার মুখে নিজের নাম পরিবর্তন করে রাখলেন ইজরায়েল।

জোসেফ ছিলেন ইজরায়েলের নয়নের মণি, কিন্তু তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁকে দুচোখে দেখতে পারত না। তারা জোসেফকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে দাস-ব্যবসায়ীদের হাতে বেচে দিল। জোসেফের পোশাক ছাগ-রক্তে রঞ্জিত করে এনে তারা পিতাকে জানাল যে বুনো পশুর হাতে জোসেফ নিহত হয়েছে।

জোসেফকে দাস-ব্যবসায়ীরা মিশরে নিয়ে গিয়ে ফারাও-এর এক কর্মচারী পোটিফারের কাছে বিক্রি করে দিল। পোটিফার তাঁকে গৃহকার্যে নিয়োগ করলেন। এই তরুণকে দেখে পোটিফারের স্ত্রী মুগ্ধ হলেন। তিনি একদিন জোসেফকে ধরে তাঁর সঙ্গে রাত্রিবাস করার জন্য অনুনয় করতে লাগলেন; কিন্তু জোসেফ এই ব্যভিচারে সম্মত হলেন না। প্রভু-পত্নীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে ঈশ্বরের সম্মুখে চিরকালের জন্য তিনি অপরাধী হয়ে থাকবেন।

প্রত্যাখ্যাতা পোটিফারের স্ত্রী স্বামীর কাছে জোসেফের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন: জোসেফ গভীর রাত্রে জোর করে তাঁর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গে সহবাস করতে চেয়েছিল।

ক্রোধান্ধ পোটিফার জোসেফকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন।

জোসেফের নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন কারাধ্যক্ষ। তাঁকে তিনি বন্দীদের দেখাশোনার ভার দিলেন।

ছেলেবেলা থেকেই জোসেফের এক আশ্চর্য শক্তি ছিল, তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারতেন। এই গুণের কথা মিশরের কারাভ্যন্তর থেকে ফারাও-এর কানেও গিয়ে উঠল।

ফারাও একদিন এক স্বপ্ন দেখলেন। বিচলিত হয়ে উঠল তাঁর মন। প্রতিরাত্রে সেই একই স্বপ্ন এসে দেখা দেয়—সাতটি হৃষ্টপুষ্ট এবং সাতটি শীর্ণ গরু। রাজসভার কেউ এই স্বপ্নের যথার্থ অর্থ বলতে সক্ষম হয় না। ফারাও ডাক দিলেন জোসেফকে।

স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে জোসেফ জানালেন যে সাত বছর মিশরে প্রচুর শস্য উৎপাদন হবে এবং তার পরের সাত বছর আসবে দুর্ভিক্ষ।

ফারাও সেই আকালের জন্য প্রস্তুত হলেন। জোসেফকে মুক্তি দিয়ে ফলনের দিনে শস্য সঞ্চয়ের কর্তৃত্ব দিলেন তাঁর হাতে যাতে অফলনের দিনে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা যায়। জোসেফ সুচারুরূপে তাঁর দায়িত্ব পালন করলেন। দেশে অনাবৃষ্টি, অফলন—কিন্তু সঞ্চিত শস্যের জন্য অনাহারে রইল না দেশের লোক। জোসেফকে সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগল।

এই দুর্ভিক্ষ ক্যানানেও দেখা দেয়। জোসেফের বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা খাদ্যের সন্ধানে মিশরে এসে উপস্থিত হল। বৃদ্ধ পিতা জেকব কনিষ্ঠ ভাই বেঞ্জামিনের তত্ত্বাবধানে রইলেন। মিশরে ভাইরা এল জোসেফের সামনে। জোসেফ তাদের দেখেই চিনতে পারলেন, কিন্তু ভাইরা তাঁকে চিনতে পারে নি। তারা কল্পনাও করতে পারে নি যে, যে-ভাইকে তারা দাস-ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দিয়েছে সেই ভাই আজ মিশরে ফারাও-এর অধীনে এত বড় রাজ-পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং তার কাছেই তারা ভিক্ষার হাত পাতছে।

তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন হয়েছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য তিনি তাদের এই সর্তে খাদ্য দিতে সম্মত হলেন যে তারা ছোট ভাই বেঞ্জামিনকে মিশরে নিয়ে আসবে এবং বেঞ্জামিন যতদিন না আসবে ততদিন এক ভাইকে বন্দী করে রাখা হবে। ভাইরা ক্যানানে ফিরে

গিয়ে পিতাকে সব কথা বলে বেঞ্জামিনকে নিয়ে আবার মিশরে এল।

এবার জোসেফ বেঞ্জামিনকে বন্দী করে রাখার ভয় দেখালেন। ভাইরা বিপদে পড়ল, বেঞ্জামিনকে না দেখলে তাদের পিতা মারা যাবেন। শেষ পর্যন্ত এক ভাই বেঞ্জামিনের পরিবর্তে বন্দী হয়ে থাকতে সম্মত হল। তখন জোসেফের চোখে জল দেখা দিল। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের এত ভালবাসা! আর তারা তাঁরই ভাই! তিনি কেঁদে ফেলে বললেন—ভাইরা, আমি তোমাদের ভাই জোসেফ।

এবার মিলনের পালা। ভাইরা নিজেদের অপরাধে লজ্জিত হল। জোসেফ পিতা জেকবকে মিশরে আনালেন।

তারপর।—

তারপর হিব্রুজাতির ইতিহাস বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। কেউ বলতে পারে না তারা কোথায় ছিল, কিভাবে ছিল, কি করছিল। একটা জাতির প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস আর খুঁজে পাওয়া যায়'না।

অতীতের অস্বচ্ছ আলোয় আবার যখন আমরা হিব্রুজাতির সন্ধান পাই, তখন তারা ফারাও-এর দাস। সমগ্র জাতি বন্দী, ফারাও-এর ক্রীতদাস—মানুষের মত সুস্থ জীবনযাপনের উপায় নেই, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারিয়ে প্রতিদিন অমানুষিক অত্যাচার ও নিষ্ঠুর নিপীড়নে হৃত-বীর্য।

তবু ফারাও-এর স্বস্তি ছিল না মনে। বংশবৃদ্ধির ফলে হিব্রুদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, শক্তিশালীও হচ্ছে তারা। একদিন যদি তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের জন্য সংগ্রাম করে! ফারাও হুকুম দিলেন, নবজাত প্রতিটি হিব্রু পুত্র-সন্তানকে হত্যা করা হবে।

শিশু-রক্তে লাল হয়ে উঠল মিশরের সবুজ ভূমি।

মোজেসের জন্ম হয় এই সময়ে।

শিশু-পুত্রকে জহ্লাদের শাণিত কৃপাণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর মা এই শিশুর জন্ম সযত্নে গোপন রেখে একটা নৌকোয় তাঁকে লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু রাজকন্যার এক পরিচারিকার দৃষ্টিতে পড়ল এই নবজাত সুন্দর শিশুটি। পরিচারিকা শিশুটিকে কুড়িয়ে এনে সমর্পণ করল রাজকুমারীকে। রাজকুমারী শিশুটির লালন পালনের ভার দিলেন এক হিব্রু ধাত্রীর ওপর।

ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন মোজেস।

ফারাও-এর মিশরে তাঁর জ্ঞাতি-ভ্রাতা ইহুদিদের ওপর নির্যাতনে অত্যন্ত বেদনা এবং অপমান বোধ করতেন। মিশরীয়দের ওপর জেগে উঠল বিজাতীয় ঘৃণা, এক তীব্র জাতীয়তাবাদে তাঁর মন উদ্দীপিত হয়ে উঠল। একই চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসল—হতভাগ্য ইহুদিদের এই ঘৃণ্যকর জীবন থেকে কি করে মুক্তি দেওয়া যায়!

একদিন তিনি দেখলেন যে একজন মিশরীয় এক ইহুদির ওপর চরম নির্যাতন করছে। আর স্থির থাকতে পারলেন না। মনস্থির করে ফেললেন। একবার তাকালেন এদিকে, একবার ওদিকে। চারদিক ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন। কেউ কোথাও নেই। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই অত্যাচারী মিশরীয়ের ওপর এবং তাকে বিনা দ্বিধায় হত্যা করলেন। এই অপরাধ লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার জন্য বালি চাপা দিয়ে মৃতদেহটি লুকিয়ে ফেললেন।

ছাই দিয়ে আগুন চাপা যায় না, হত্যা-সংবাদ গোপন থাকে না। এই সংবাদও চাপা রইল না। ক্রোধান্ধ ফারাও আদেশ দিলেন মোজেসকে হত্যা করতে। মোজেস মিশর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে মিডীয় মরুভূমিতে আত্মগোপন করে রইলেন।

এই মরুভূমিতে এক কূপের কাছে তিনি একদিন বসে বিশ্রাম করছেন, এমন সময় সেখানকার প্রধান পুরোহিত জেথরোর সাতটি মেয়ে একপাল পশু নিয়ে সেখানে এল তাদের জলপান করাতে। এই মেয়েদের দেখে একদল রাখাল রুখে দাঁড়াল। সেই কূপের

জল জেথরোর পশুপালকে তারা পান করতে দেবে না। তারা পশুদের জোর করে তাড়িয়ে দিল। এই দুর্বৃত্ত রাখালদের সঙ্গে অবলা মেয়েরা কি করে লড়াই করে? তারা অনেক অনুনয় করল কিন্তু রাখালেরা তাদের কথায় কর্ণপাত করল না, উপরন্তু গালাগালি করল।

এতক্ষণ সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করছিলেন মোজেস। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দীক্ষিত তিনি। তারই জন্য এই স্বেচ্ছা-নির্বাসন, এই সাময়িক আত্মগোপন। এবার তিনি এগিয়ে গেলেন মেয়েদের সাহায্যে। রাখালদের মেরে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং পশুদের একত্র জড় করে জল তুলে তাদের পান করালেন।

মেয়েরা বাড়ি ফিরে গিয়ে একথা জানাল জেথরোকে। অপরিচিত এই যুবকটির সৎসাহস এবং নিঃস্বার্থ পরোপকারে খুশি হলেন তিনি। আশ্রয়হীন মোজেসকে ডেকে এনে নিজের গৃহে ঠাঁই দিলেন এবং কিছুদিন পরে তাঁর এক মেয়ে জিপোরার সঙ্গে মোজেসের বিবাহ দিলেন।

মোজেস রয়ে গেলেন জেথরোর গৃহে। প্রতিদিন সকালে তিনি জেথরোর পশুপাল নিয়ে চরাতে যান, ফেরেন সন্ধ্যায়। সারাদিন তাঁর সেই এক চিন্তা: নিপীড়িত ইহুদি-ভ্রাতাদের মুক্তি কি করে সম্ভব? অস্থির হৃদয় কোন সদুত্তর পায় না। কোথাও সামান্যতম আলোর রেখা দেখা যায় না।

এইভাবে দিন কাটে।

হঠাৎ একদিন তাঁর দিব্য-দর্শন লাভ হল।

পশুচারণে ক্লান্ত তিনি ক্ষণেক বিশ্রামের জন্য ছায়ার সন্ধান করছেন, এমন সময় তাঁর অবাক দৃষ্টি পড়ল একটা ঝোপের ওপর। সেই ঝোপটা হঠাৎ কেমন জ্যোতির্ময় হয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে সেই ঝোপটি অগ্নিময় হয়ে উঠল।

আগুন! অথচ ঝোপটি পুড়ে যাচ্ছে না। তার কোন ক্ষতি হচ্ছে না। আশ্চর্য হয়ে গেলেন মোজেস। এই অবিশ্বাস্য রহস্যের কারণের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি সেইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হঠাৎ সেই ঝোপের ভেতর থেকে শব্দ ভেসে এলঃ মোজেস! মোজেস। আমি এখানে।

চমকে উঠলেন মোজেস। সমস্ত ঘটনাই কেমন অবিশ্বাস্য, অলৌকিক। মোজেস সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন।

সেই দৈববাণী ধ্বনিত হতে লাগলঃ আমি তোমার পিতার ঈশ্বর। আমি আব্রাহামের ঈশ্বর। আমি আইজাকের ঈশ্বর। আমি জেকবের ঈশ্বর।

মোজেসের সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে উঠল। ঈশ্বরের দিকে মুখ তুলে তাকাতে তাঁর সাহস হল না। দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন।

ঈশ্বর বলে চললেনঃ ইজরায়েল-সন্তানদের ক্রন্দন আমার কানে এসেছে। আমি দেখেছি তাদের ওপর মিশরীয়দের নিষ্ঠুর নির্যাতন। আমি তোমাকে নির্বাচিত করছি, মোজেস। যাও, তুমি আমার সন্তানদের—ইজরায়েলের সন্তানদের— মিশরের বাইরে নিয়ে এস। এক দুগ্ধ-মধু-প্রবাহিনী দেশে আমি তাদের নিয়ে যাব।

সেই দৈববাণী স্তব্ধ হল।

মোজেস আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করলেন না। ঈশ্বরের বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে মোজেস ফিরে গেলেন মিশরে। ফারাও দ্বিতীয় রামেশিসকে মোজেস অনুরোধ করলেন ইহুদিদের মুক্তি দিতে, কিন্তু ফারাও স্বীকৃত হলেন না।

মোজেস ফিরে গেলেন তাঁর জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের কাছে। তাঁদের কাছে গিয়ে শোনালেন ঈশ্বরের আদেশ। এই ঘৃণ্য দাসত্বের হাত থেকে মুক্তির আশায় সকলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, প্রাণে নতুন আশার সঞ্চার হল। ঈশ্বর নির্দিষ্ট দেশে যাওয়ার জন্য মিশরের সমস্ত ইহুদি একত্রিত হল। তারপর একদিন রাত্রে তারা মোজেসের নেতৃত্বে

গোপনে মিশর ত্যাগ করল।

এই সংবাদ পেলেন ফারাও। তাঁর সমস্ত দাস আজ বন্ধনদশা ছিন্ন করে চলে যাচ্ছে শুনে তাঁর অশ্বারোহীবাহিনীকে আদেশ করলেন সমস্ত ইহুদিকে শৃঙ্খলিত করে মিশরে টেনে নিয়ে আসতে।

ফারাও-এর বিশাল অশ্বারোহীবাহিনী শিকারের সন্ধান পেয়ে তীব্র বেগে তাড়া করল। প্রাণভয় এবং পুনর্দাসত্বের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইহুদিরা ছুটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হল তারা লোহিত সাগরের উপকূলে। অনতিক্রম্য সেই দুরন্ত তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ লোহিত সাগর। পরিত্রাণের সমস্ত আশা বিলুপ্ত হল সেই পলায়ন-রত ইহুদিদের।

ইহুদিদের সেই ত্রিশঙ্কু-অবস্থা দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল দূর থেকে ফারাও-এর রক্ত-পাগল সৈন্যবাহিনী। তারা হিংস্র-উল্লাসে চীৎকার করে তাদের ঘোড়া দ্রুত ছুটিয়ে তাড়া করে এল। শঙ্কিত ইহুদিরা তাকাল মোজেসের দিকে।

অনুযোগের কণ্ঠে তারা বলে উঠলঃ মিশরে কি আমাদের মৃত্যুর স্থানের এতই অভাব ছিল যে আমাদের নিয়ে এসেছ লোহিত সাগরে কবরস্থ করতে ?

ঈশ্বরের ইঙ্গিতে মোজেস তাঁর হাতের লাঠি একদিকে কাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই লোহিত সাগরের জল দ্বিধা হয়ে একটি প্রশস্ত পথ তৈরি হল। মোজেস ইহুদিদের নিয়ে সেই পথের ওপর দিয়ে লোহিত সাগর অতিক্রম করে অপর পারে উপস্থিত হলেন। এদিকে প্রবলবেগে ফারাও-এর সৈন্যবাহিনী ততক্ষণে সমুদ্রের মাঝখানে এসে পোঁচেছে। হঠাৎ সেই পথ গ্রাস করল সমুদ্রের জল এবং প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ফারাও-এর সমস্ত সৈন্যবাহিনী লোহিত সাগরের অথৈজলে তলিয়ে গেল। মুক্তি ! এতদিনে মুক্তি ! এই বন্ধনদশার থেকে মুক্তির জন্য তারা প্রাণ ভরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল। চারশ ত্রিশ বছর পরে তাদের এই দেহের মুক্তি, আত্মার স্বাধীনতা।

খৃষ্টপূর্ব ১৬৫০ অব্দে তারা এসেছিল মিশরে, খৃঃ পূঃ ১২২০ অব্দে তাদের মিশর ত্যাগ।

ফারাও-এর বন্দীদশা থেকে মুক্ত এই ইহুদিদের নিয়ে মোজেস সিনাই পর্বতের নীচে সমতল ভূমিতে যাযাবরের মত বাস করতে লাগলেন। এইখানেই তিনি প্রথম উপলব্ধি করতে পারেন আব্রাহামের ঈশ্বরকে। 'য়াভে' সেই দেবতার নাম। য়াভে দিব্য-পুরুষ মোজেসকে নিভৃতে দর্শন দিতেন।

একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে মোজেস সিনাই পর্বতশিখরে আরোহণ করলেন। হঠাৎ সেই পর্বত-চূড়া পুঞ্জীভূত মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং সেই কৃষ্ণকালো মেঘের মধ্য থেকে এক উজ্জ্বল জ্যোতি ফুটে উঠল। ছয় দিন ধরে সেই দিব্যজ্যোতি সমগ্র সিনাই প্রদেশকে জ্যোতির্ময় করে রাখল।

চল্লিশ দিন পরে সেই মেঘের অন্তরাল থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন মোজেস। দুটি প্রস্তরখণ্ড হাতে নিয়ে সিনাই পর্বত থেকে তিনি নেমে এলেন। বজ্র-নির্ঘোষে য়াভে যে-বাণী সমগ্র ইহুদি জাতির উদ্দেশ্যে দেন, তা সেই দুটি প্রস্তরখণ্ডের ওপর খোদিত হয়ে গেল।

এই বাণীই 'দশ অনুশাসন' বা Ten Commandments.

চল্লিশ বছর ধরে উপযুক্ত বাসভূমির সন্ধানে সিনাই মরুভূমিতে ইহুদি-দের নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন মোজেস। কিন্তু সে দেশের তিনি সন্ধান পান নি।

মোজেসের মৃত্যুর পর এই ভ্রাম্যমাণ ইহুদিদের নেতা নির্বাচিত হলেন জোসুয়া।

চল্লিশ বৎসরের এই যাযাবর-জীবনে তারা অধৈর্য হয়ে পড়েছিল, একটা স্থায়ী বাসভূমির জন্য তারা উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। তাদের মনোবল ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। ফারাও-এর কাছ থেকে ঠিক এধরনের মুক্তি তারা চায় নি। কোথায় ঈশ্বর-প্রতিশ্রুত সেই দুগ্ধ-মধু-প্রবাহিনী দেশ?

জোসুয়া উপলব্ধি করলেন তাদের মনের বাসনা। ক্ষেত্র প্রস্তুত। এই অধীরতাই দুর্বার শক্তি হবে তাঁর, এই অস্থিরতাই নতুন দেশ জয় করবে। জোসুয়া তাদের নিয়ে দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

সিনাইর পাশেই প্যালেষ্টাইন।

প্যালেষ্টাইন তখন কয়েকটি ক্ষুদ্র নগরী-রাজ্যে বিভক্ত, বিভিন্ন জাতি অধ্যুষিত।

ক্যানানাইট এবং আমোরাইট জাতি জোসুয়ার আক্রমণকারী বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে নতি স্বীকার করল, কিন্তু জেরিকো নগরী বশ্যতা স্বীকার করল না। সুরু হল প্রবল সংগ্রাম। অবরুদ্ধ জেরিকো নগরীর সৈন্যবাহিনীর রণবিক্রমে ইহুদিদের অবরোধ প্রায় চূর্ণ হয়ে এসেছিল, জোসুয়ার জয়লাভ তখন সন্দেহজনক। জোসুয়া প্রমাদ গণলেন। বাছাই-করা গুপ্তচর পাঠালেন নগরীর অভ্যন্তরে। তাদের সঙ্গে আলাপ হল রাহাব নামে জেরিকো নগরীর এক বারবণিতার। সেই বারবণিতা জোসুয়াকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল এবং জোসুয়ার গুপ্তচরদের সঙ্গে একত্র হয়ে জেরিকোর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তুলল।

শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন জোসুয়া।

বীর ছিলেন তিনি, কিন্তু বীরত্বের মর্যাদা দিতে শেখেন নি। সদ্য-স্বাধীনতা-প্রাপ্ত-ইহুদিরা ক্যানানাইটদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই মরণ-পণ সংগ্রামকে অভিনন্দিত করতে পারল না। জোসুয়া মহাক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

জোসুয়া-চালিত এই ইহুদিদের মনের কথা বাইবেলে লিখিত আছে ঃ

অভিশপ্ত হোক ক্যানান। তার ভ্রাতার অধীনস্থ ভৃত্যের ভৃত্য হয়ে থাক।

ইহুদিরা ক্ষমা করতে শেখে নি কোনদিন। পরাজিত শত্রুর প্রতি উদার মনোভাব প্রদর্শন করার গুণের অধিকারী তারা ছিল না কোনদিন—

সেদিনও না, আজও নয়। তাদের ধর্ম-গ্রন্থের একই বাণী তারা শিখেছে ঃ

জীবন নিয়ে জীবন দেবে। চোখের বদলে চোখ। দাঁতের বদলে দাঁত। হাতের বদলে হাত। পায়ের বদলে পা। ॥ একসোডাস ॥ ২১ ॥

জেরিকো নগরীর ওপর পাশবিক প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য বদ্ধপরিকর জোস্থয়া জেরিকো-নগরীটিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করলেন। জেরিকো নগরীর প্রতিটি অধিবাসীকে—নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ, গো-মেষ—নির্মম-ভাবে হত্যা করে রক্তের নদী বইয়ে দিলেন। শুধু পরিত্রাণ পেল সেই বারবণিতা রাহাব এবং তার আত্মীয়-স্বজন।

যাযাবর ইহুদিরা প্রবেশ করল প্যালেষ্টাইনে।

দক্ষিণ প্যালেষ্টাইনের কয়েকটি দুর্বল নগরী-রাজ্য সহজেই অধিকার করল তারা। ধ্বংস এবং হত্যালীলাও অবাধে চালিয়ে গেল তারা। কিন্তু উত্তরের পার্বত্যাঞ্চলের শক্তিশালী নগরী-রাজ্যগুলিকে সহজে তারা অধিকার করতে পারে নি।

প্যালেষ্টাইনের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে আধিপত্য করছে তখন ফিলিস্টাইনেরা। দুর্ধর্ষ নিষ্ঠুর যোদ্ধা তারা। ক্রীট থেকে এসে তারা বসতি স্থাপন করেছিল এখানে। বাধা দিয়েছিল এখানকার তদানীন্তন অধিবাসী ক্যানানাইটরা। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ক্যানানাইটরা সরে এসেছিল আরও দক্ষিণে।

এই ফিলিষ্টাইনদের পরাজিত করে উচ্ছেদ না করলে তাদের স্থায়ী বাসভূমির দুশ্চিন্তা কিছুতেই দূরীভূত হবে না। সুতরাং ফিলিষ্টাইনদের সঙ্গে সুরু হল প্রবল সংগ্রাম। এই বীর জাতির সঙ্গে যুদ্ধে তারা সহজে এঁটে উঠতে পারে নি। ফিলিষ্টাইনেরা বারবার ইহুদি-অভিযান প্রতি-হত করেছে, অনেক স্মরণীয় যুদ্ধে তারা ইহুদিদের পরাজিত করেছে। তবু ইহুদিরা হাল ছাড়ে নি।

জোস্থয়ার নেতৃত্বে ইহুদিদের বিজয়ী হওয়ার কারণ ছিল নিজেদের মধ্যে একতা, সঙ্ঘবদ্ধতা এবং একই আদর্শে সংগ্রাম। কিন্তু যাযাবর-বৃত্তির শেষে স্থায়ী বাসভূমি লাভ করার পরই তাদের মধ্যে দেখা গেল সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব। ইহুদি বা হিব্রুজাতি ছিল বহু খণ্ডজাতিতে বিভক্ত এবং প্রত্যেক খণ্ডজাতিরই ছিল একজন নেতা, যার দ্বারা চালিত হত সেই খণ্ডজাতি। স্থায়ী বাসভূমি লাভের পরই এই খণ্ড-জাতিগুলি অন্য কোন খণ্ডজাতির নেতার কর্তৃত্ব সহ্য করতে স্বীকৃত হল না। অন্তর্কলহে হিব্রুজাতি দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল।

ইহুদি রাষ্ট্রকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় সমগ্র জাতিকে এক নেতৃত্বা-ধীনে আনা এবং সেই ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত সফল হলেন এমনি এক খণ্ডজাতির নেতা। তাঁর নাম সল। সল বিভিন্ন খণ্ড হিব্রুজাতিকে একটি জাতিতে পরিণত করলেন।

তখন হিব্রুজাতির প্রধান পুরোহিত স্যামুয়েল। হিব্রুজাতির এই একতায় তিনি খুশি হলেন, বিধর্মী ফিলিষ্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তিনি সলকে উৎসাহিতও করলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরোধ বাধল সল এবং স্যামুয়েলের মধ্যে। সল নিজেকে হিব্রুজাতির রাজা বলে ঘোষণা করলেন। স্যামুয়েল সলের এই হঠাৎ রাজা হওয়া একেবারে পছন্দ করলেন না। হিব্রুজাতিকে বারবার সাবধান করে দিলেন এই রাজপদ সৃষ্টি করার জন্য।

সল রাজা হলেও জাতির মধ্যে পুরোহিতের স্থানও খুব উঁচুতে। স্যামুয়েল সলকে প্ররোচিত করলেন ফিলিষ্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। রাজা সল-ও দিগ্বিজয়ী সম্রাট হওয়ার কল্পনায় ফিলিষ্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, কিন্তু প্রতিবারই যুদ্ধে তাঁর পরাজয় হল।

এবারে ফিলিষ্টাইনেরা ইহুদি-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করল। সল আবার কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হলেন। সলের সম্রাট হওয়ার স্বপ্ন

ভেঙে গেল, এখন এল এক আতঙ্ক। ফিলিষ্টাইনদের অপ্রতিহত বিজয়-অভিযানে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, তাঁর রাজ্য থাকে কি না সন্দেহ!

ফিলিষ্টাইনদের এই সাফল্যের মূলে ছিল তাদের সেনাপতি গলিয়াথ। অত্যন্ত দীর্ঘকায়, শক্তিশালী, নিষ্ঠুর এবং সাহসী বীর। সর্বাঙ্গ বর্মাবৃত। উন্মুক্ত তরবারি হাতে সে একা সহস্র সহস্র শত্রু-নিধনে সক্ষম। প্রতি যুদ্ধে ইহুদিরা তার পরাক্রমে বিপর্যস্ত। শেষ পর্যন্ত সমস্ত ইহুদি রাজ্য জুড়ে গলিয়াথের নামেই আতঙ্ক।

গলিয়াথ ফিলিষ্টাইন-বাহিনী নিয়ে সলের রাজ্য আক্রমণ করলেন। সদম্ভে ঘোষণা করলেন যে যদি কোন হিব্রু তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারে তবে ফিলিষ্টাইনেরা পরাজয় স্বীকার করবে।

আতঙ্কিত সল ঘোষণা করলেন যে, যে এই গলিয়াথকে হত্যা করতে পারবে তাকে তিনি প্রচুর ঐশ্বর্য এবং নিজের কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেবেন। কিন্তু হিব্রু সেনাবাহিনীতে এমন কোন বীর ছিল না যে এত প্রলোভন সত্ত্বেও গলিয়াথের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।

এই ঘোষণা শুনলেন ডেভিড। বয়সে তরুণ, সামান্য এক মেষ-পালক, কিন্তু দেহে বিপুল শক্তি এবং মনে অসীম সাহস।

ডেভিড এলেন সলের রাজসভায়। গলিয়াথের সঙ্গে যুদ্ধ করবার অনুমতি চাইলেন তিনি।

সল চমকে উঠলেন। যেখানে খ্যাতিমান হিব্রু-বীরেরা গলিয়াথের নাম শুনে আতঙ্কিত, সেখানে এই রণ-অনভিজ্ঞ তরুণ মেষ-পালক গলিয়াথের সঙ্গে যুদ্ধ করবে কি? একটা নিশ্চিত নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে তিনি কি করে সম্মত হতে পারেন? গলিয়াথের শক্তি ও যুদ্ধ-নৈপুণ্যের কথা বুঝিয়ে ডেভিডকে এই অসমান যুদ্ধ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চাইলেন, কিন্তু ডেভিড তাঁর উপদেশ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধের জন্য অনুমতি ভিক্ষা করলেন।

এই নির্ভয় সাহসে মুগ্ধ হলেন সল। নিজে তাঁকে সমর-সজ্জায় সজ্জিত করে রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু এই অনভ্যস্ত পোশাকে অস্বস্তি

বোধ করলেন ডেভিড। সমরসজ্জা খুলে ফেলে তিনি পরলেন তাঁর চির-অভ্যস্ত পোশাক। তরবারি, বর্শা ফেলে দিয়ে হাতে নিলেন একটা গুলতি এবং কিছু পাথর। তারপর যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চললেন। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে একটু দূর থেকে ডেভিড গলিয়াথকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতে লাগলেন। দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনী তামাসা দেখার জন্য ভিড় করে এল। ফিলিষ্টাইনেরা এই তরুণকে মহাবীর গলিয়াথের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসতে দেখে হাসাহাসি করতে লাগল। গলিয়াথও যুদ্ধ করতে বেরিয়ে এসে নিরস্ত্র তরুণ ডেভিডকে দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

ডেভিড গুলতিতে একটা পাথর বসিয়ে গলিয়াথের অনাবৃত কপাল লক্ষ্য করে সজোরে সেটি ছুঁড়ে মারলেন। পাথরের এই অতর্কিত এবং সজোর আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে গলিয়াথ মাটিতে পড়ে গেল। হিব্রু সেনাবাহিনী আনন্দে চীৎকার করে উঠল। স্তম্ভিত হয়ে গেল ফিলিষ্টাইনেরা।

ডেভিড ছুটে গিয়ে গলিয়াথের হাত থেকে তারই তরবারি ছিনিয়ে নিয়ে তাঁর শিরশ্ছেদ করলেন।

হতচকিত ফিলিষ্টাইনেরা যখন বুঝতে পারল যে তাদের অপরাজেয় বীর সেনাপতি গলিয়াথ নিহত হয়েছে, তখন তারা রণক্ষেত্র ছেড়ে প্রাণভয়ে দিগ্‌বিদিকে ছুটে পালাল।

ডেভিড যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এলেন। সল তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখলেন। নিজের মেয়ে মিজালের সঙ্গে বিবাহ দিলেন ডেভিডের এবং তাঁকে সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি করলেন।

এর পর ডেভিডের কাছে বহুবার পরাজিত হয়েছে ফিলিষ্টাইনেরা। এক একটি যুদ্ধজয় ইহুদিজনমানসে ডেভিডের গৌরব বৃদ্ধি করছিল। তাদের চোখে প্রধান সেনাপতি ডেভিড এক পরম পুরুষ, রাজা সলের চেয়েও অনেক বেশি সম্মানীয়। ডেভিড যখন যে রাস্তা দিয়ে যান, তার দু'পাশে জনতা ভিড় করে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়, বাতায়ন

থেকে মেয়েরা উৎসুক দৃষ্টিতে তাঁকে দেখে।

ডেভিডের এত জনপ্রিয়তা সলের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। এখন তাঁর মনে হল যে সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী আর ফিলিষ্টাইনেরা নয়,—ডেভিড। ডেভিড জীবিত থাকতে তাঁর স্বস্তি নেই। ডেভিডকে গোপনে হত্যা করার তিনি চক্রান্ত করতে লাগলেন।

কিন্তু ডেভিডের পরম সুহৃদ ছিল সলেরই এক পুত্র জোনাথন। জোনাথন সলের অনেক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে ডেভিডের প্রাণ রক্ষা করেন।

শেষ পর্যন্ত জোনাথনের পরামর্শে ডেভিড আত্মগোপন করলেন। সল ক্ষান্ত হলেন না। ডেভিডের সন্ধানে চারদিকে সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। সৈন্যবাহিনীর দৃষ্টি এড়াতে প্রাণভয়ে ডেভিড আজ এখানে কাল ওখানে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই রকম পরিস্থিতিতে একদিন ডেভিড ও তাঁর অনুচরবর্গ এসে পড়লেন রাজা সলের শিবিরের অভ্যন্তরে।

ডেভিডের এক অনুচর ডেভিডকে চিরকালের জন্য নিষ্কণ্টক করার জন্য তৎক্ষণাৎ সলকে হত্যা করতে উদ্যত হল ; কিন্তু ডেভিড বাধা দিলেন। তিনি তাকে বুঝিয়ে বললেন যে সল তাঁকে ভুল বুঝেছেন, তিনি সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী নন। এই ভ্রান্ত ধারণা যেদিন সলের দূর হবে, সেদিন তিনি আবার তাঁকে স্নেহভরে ফিরিয়ে নেবেন।

সলের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ডেভিড আর সেই অনুচরের সমস্ত কথা তিনি শুনলেন। ডেভিডের ওপর অবিচার এবং অবিশ্বাস করার জন্য অনুশোচনায় তাঁর মন ভরে উঠল। তিনি আবার সম-মর্যাদায় ডেভিডকে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনলেন।

ফিলিষ্টাইনদের সঙ্গে সলের যুদ্ধ কিন্তু একেবারে শেষ হয় নি। তাদের সঙ্গে কয়েকটি যুদ্ধে তিনি ভীষণভাবে পরাজিত হয়েছিলেন এবং মাউন্ট গিলবোয়ার যুদ্ধে ফিলিষ্টাইনদের তীরবর্ষণে তিনি এবং তাঁর পুত্র জোনাথন প্রাণত্যাগ করেন।

সলের মৃত্যুর পর ডেভিড রাজা হলেন।

ডেভিড প্রথমেই অধিকার করলেন দক্ষিণাঞ্চলে জুডা-রাজ্যের জেরুজালেম নগরটি। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত জেরুজালেম, দুর্ভেদ্য দুর্গে সুরক্ষিত। জেরুজালেমে তিনি তাঁর রাজধানী স্থাপন করলেন।

তারপর সুরু হল তাঁর বিজয়-অভিযান। প্যালেষ্টাইনের সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল তাঁর করতলগত, উত্তরাঞ্চলও প্রচুর রক্তস্রোতের মধ্যে তাঁর পদানত হল। মোয়াব, আমন, জোবা, গাজা, গাথ, এ্যাসডউড প্রভৃতি নিকটবর্তী কোন রাজ্যই আর তাঁর উদ্যত অসির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারল না। সুদূর দামাস্কাস পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হল। চতুর্দিকে তিনি শুধু পশু-শক্তির সাহায্যে হত্যার তাণ্ডবলীলা চালিয়ে গিয়েছিলেন। চল্লিশ বৎসরব্যাপী তাঁর রাজত্বকাল শুধু দেখেছে রক্তস্রোত এবং মৃত্যুর পরেও সেই রক্তস্রোতের পথ তিনিই করিয়ে দিয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পুত্রকে এই আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর আজীবন অনুগত ভৃত্য, সুহৃদ এবং রাজকর্মচারীদের যেন নির্বিচারে হত্যা করা হয়, শত্রুর শেষ কখনো যেন সে না রাখে। মৃত্যুর পূর্বে ডেভিড তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এডনেজাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থা করেছিলেন; কিন্তু বাদ সাধলেন তাঁর প্রিয়তমা রাণী বাথসেবা।

রাজসেনানী উরিয়ার ধর্মপত্নী ছিলেন এই বাথসেবা। অপূর্ব সুন্দরী, অনন্ত-যৌবনা এবং সর্বচিত্তহারিণী। ডেভিড একদিন বেড়াতে বেড়াতে স্নানরতা বাথসেবাকে দেখে মুগ্ধ হন। অনুচরদের আদেশ দিলেন মেয়েটিকে ধরে আনতে। বাথসেবাকে রাজপ্রাসাদে আনা হলে পর ডেভিড তার সঙ্গে রাত্রিযাপন করেন। বাথসেবা বাড়ি ফিরে যায় কিন্তু কিছুদিন পরে সে গর্ভবতী হয়। বাথসেবা এই সংবাদ ডেভিডকে জানালে পর ডেভিড অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন, কারণ বাথসেবার স্বামী উরিয়া তখন বহুদিন রণক্ষেত্রে। সুতরাং ডেভিড যুদ্ধক্ষেত্র থেকে

ডাক দিয়ে পাঠালেন উরিয়াকে। রাজার আহ্বানে ছুটে এলেন উরিয়া। ডেভিড তাঁর সঙ্গে আজেবাজে কিছু কথা বলে তাঁকে সে রাত্রের জন্য বাড়িতে যেতে বললেন কিন্তু উরিয়ার মন তখন পড়ে আছে যুদ্ধক্ষেত্রে। এখন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলে যুদ্ধে যেতে দেরী হয়ে যাবে। উরিয়া কিন্তু তখনই যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। ডেভিড নিরুপায় হয়ে আবার তাঁকে ডেকে আনলেন। অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়ে মত্তাবস্থায় তাঁকে বাড়িতে স্ত্রীর কাছে যেতে আদেশ করলেন। উরিয়া ভাবলেন যে ডেভিড তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতে চাইছেন যে তাঁর কাছে দেশের জন্য যুদ্ধ বড়, না নিজের সুখের জন্য সুন্দরী স্ত্রী বড়। সুতরাং তিনি বাড়িতে না গিয়ে সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন রণক্ষেত্রে।

ডেভিড এবার সেনাধিনায়কের কাছে এক সংবাদ পাঠালেন—উরিয়াকে যুদ্ধের একেবারে পুরোভাগে যেন রাখা হয়।

তাই হল। অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করে উরিয়া নিহত হলেন।

তারপর উরিয়া পত্নী সুন্দরী শ্রেষ্ঠা বাথসেবা হলেন ডেভিডের প্রিয়তমা মহিষী।

বাথসেবা মৃত্যুপথযাত্রী ডেভিডকে বললেন—আমার পুত্র সলোমন থাকতে এডনেজা কি করে রাজা হবে ?

প্রিয়তমা রাণীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করলেন ডেভিড। অনুচরদের ডেকে বললেন তারা যেন সলোমনকে তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসায়।

পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য করে নিল এডনেজা। রাজা হলেন সলোমন। সিংহাসনে বসেই নিষ্কণ্টক হবার জন্য প্রথমে হত্যা করলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এডনেজাকে।

তারপর পিতৃ-আদেশ পালনে তৎপর হলেন তিনি। পিতার একান্ত অনুগত কর্মচারীদের হত্যা করে পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখালেন, সেই সঙ্গে নিজের খুশিমত হত্যা করলেন আরো কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী

রাজকর্মচারীকে। সর্বদিক দিয়ে রাজ-সিংহাসন সুরক্ষিত করে তিনি ক্ষান্ত হলেন। এর পরে আর তাঁর হাত কোনদিন রক্ত কলুষিত হয় নি।

ইহুদিদের রাজা হিসেবে নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিমান, সুবিচারক ও বহু আইন-প্রণেতা ছিলেন তিনি। সমগ্র দেশকে সংহত করে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা এনেছিলেন। দেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে ছিল তাঁর সদা-জাগ্রত দৃষ্টি। নানাবিধ ব্যবসায়ে এবং বিদেশী বণিকদের পণ্যদ্রব্যের ওপর করধার্য করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। বহুমূল্য রত্ন আহরণ করে তিনি রাজকোষ পূর্ণ করেন। ডেভিডের বন্ধু টায়ারের রাজা হিরামের সঙ্গে বন্ধুত্ব দৃঢ়তর করে তাঁরই সাহায্যে তিনি ইহুদি-দেবতা য়াভের জন্য জেরুজালেমে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরটিই ইহুদিদের প্রথম স্থায়ী মন্দির। এই মন্দিরের চেয়ে অবশ্য অনেক বড়, অনেক সুন্দর এক রাজপ্রাসাদ নিজের জন্য তৈরি করেছিলেন!

দেশবিদেশে তাঁর ঐশ্বর্যের কাহিনী, তাঁর ন্যায় বিচারের যশ বিস্তৃত হয়েছিল। মিশরের ফারাও স্বেচ্ছায় সলোমনের সঙ্গে তাঁর এক কন্যার বিবাহ দেন। সাঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্বের পর খৃঃ পূঃ ৯৩৭ অব্দে তিনি মারা যান।

সলোমনের মৃত্যুর পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র রেহোবোয়াম।

সুরু হল সলোমনের বিশাল সাম্রাজ্যের ভাঙন। বিলাস-ব্যসনে মগ্ন সাঁয়ত্রিশ বৎসর কাল সলোমনের রাজত্বে সমস্ত হিব্রুসাম্রাজ্য সামরিক এবং নৈতিক দিয়ে হীনবীর্য হয়ে পড়ে। ব্যবসা ও বাণিজ্যে দেশের ঐশ্বর্য যেমন বৃদ্ধি লাভ করছিল, ঠিক সেইরকম ধনী ও দরিদ্র দেশ-বাসীর মধ্যে জীবনযাত্রার মানের পার্থক্যও বেড়ে গিয়েছিল। একদিকে তৈরি হচ্ছিল ধনীদের বিরাট বিরাট অট্টালিকা, অপর দিকে গড়ে উঠছিল দরিদ্র শ্রমিক ও কৃষকদের অন্ধকার বস্তি। একদিকে

ঐশ্চর্য ও ভোগবিলাস, অপরদিকে দারিদ্র্য ও অনাহার।

তাছাড়া দেশের সংহতি রক্ষার আর একটি প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল দেশের ভৌগোলিক অবস্থান। উত্তরাঞ্চল ইজরায়েল উর্বর ও শস্যশ্যামল, দক্ষিণাঞ্চল জুডা উষর মরুভূমি। ইজরায়েল ছিল ঐশ্বর্যময়, তার জীবনযাত্রা স্থিতিবান, কিন্তু জুডা ছিল দরিদ্র—জীবনযাত্রা প্রায়-যাযাবরী এবং কঠোর। সুতরাং ইজরায়েল ও জুডার অধিবাসীরা সকলেই ইহুদি হওয়া সত্ত্বেও দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ঈর্ষা এবং বিরোধ ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠতে থাকে।

সলোমনের মত বিচক্ষণ এবং শক্তিশালী রাজা হলে রেহোবোয়াম হয়ত এই বিরোধ দমন করে দেশের সংহতি রক্ষা করতে সক্ষম হতেন; কিন্তু পিতার কোন গুণ ছিল না পুত্রের মধ্যে। হঠকারী এবং তোষামোদপ্রিয় রেহোবোয়াম চালিত হতেন চাটুকার বন্ধুদের কথায়।

সলোমনের বিলাস-ব্যসন এবং অসংখ্য পত্নী ও উপপত্নীর খামখেয়ালির মাশুল যোগাতে দেশের লোকদের রাজকোষে প্রচুর কর দিতে হত। রোহোবোয়াম রাজা হলে দেশবাসীর ধারণা হল যে তিনি তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা চিন্তা করে হয়ত করভার লাঘব করবেন।

করভার পীড়িত দেশবাসীর মুখপাত্র হয়ে জেরোবোয়াম গেলেন রাজার কাছে। দেশবাসীর প্রার্থনা নিবেদন করলেন তিনি। বন্ধুদের প্ররোচনায় রেহোবোয়াম উদ্ধত উত্তর দিলেন যে তিনি তাঁর পিতার চেয়েও ক্ষমতাবান, সুতরাং প্রজাদের পিতার চেয়েও নির্মম এবং কঠোর শাসনে বদ্ধপরিকর। "My father chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions."

এই উদ্ধত আচরণে ক্ষুব্ধ ইজরায়েল রেহোবোয়ামের কর্তৃত্ব অস্বীকার করল। হিব্রু রাজ্য দুই ভাগ হয়ে গেল—ইজরায়েল ও জুডা। রেহোবোয়াম রইলেন জুডার রাজা, রাজধানী জেরুজালেম। ইজরাইলের রাজা হলেন জেরোবোয়াম, রাজধানী সামারিয়া।

সুরু হল দুই ইহুদি রাষ্ট্র ইজরায়েল ও জুডার মধ্যে আমরণ বিরোধ এবং এই বিরোধের ফল স্বরূপ দুটি ইহুদি রাষ্ট্রই ধ্বংস হয়েছিল— প্রথমে ইজরায়েল, কিছুদিন পর জুডা।

সামান্য কারণে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিনিয়ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বেধে থাকত। অর্থ নষ্ট ও লোকক্ষয়ে দুই রাষ্ট্রই দিন দিন হীনবল হয়ে পড়তে লাগল। বহিশত্রুর আক্রমণ থেকে স্ব-দেশ রক্ষা করার সামর্থ্য রইল না কোন দেশেরই।

এই সুযোগ নিলেন মিশরের তরুণ ফারাও শিশাক। সলোমনের বিশ্ব-বিশ্রুত ঐশ্বর্যের কথা তিনি বিস্মৃত হন নি। রেহোবোয়ামের রাজত্বের একযুগও তখনো পূর্ণ হয় নি, বিরাট এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে জুডা আক্রমণ করলেন শিশাক। জুডার এই নিদারুণ দুর্যোগে উল্লসিত হয়ে উঠল ইজরায়েল। স্বজাতির বিপর্যয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না তারা। শিশাক সহজেই রেহোবোয়ামকে পরাজিত করে জেরুজালেম অধিকার করলেন। কিন্তু মিশর থেকে এতদূরে এই অনুর্বরা মরুপ্রধান দেশকে নিজ-অধীনে রাখার ইচ্ছা তাঁর একেবারেই ছিল না। সলোমনের সমস্ত ঐশ্চর্য লুণ্ঠন করে বিজয়ী বীর শিশাক মিশরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

দুই শতাব্দী ধরে ইজরায়েল ও জুডার ইতিহাস শুধু একই রকম অন্তর্যুদ্ধের কাহিনী।

ঠিক এই সময়ে পূর্বাঞ্চলে আর একটি জাতি ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করছিল। কিছুদিনের মধ্যেই আসিরীয় জাতি অসীম শক্তিশালী হয়ে উঠে এক বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করে। দিগ্‌বিজয়ের জন্য তখন দিকে দিকে আসিরীয় সৈন্যবাহিনী হানা দিয়ে ফিরছে।

ইজরায়েল তখনও ভুলতে পারে নি জুডাকে। জুডাকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য সিরিয়াকে আমন্ত্রণ

জানাল। সিরিয়া ও ইজরায়েল একত্রিত হয়ে জুডার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রস্তুত হতে লাগল।

প্রমাদ গণল জুডা। এক রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর। সিরিয়াও ইজরায়েলের সম্মিলিত সামরিক শক্তির কাছে ক্ষুদ্রপ্রাণ জুডা কতক্ষণ টিঁকবে? জুডা আসিরীয় সম্রাটের কাছে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করতে দূত পাঠাল। আসিরীয় সম্রাট চতুর্থ সালামানেসার নতুন রাজ্যজয়ের সুযোগ খুঁজছিলেন। জুডা-রাজের এই আমন্ত্রণ সানন্দে তিনি গ্রহণ করলেন।

খৃঃ পূঃ ৭৩৩ অব্দে চতুর্থ সালামানেসার সিরিয়া ও ইজরায়েল আক্রমণ করলেন। বীর বিক্রমে সিরিয়া আসিরিয়ার প্রবল আক্রমণে বাধা দিল। শেষ রক্ষা করতে পারল না তারা, পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল! কারকারের যুদ্ধে সিরিয়া সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হল। দামাস্কাস অধিকার করলেন সালামানেসার। সাইলেসিয়া ও সিরিয়া আসিরিয়ার পদানত হল।

সিরিয়ার সঙ্গে আসিরিয়ার যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করে সন্ত্রস্ত ইজরায়েল-অধিপতি হোসিয়া আসিরীয় আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য গোপনে মিশরের ফারাও তাহারকার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করলেন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই সালামানেসার বিদ্যুৎগতিতে সসৈন্যে ইজরায়েলে উপস্থিত হলেন। ইজরায়েল বাধা দিল, কিন্তু একটির পর একটি যুদ্ধে তারা পরাজিত হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আসিরীয় বাহিনী সামারিয়ার প্রাচীরবেষ্টনীর বাইরে এসে উপস্থিত হল। সামারিয়া আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করায় সালামানেসার সামারিয়া অবরোধ করলেন। তুই বৎসর ধরে অবরোধের পর একদিন সালামানেসার গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হলেন। তখন আসিরিয়ার সম্রাট হলেন দ্বিতীয় সারগন। এক বছর অবরোধের পর তিনি সামারিয়া অধিকার করলেন।

দ্বিতীয় সারগন ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর, অত্যন্ত কোপনস্বভাব।

আসিরিয়ার বিরুদ্ধে হোসিয়ার ফারাওকে আমন্ত্রণের কথা তিনি বিস্মৃত হন নি। ইজরায়েলের অধিবাসীদের মরণ-পণ সংগ্রামেও তিনি বিস্মৃত হন নি। ইজরায়েল-রাজ হোসিয়াকে বন্দী করে তাঁর দুই চোখ তুলে নিয়ে অন্ধ করে দিলেন। তারপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য ইজরায়েলবাসী সমস্ত ইহুদিকে বন্দী করে আসিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে দাসরূপে চালান দিয়ে ইজরায়েলে নতুন লোক এনে বসতি স্থাপন করলেন।

নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ইহুদি-রাষ্ট্র ইজরায়েল।

কিন্তু তখনও টিঁকে রইল আরো একটি ইহুদি রাষ্ট্র—জুডা।

জ্ঞাতি-শত্রু ইজরায়েলের এই শোচনীয় নিশ্চিহ্নতায় উল্লসিত হয়ে উঠল জুডা। পশ্চিমে রাজ্য-বিস্তারের লোভ আসিরিয়াকে দেখিয়েছে জুডা, নবরাজ্যলাভের পথ সুগম করে দিয়েছে। আসিরিয়ার লোভী হাত এবার প্রসারিত হল জুডার দিকে।

দ্বিতীয় সারগনের মৃত্যুর পর আসিরিয়ার সম্রাট হলেন সেন্নাচেরিব। উচ্চাভিলাষী, পরাক্রান্ত দুর্দম বীর তিনি। আফ্রিকা পর্যন্ত আসিরীয় সাম্রাজ্য-বিস্তারের তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন। গোপনে প্রস্তুত হতে লাগলেন তিনি।

তদানীন্তন জুডা-রাজ হেজাকিয়া আসিরীয় আক্রমণের প্রস্তুতিতে ভীত হয়ে মিশরের ফারাও তাহারকার কাছে পরস্পর সাহায্যের ভিত্তিতে সন্ধিপত্র পাঠালেন। এদিকে ব্যাবিলোনে আসিরীয় শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসী বিদ্রোহ করল। সেন্নাচেরিব সসৈন্যে ব্যাবিলোনে উপস্থিত হয়ে নিষ্ঠুর হাতে সেই বিদ্রোহ দমন করলেন।

এইবার তাঁর দৃষ্টি পড়ল মিশরের দিকে। আসিরীয় অভিযানের বিরুদ্ধে মিশর যে সিরিয়া ও ইজরায়েলকে সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়েছিল—একথা ভুলতে পারেন নি আসিরিয়ার সম্রাট সেন্নাচেরিব।

জুডা-রাজ হেজাকিয়াও যে মিশর-রাজ্যের করুণাপ্রার্থী—এ সংবাদও তাঁর কর্ণগোচর যথাসময়ে হয়েছিল।

সুতরাং সেন্নাচেরিবের আসিরীয় বাহিনী মিশর অভিযানের পথে জুডা আক্রমণ করল। হীনবীর্য, হৃতবল জুডা আসিরীয় বাহিনীকে কোন-রকম বাধা দিতে পারল না। আসিরীয় বাহিনী অতি সহজেই একটির পর একটি জুডার নগরী অধিকার করে জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

আসিরীয় বাহিনীর হাতে জ্ঞাতি-রাষ্ট্র ইজরায়েলের শেষ পরিণতির কথা মনে পড়ল হেজাকিয়ার। জুডা-ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। জুডাকে রক্ষা করা চাই, নিজের প্রাণ রক্ষা করা চাই। সুতরাং সেন্নাচেরিবের চির-অধীনতা স্বীকার করে বিনীত অনুনয় করে এই একতরফা যুদ্ধ থেকে নিরস্ত্র হতে পত্র দিলেন সেন্নাচেরিবকে। দূতের সঙ্গে পাঠালেন খেসারত হিসেবে প্রচুর ধনরত্ন।

হেজাকিয়ার কাতর ক্রন্দনে সেন্নাচেরিব ক্ষান্ত হলেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে যেন আর কোনদিন জুডা আসিরিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহসী না হয় সেইজন্য তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী পাঠালেন জেরু-জালেমে। এই সৈন্যবাহিনী জুডার সমস্ত অধিবাসীকে চূড়ান্ত অপমান এবং ভীতিপ্রদর্শন করেছিল। এই অপমানের হাত থেকে হেজাকিয়াও পরিত্রাণ পান নি।

প্রায় এক শতাব্দীকাল জুডা কিছুটা শান্তিতেই ছিল। ক্ষমতাশালী আসিরিয়ার অধীনস্থ রাজ্য জুডা বহিরাক্রমণ থেকে একরকম নিশ্চিন্ত ছিল। জুডার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনার সন্ধান এই সময়ে আর পাওয়া যায় না।

জুডার উল্লেখ আবার পাওয়া যায় মিশরের ফারাও প্রথম নেকোর রাজত্বকালে। আসিরিয়া সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরেছিল, বহুদিন একাধিপত্য করার পর অন্তর্দ্বন্দ্বে হীনবল হয়ে পড়েছিল তারা। খৃঃ পূঃ ৬০৮ অব্দে

মিশরের ফারাও প্রথম নেকো আসিরীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে আসিরিয়ার আশ্রিত জুডাকে আক্রমণ করেন। জুডার রাজা জোস্বুয়া প্রাণপণে সংগ্রাম করে মৃত্যুবরণ করেন।

আসিরিয়ার ক্ষমতালোপের সময় মিড জাতি শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। খৃঃ পূঃ ৬০৬ অব্দে এই নবজাগ্রত শক্তি মিডিসদের আক্রমণে আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটল। দাসত্ব-মুক্তির আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল জুডা।

কিন্তু সেই আনন্দ হল স্বল্পস্থায়ী। আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতনে ব্যাবিলোনে নতুন ক্যালডীয় শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠেছে। খৃঃ পূঃ ৬০৪ অব্দে ক্যালডীয় সম্রাট নেবুকাডনেজার মিশরের বিরুদ্ধে সমরাভিযান চালালেন। পথিমধ্যে পড়ল জুডা। জুডা ব্যাবিলোনের পদানত হল। মিশরবাহিনীও পরাজিত হয়ে ফিরে গেল।

আসিরীয় শক্তির কাছ থেকে সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জুডারাজ জোহো-ইয়াকিম পুনরধীনতায় অশান্ত হয়ে পড়লেন। দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি মিশরের সঙ্গে ব্যাবিলোনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। নেবুকাডনেজার আবার সৈন্য পাঠালেন জেরু-জালেমে। জোহোইয়াকিম এবং তাঁর সঙ্গে দশ হাজার ইহুদিকে বন্দী দাস হিসাবে নিয়ে এলেন ব্যাবিলোনে এবং জোহোইয়াকিমের ভ্রাতা জেডকিয়াকে জুডার রাজা ঘোষণা করলেন।

জুডা কিন্তু এই অধীনতা স্বীকার করতে চাইল না। জেডকিয়াও ব্যাবিলোনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। ক্রোধান্ধ হয়ে উঠলেন নেবুকাডনেজার। ইহুদি-সমস্যা চিরকালের জন্য সমাধান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নেবুকাডনেজার নিজে সৈন্যবাহিনী নিয়ে জুডা আক্রমণ করলেন। অসমসাহসের সঙ্গে জুডা ক্যালডীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, কিন্তু ক্যালডীয় বাহিনীর উন্নততর রণনৈপুণ্যে জুডা শেষ পর্যন্ত বিধ্বস্ত হল। জেডকিয়া বন্দী হলেন।

জুডার প্রতি এতটুকু করুণা দেখালেন না নেবুকাডনেজার। বন্দী

জেডকিয়ার সম্মুখে তাঁর পুত্রদের একের পর এক হত্যা করা হল। তারপর জেডকিয়াকে অন্ধ করে দেওয়া হল।

এই অত্যাচারেও তৃপ্ত হলেন না নেবুকাডনেজার। আসিরীয় সম্রাট দ্বিতীয় সারগন ইজরায়েল জয়ের পর যা করেছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি করলেন ব্যাবিলোন-রাজ নেবুকাডনেজার—কিন্তু এক্ষেত্রে বলি হল অপর ইহুদি রাষ্ট্র জুডা।

নেবুকাডনেজারের আদেশে জুডার প্রতিটি ইহুদি অধিবাসীকে বন্দী দাসরূপে ব্যাবিলেনে প্রেরণ করা হল।

হিব্রু-ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বরের উক্তি লেখা আছে। তাঁর নির্বাচিত লোকদের মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদের প্রভু, ঈশ্বর। মিশর থেকে তোমাদের নিয়ে এসেছি যাতে তোমরা আর দাস না হয়ে থাক।

কিন্তু মাত্র ছয়শ' বছরের মধ্যে আবার পৃথিবীর সব ইহুদি দাসত্ব বরণ করল।

জুডা ও ইজরায়েল—দুই ইহুদি-রাষ্ট্রই ইহুদিহীন হল।

সমগ্র প্যালেষ্টাইন ইহুদিশূন্য হল খৃঃ পূঃ ৫৮৬ অব্দে।

এই নির্বাসিত বন্দী ইহুদিদের ক্রন্দন অশ্রুসিক্ত অক্ষরে লেখা রইল বাইবেলে—ওল্ড টেষ্টামেন্টের পাতায় ঃ

> বিদেশীদের অধিকারে আজ আমাদের বাসভূমি, আমাদের উত্তরাধিকার।
> পিতৃহীন আমরা। আমাদের মায়েরা স্বামীহীনা।
> আমাদের পিতৃপুরুষকৃত পাপের ফলভোগ করছি আমরা।
> আমাদের হৃদয়ে আর কোন আনন্দ নেই।…

এই নির্বাসনে যাত্রার পথেই পবিত্র জর্ডন নদীর জলস্পর্শ করে প্রতিটি ইহুদি শপথ নিয়েছিল তাদের ধর্মনগরী জাতির পীঠস্থান জেরু-

জালেমের প্রতি চির-আনুগত্যের। সমকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলঃ হে জেরুজালেম, যদি অমি কখনো তোমায় বিস্মৃত হই তাহলে যেন আমার দক্ষিণ বাহু চির-পঙ্গু হয়।...

তারপর ...

আবার ফিরে এসেছিল কিছু সংখ্যক ইহুদি প্যালেষ্টাইনে। প্রায় পৌনে পাঁচশ বছর তারা ছিল সে-দেশে, কিন্তু তারা আর কোন ইতিহাস রচনা করতে পারেনি। মাত্র একবার ইতিহাসে তারা তাদের নাম লেখবার দুরন্ত আশায় জেগে উঠেছিল, কিন্তু তা নির্বাপনোন্মুখ প্রদীপের ক্ষণদীপ্তি মাত্র। তারপর অন্ধকার—দুই হাজার বৎসরব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকার।

মাত্র আটচল্লিশ বছর ছিল ব্যাবিলোনে তাদের বন্ধনদশা।

পারস্য-সম্রাট সাইরাসের আক্রমণে ক্যালডীয় ব্যাবিলোন পরাজিত হল খৃঃ পূঃ ৫৩৯ অব্দে। মুক্তি দিলেন পারস্য-সম্রাট ইহুদিদের। এমন কি নেবুকাডনেজার কর্তৃক লুণ্ঠিত সলোমনের ধনরত্নের অবশিষ্টাংশও তাদের হাতে প্রত্যর্পন করলেন।

এবার প্যালেষ্টাইনে ফিরে যাওয়ার পালা। ব্যাবিলোনের সমৃদ্ধি ও অনায়াস জীবনযাত্রার লোভে অনেক ইহুদি সেখানেই রয়ে গেল, কিন্তু অনেককে হাতছানি দিল তাদের পুরাতন দেশ। তারা ফিরে এল জেরুজালেমে।

কিন্তু তখন জেরুজালেমে আর এক সেমেটিক জাতি বসবাস করছে। ইহুদিরা ফিরে এসে তাদের বাসভূমি দাবী করলে সংঘর্ষ বাধল এই সেমেটিক জাতির সঙ্গে। কিন্তু ইহুদিদের জেরুজালেমে পুনর্বাসনের জন্য পেছনে ছিল পারস্য শক্তি। সেমেটিক জাতির প্রবল বিরোধিতা সত্বেও তারা আবার সেখানে তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হল।

দিগ্বিজয়ী ম্যাসিডোনাধিপতি আলেকজান্দারের হাতে পারস্য-সম্রাট

দারিয়ুসের পরাজয়ের পর জেরুজালেম আসে ম্যাসিডোনের অধীনে। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য তাঁর সেনাপতিরা ভাগ করে নিলে জেরুজালেম মিশরাধিপতি টলেমির অধীনস্থ হয়। প্রায় এক শতাব্দী তারা রয়ে গেল মিশরের অধীনে। তারপর সিরিয়ার সেলুসিডরা প্রবল হয়ে উঠে জেরুজালেম অধিকার করে ; কিন্তু এই অধিকার শুধুমাত্র দেশ অধিকার নয়। তারা ইহুদিদের ধর্মের ওপর আঘাত করল। মৃত্যুভয় দেখিয়ে ধর্মের পরিপন্থী সমস্ত কাজের নির্দেশ দিতে লাগল। ধর্মপ্রাণ ইহুদিদের নির্যাতন আর লাঞ্ছনার শেষ রইল না।

এবার ইহুদিরা সঙ্ঘবদ্ধ হল জুডাস মাক্কাবিয়াসের নেতৃত্বে। সেলুসিড-দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল জেরুজালেম এবং শেষ পর্যন্ত খৃঃ পূঃ ১৪২ অব্দে আবার জেরুজালেম স্বাধীনতা লাভ করে।

কিন্তু ইহুদি-স্বাধীনতার প্রাণশক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। রোম-সম্রাট টাইটাস খৃঃ পূঃ ৭১ অব্দে জেরুজালেম বিধ্বস্ত করেন। সেই ধ্বংস লীলায় রক্ষা পায়নি ইহুদিদের প্রথম এবং প্রধান ধর্মমন্দির। মন্দিরের সীমান্ত-প্রাচীরের একাংশ শুধু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। আজো সেই প্রাচীর আছে—ধর্মপ্রাণ ইহুদিদের পরম তীর্থস্থান, যার ওপর মাথা কুটে তারা অতীতের কথা স্মরণ করে ক্রন্দন করে—সেই বিশ্বখ্যাত Wailing Wall.

ইহুদি-স্বপ্ন শেষ হল খৃঃ পূঃ ৬৩ অব্দে। রোম্যান সেনাপতি প্যালেষ্টাইন অধিকার করে তাকে রোম্যান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত করে নিলেন।

এবার ইহুদিদের দেশত্যাগের পালা। সুরু হল স্বেচ্ছা-নির্বাসন। দলে দলে তারা দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। পরাধীন হয়েই যদি থাকতে হয় তো যে-কোন দেশেই থাকা যায়। যে-দেশে জীবনযাপন স্বচ্ছল, অনায়াসলভ্য সেখানে থাকাই ভাল।

ইহুদিদের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ পড়ে রইল জেরুজালেমে।

প্যালেস্টাইনে সল-এর রাজা হওয়ার সময় হিব্রু-পুরোহিত স্যামুয়েল যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছিল :

> এই রাজপদ সৃষ্টি করার ফলে দুঃখকষ্ট ভোগ করার জন্য একদিন তোমাদের ক্রন্দন করতে হবে। কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের সেই ক্রন্দনে কর্ণপাত করবেন না।

৩

এই নিয়ে তিনটে মিছিল চলে গেল সামনের রাস্তা দিয়ে, এই সকাল-বেলাতেই। হোটেলে আমার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে তিনবারই দেখলাম—তিনটেই ফেষ্টুন এবং পতাকাশোভিত মিছিল। পথের দুধারে লোক সারবদ্ধ হয়ে দেখতে লাগল এই মিছিল, জানলায় জানলায় ভিড়। স্লোগানের বলিষ্ঠ ধ্বনিতে সমস্ত পল্লী মুখরিত।

জানলায় দাঁড়িয়ে এই মিছিল দেখতে দেখতে আমার মনে পড়ে গেল কলকাতার কথা—সিটি অব প্রসেসন্স এ্যাণ্ড স্লোগান্স্। এতদিন বাদে হঠাৎ বাতাসে কলকাতার গন্ধ অনুভব করলাম। মিছিলের প্রত্যেকটি লোককেই মনে হল আমার অত্যন্ত পরিচিত—যেন কলকাতারই একটি মিছিল চলেছে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে ময়দানে, মনু-মেণ্টের তলায়—মুখে সেই চিরপরিচিত ধ্বনি: আমাদের দাবী মানতে হবে। ইঙ্কলাব জিন্দাবাদ।

স্লোগানের ভাষা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি না, কিছু কিছু পারছি। এবং বুঝতে পেরে আমার সমস্ত শরীরে মনে এক অসহায় অস্থিরতা এসে বাসা বাঁধে। কয়দিন ধরেই মধ্য-প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিলতর হয়ে উঠছে—এক একটি ঘটনা যেন নাটকের এক একটি দৃশ্যের মত এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিকে একটি চরম নাটকীয় মুহূর্তের দিকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাচ্ছে। সংবাদ-পত্র, বেতার এবং লোক মারফৎ যে-সব ঘটনা এবং গুজব শুনতে পাচ্ছি তাতে আর কারুর না হোক—আমার শঙ্কিত হওয়া বিচিত্র নয়।

দেশ থেকে এদিকে আসার আগে আমার আত্মীয়স্বজনেরা এখন যেতে মানা করেছিলেন। মীন রাশিতে শনির অবস্থান খুব ভাল যোগ নয়। একজন গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা এনে রাষ্ট্রগত বর্ষফল পড়ে শুনিয়েছিলেন:

'সমগ্র আরব রাজ্য ও ইস্রাইলদের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ এমনকি যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। নাসেরের বহু বিপদের যোগ দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহার শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন কিংবা নূতন শাসনপ্রণালীর প্রবর্তন সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করি। বহু নায়কের পতন এবং নব নায়কের আবির্ভাব ঐ দেশসমূহে বিশেষ ঘটনা বলিয়া মনে করি।'

কিন্তু ঠিকুজি-কুষ্ঠি-পঞ্জিকা মিলিয়ে চাকরি করা বা চাকরি রাখা কোন দিনই সম্ভব নয়। আমার পক্ষে অন্তত নয়। এতদিন বেকারির পর এই চাকরি পঞ্জিকার ভবিষ্যৎ গণনার ওপর নির্ভর করে খোয়ানো আমার কাছে যুক্তিযুক্তও মনে হয় নি।

মধ্যপ্রাচ্যে অর্থাৎ আরবদেশে হিন্দি ফিল্মের ব্যবসায়িক উন্নতি ও প্রসারের ব্যবস্থা করাই আমার বর্তমান মিশন। মিশরে যা কিছু করার, যা কিছু দেখার সব শেষ; সিরিয়া, ইরাক, লেবানন, জর্ডন এবং সৌদি আরবের কাজ শেষ করতে পারলেই ছুটি। চিঠিপত্র আগেই লেখা হয়েছিল এই সব দেশের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের প্রতিনিধিদের আমার সঙ্গে বেইরুতে দেখা করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে, কায়রো থেকে আবার চিঠি দিয়েছি। এদের সঙ্গে কথাবার্তার পর সমস্ত কাজকর্ম চুকে গেলেই দেশে ফেরা। রুটিনমাফিক কাজ হলে মাত্র আর কয়েক-দিনের মধ্যেই আমার কাজ সারা। কিন্তু পরিস্থিতি দিনকে দিন যদি এরকম ঘোরালো হয়ে উঠতে থাকে তবে কতদিনে যে এদেশ ছাড়তে পারব বলতে পারি না এবং সেই কথা চিন্তা করেই আমার ভয়।

কখন যে জানলায় আমার পাশে হোটেলের এই ডবল-সিটেড্ রুমের আর এক বাসিন্দা করিমী সাহেব এসে দাঁড়িয়েছেন, খেয়াল করে উঠতে পারি নি। মিছিল শেষ হয়ে গেলে পর তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়ল। মিঃ করিমী সিরিয়ার অধিবাসী।

তিনিও জানলা দিয়ে এই মিছিল দেখছিলেন।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—দেখলেন তো সমস্ত আরব জাতি আজ কেমন এক হয়ে উঠেছে। অথচ এই জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি

করার জন্য ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স আর আমেরিকা কম চেষ্টা করেনি।

আমার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল—আর রাশিয়া?

করিমী সাহেব উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, রাশিয়াকেও বলতে পারেন। তবে এই মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার প্রভাব কতটুকু ছিল? সমস্ত দেশই তো ছিল ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সের পদানত। গত বিশ্বযুদ্ধে বড় ভাই হিসেবে আমেরিকা এসে নাক গলালো এবং এখন কলকাঠি নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখছে। আমেরিকা যদি আসে, ক্যান রাশিয়া বি ফার বিহাইণ্ড?

জানলা থেকে সরে এসে তুজনে তুটো চেয়ার টেনে বসলাম। টেবিলে ধূমায়িত কফি।

করিমী বলে চললেন—আপনাদের দেশের মত আমাদের দেশগুলোও বিদেশীদের লুণ্ঠন, নিপীড়ন আর শোষণে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। জাগ্রত গণ-চেতনার কাছে নতি স্বীকার করে যখন তারা দেশ ছেড়ে চলে গেল, তাদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার জন্য বিভেদের বীজ ঢুকিয়ে দিয়ে গেল দেশে দেশে। কার নেতৃত্ব কে মেনে নেবে? প্রত্যেকে প্রত্যেককে সন্দেহ করে। প্রত্যেকেই নেতা হতে চায়—তার সে শক্তি থাক বা না থাক। সেইজন্যই কেউ এক হতে পারল না, এক সঙ্গে এক গলায় তারা দাবী জানাতে পারল না, প্রতিবাদ করতে পারল না।

বাইরে আবার উত্তাল কলরোল। এবারে চলেছে ছোটদের এক মিছিল—উচ্ছ্বাস এবং উল্লাস এদের অনেক বেশী, সুতরাং গোলমালও।

সেই দিকে তাকিয়ে করিমী বললেন—সবাই আরব জাতির একতার জয়গান করছে, নাসেরের জয়ধ্বনি দিচ্ছে, ইজরায়েলের ধ্বংস কামনা করছে। আজ আরব জাতির এই একতা এনেছেন নাসের। ছোট-বড় স্ত্রী-পুরুষ সকলের মুখেই এখন একটি নাম—'নাসের।' আরবজাতির একতার প্রতীক নাসের। মিশর এখন আরবজাতির নেতৃত্ব করছে, অথচ ভৌগোলিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক দিক দিয়ে এই নেতৃত্ব নেওয়া উচিত ছিল লেবাননের। আরবজাতির মহামিলন কেন্দ্র হওয়া উচিত ছিল এই বেইরুতের।

বললাম—বেইরুত তো দেখছি এক বারোয়ারি জায়গা, এখানে বিশেষ এক জাতির আন্দোলনের বা মিলনের সুযোগ কোথায় ?

করিমী বললেন—আপনি ঠিকই বলেছেন—বেইরুত এক ইণ্টারন্যাশানল সেণ্টার, লেবানন ঠিক সুইজারল্যাণ্ডের মত। পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোককে এখানে পাবেন সব সময় সব জায়গায়। গোপন পরামর্শ এখানে হবে কি করে ? এখানকার সব খবরই কানাকানি থেকে সকলের জানাজানি হয়ে যায়। পৃথিবীর সবদেশের কথাই এখানে ভেসে আসে, এখান থেকে দেশবিদেশে পাচার হয়ে যায়।

একটু থেমে করিমী আবার বলতে লাগলেন—ইরাক নিতে পারত নেতৃত্ব, নুরি সইদের সে ক্ষমতাও ছিল। কিন্তু বড় স্বার্থপর। নিজের স্বার্থের জন্য তিনি আরব-সংহতি নষ্ট করতেও বসেছিলেন। নাসেরের সঙ্গে তাঁর বনেনি। মিশর যে নেতৃত্ব নেবে সে কথা কিন্তু বহুদিন আগে —বোধ হয় ১৯৫১ সালে—বলে গিয়েছিলেন আমাদের সিরিয়ারই সাতি এল-হুসরি। তিনি তাঁর বইয়ে লিখেছিলেন: 'প্রকৃতিদেবী মিশরকে সহজাত এমন চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন যার জন্য আরব জাতীয়তাবাদের পুনরুজ্জীবনের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ তাকে করতেই হবে।' আজও বিভিন্ন আরব জাতির মধ্যে বিভেদ প্রচুর, ঈর্ষা এবং সন্দেহও কম নয়—কিন্তু সকলে এক হতে পেরেছে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে। এই নেতৃত্ব প্রথম নিয়েছিলেন সৌদি আরবের আবদাল্লা, কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব বজায় রাখতে পারেন নি। আজ চলে এসেছে মিশরের হাতে—এই মিশর, যারা নিজেদের সমস্যা নিয়েই এত জর্জর ছিল যে প্যালেষ্টাইনের কথা চিন্তা করার কোন সময়ই কোনদিন পায় নি।

করিমী সাহেবের কাছে বসে বসে শুনলাম আরব জাতির উজ্জীবনের ইতিহাস। ইতিহাসের অধ্যাপক তিনি। বেইরুতে এসেছিলেন একটি সেমিনারে যোগদান করতে, আজ সন্ধ্যাবেলায় আবার দেশে ফিরে যাবেন।

আমার হাতে এখন আর কোন কাজ নেই। স্বভাবের দিক দিয়ে ঘর-কুনো, বাইরে বেরোতে ভাল লাগে না। কাজের জন্য যতটুকু বাইরে ঘোরা—তা ছাড়া ঘুরে বেড়িয়ে কিছু দেখবার উৎসাহ আমার কোন-কালেই নেই।

আলি, বেরিন—কাউকেই এখন পাব না। যে যার নিজের কাজে এতক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে। দু'একটা চিঠি লিখলাম। তবু সময় যেন কাটে না।

খবরের কাগজটা বিছানার ওপর পড়েছিল। L'Orient. খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

২৮ শে মে, ১৯৬৭।

বড় বড় হরফে নাসেরের ঘোষণা সংবাদ পত্রের প্রথম পাতায়ঃ 'আকাবা উপসাগরের মুখে তিরাণ প্রণালী মিশর রাজ্যের অন্তর্ভূত এবং পৃথিবীর কোন শক্তিই মিশরের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

'১৯৫৬ সালের পূর্বেও যেমন এই প্রণালী অতিক্রমকারী ইজরায়েলী জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, এখনও যদি আবার কোন ইজরায়েলী জাহাজ এই প্রণালী অতিক্রম করার চেষ্টা করে তবে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে।'

মনে পড়ে গেল আর কিছুক্ষণ আগে করিমী সাহেবের কাছে শোনা আরব ইজরায়েলের বর্তমান রেষারেষির ইতিহাস।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে সুয়েজ যুদ্ধে ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের সক্রিয় সাহায্যে ইজরায়েল মিশরের বিরুদ্ধে জয়লাভ করল বটে, কিন্তু অধিকৃত ভূমি রাখতে পারল না। রাষ্ট্রসঙ্ঘ অর্থাৎ আমেরিকা ও রাশিয়ার চাপে ছেড়ে দিতে হল। রাষ্ট্রসঙ্ঘবাহিনী এল সিনাই ও গাজা অঞ্চলে দুই দেশের সৈন্যবাহিনীকে তফাৎ রাখতে। আকাবা উপসাগরের মুখে অবস্থিত মিশরের শর্ম এল-সেখও রাষ্ট্রসঙ্ঘবাহিনীর হাতে ছেড়ে দিতে হল।

`৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রায় জোর করে গঠনের ফলে আরব রাষ্ট্রসমূহ ইজরায়েলকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয় নি। পাশ্চাত্য শক্তির এই কূটচক্রান্ত দূর করার জন্য তারা বদ্ধ পরিকর। ইজরায়েল যতটুকু জায়গা পেয়েছে তাতে কিন্তু সন্তুষ্ট নয়। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের দৌলতে প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্র ক্ষুদে সাম্রাজ্যবাদী। তার দৃষ্টি সমগ্র জেরুজালেম শুধু নয়, আরো অনেক বেশী। উটের কুঁজের মত জর্ডন নদীর কোল ঘেঁষা জর্ডনের অধিকারে যে সবুজ ভূমি ইজরায়েলের সীমারেখাকে সরল হতে দেয় নি, সেই ভূমির ওপর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। এই জন্যই ইজরায়েলী-ইহুদি-নিপীড়িত আরব-শরণার্থী দলের ওই ভূখণ্ডে পুনর্বাসনের চেষ্টাকে তারা বারবার বাধা দিয়ে এসেছে। ইজরায়েল চেয়েছে জর্ডন নদীর পশ্চিম তীরবর্তী সমস্ত ভূখণ্ড—জেনিন থেকে সুরু করে বেথেলহেমের মধ্য দিয়ে হেব্রোন পর্যন্ত বিস্তৃত হোক তাদের রাজ্যের সীমারেখা, যা হলে জর্ডন, সিরিয়া ও ইরাককে সহজে তারা শিক্ষা দিতে পারে। আর তাদের প্রয়োজন আকাবা উপকূলে শর্ম এল-সেখ।

আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইজরায়েলের সহায়। আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যে যে পরিমাণ সমর-সম্ভার আমেরিকা দেয় তার অর্ধেক পায় ইজরায়েল, বাকী অর্ধেক ভাগ হয় তেরটি আরব রাষ্ট্রের মধ্যে। মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের স্বার্থরক্ষার খাতিরে ব্রিটেন দুই হাত ভরে অস্ত্রশস্ত্র ইজরায়েলকে জোগান দেয়। ফ্রান্সের অস্ত্রশস্ত্রের সবচেয়ে বড় খরিদ্দার ইজরায়েল। এই সব অস্ত্রশস্ত্রে পুষ্ট ইজরায়েল বাহিনী জানে আরব সামরিক বাহিনীর সমরসম্ভারের দৈন্যের কথা। শক্তির লড়াইয়ে তারা এক একটি দেশকে (মিশর ব্যতীত) ঘায়েল করতে পারে। সুতরাং যুদ্ধের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে তারা যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে লাগল।

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে ইজরায়েল সদম্ভে ঘোষণা করল যে তারা নেগেভ মরুভূমিকে কৃষিকার্যের উপযোগী করে তোলার জন্য জর্ডন নদীর সমস্ত জল টাইবেরিয়াসের উত্তরপ্রান্ত থেকে ঘুরিয়ে নেগেভে নিয়ে যাওয়ার

ব্যবস্থা করছে। এই ব্যবস্থা হলে জর্ডন হয়ে পড়বে অনুর্বরা। জর্ডন আপত্তি জানাল। সঙ্গে সঙ্গে ইজরায়েলী গেরিলারা হানা দিতে সুরু করল জর্ডনে। জর্ডন ঘোরতর প্রতিবাদ করল। ইজরায়েল জানাল যে জর্ডন নদীর জলের জন্য জর্ডনই ইজরায়েলের ওপর হামলা করছে এবং এই হামলা বন্ধ না হলে তারা জর্ডনকে সমুচিত শিক্ষা দেবে। এই গেরিলা আক্রমণের কারণ হয়েছে উদ্বাস্তুদের এই অঞ্চল থেকে ভয় দেখিয়ে উৎখাৎ করা। জর্ডন সেনাবাহিনী এই অঞ্চল তদারক করতে এলে পর গেরিলা হামলা কমে যায়।

কিন্তু ১৯৬৬ সনের নভেম্বর মাসে ইজরায়েল সম্মুখ সংঘর্ষে নামল। ঠিক আগের মত একই অজুহাত—জর্ডন থেকে গেরিলারা এসে ইজরায়েলে হামলা করছে। সুতরাং ইজরায়েল পাঠাল তার ট্যাঙ্কবাহিনী। সীমান্ত অতিক্রম করে জর্ডন রাজ্যে প্রবেশ করে অপ্রস্তুত ও নিরস্ত্র জর্ডন বাসীদের ওপর গোলা দাগতে সুরু করল। ট্যাঙ্কবাহিনীর আক্রমণে জর্ডনের একটি শহর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

এবার ইজরায়েলের দৃষ্টি পড়ল সিরিয়ার ওপর। সিরিয়া সীমান্তে পাহাড়গুলি চেয়ে আছে ইজরায়েলের দিকে। যুদ্ধ বাধলে সিরিয়া এই পাহাড়ের চূড়া থেকে কামান দাগলে ইজরায়েল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুতরাং এবার সিরিয়াকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ সনে তৎপর হল ইজরায়েলী গেরিলারা, হানা দিতে সুরু করল সিরিয়ায়।

এপ্রিলের শেষাশেষি ইজরায়েল তার বম্বার প্লেন পাঠাল সিরিয়ায় বোমাবর্ষণ করতে। প্রথম আক্রমণেই অপ্রস্তুত সিরিয়ার ছয়টি মিগ-২১ প্লেন ধ্বংস হল। সিরিয়া পালটা জবাব দিল তার_কম্যাণ্ডোবাহিনী মারফৎ। পাল্টা আক্রমণে বিব্রত ইজরায়েলী প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল ইতজলাক রাবিন ঘোষণা করলেন—জর্ডনের শিক্ষা হয়েছে, সিরিয়ার শিক্ষা এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। এইভাবে সিরিয়া আক্রমণ যদি চালায় তবে আমরা অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করব, যা এপ্রিল

মাসের চেয়েও ভয়ঙ্কর হবে।

স্পষ্টতই যুদ্ধের হুমকি। সিরিয়া দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করল। রাষ্ট্রপুঞ্জে সিরিয়া জানাল যে ইজরায়েল তাদের দেশ আবার আক্রমণের জন্য উদ্যত। মিশরের কাছেও সাহায্যের আবেদন গেল।

নাসের পড়লেন মুস্কিলে। সিরিয়ার সাহায্যের আবেদনে তিনি অগ্রসর না হলে আরবজাতির নেতৃত্বের মুকুট তাঁর মাথা থেকে সরে যাবে, অথচ ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে তখন তিনি প্রস্তুত নন। সেনাবাহিনীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ ইয়েমেনে যুদ্ধে রত। তা ছাড়া সিরিয়ার ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে তাঁর বিরোধ। তবু ১৩ই মে তিনি সিরিয়ার সাহায্যে এগিয়ে গেলেন। ইজরায়েল চুপ করল।

সিরিয়ার ক্ষমতা বাথ পার্টির হাতে। তারা মার্কস্‌বাদী, কম্যুনিষ্ট। মিশরে কম্যুনিষ্ট দলের কীর্তিকলাপ তাঁর দেখা আছে। আরবকম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে তাঁর অত্যন্ত খারাপ ধারণা। সিরিয়ার কম্যুনিষ্টদের জন্য সিরিয়া ও মিশরের যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬১ সনে বিচ্ছিন্ন হয়। সন ১৯৬১, ১৮ই ডিসেম্বরে তিনি এক ভাষণে বলেন :

"We do not accept the return of capitalism or feudalism because they represent the role of a minority of one class ; we have also declared that we do not accept the dictatorship of the proletariat expressed by Communists, because this also means the domination of a small group."

সুয়েজ-সঙ্কটের পর থেকেই মিশর ও রাশিয়া ঘনিষ্ঠ হয়। রাশিয়া কম্যুনিষ্ট দেশ এবং নাসের কম্যুনিষ্ট বিরোধী, তবুও। ১৯৫৪ সনের রুশ-মৈত্রী ১৯৫৯-এ প্রায় শেষ হয়ে যেতে বসেছিল। ইরাকে কম্যুনিষ্ট বিরোধী দলগুলি একত্র হয়ে মোসুলে একটি বিদ্রোহ করে।

কম্যুনিষ্টদের সক্রিয় সহায়তায় জেনারেল কাসেম সেই বিদ্রোহ চূর্ণ করেন। এরপর তিনি তাঁর সামরিক একনায়কত্ব বজায় রাখার জন্য

কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে হাত মেলালেন। অন্যান্য আরব দেশেও কম্যুনিষ্টরা মাথা নাড়া দিয়ে জেগে উঠল। আরব যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সিরিয়াতে কম্যুনিষ্টদের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ বেড়ে উঠল।

দামাস্কাসে ১১ই মার্চ নাসের বলেন ঃ যে কম্যুনিষ্টরা আরব যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য লজ্জাকর আন্দোলন স্নুরু করেছে, তাদের নিজেদের দালাল ছাড়া সমগ্র আরব-জগতে আর একটি লোককেও তাদের কথা শোনানোর জন্য পাবে না, কারণ কম্যুনিষ্টরা নিজেরাই দালাল—যারা নিজেদের দেশের কিংবা জাতির স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয় এবং বহির্দেশের আদেশ পালন করে। ক্রুশ্চেভের আর সহ্য হল না। ১৬ই মার্চ তিনি জবাব দিলেন ঃ যখন আরব যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কম্যুনিজম্ ও কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে বলেন তখন তিনি সাম্রাজ্যবাদীর কথাই উদ্গীরণ করেন।

নাসের ১৭ই মে এর প্রত্যুত্তর দিলেন ঃ আমাদের দেশের কম্যুনিষ্টদের পক্ষে মিঃ ক্রুশ্চেভের ওকালতি আরববাসীরা মানতে অস্বীকার করে। আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি না এবং সে দেশের এক শ্রেণীর লোককে অপর শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে উত্তেজিতও করি না।

আরব-কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ এখানেই। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে মিশরের কম্যুনিষ্টদের অন্তর্ঘাতী কাজ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাঁর আয়ত্তে এসেছে, তখনই তিনি একে একে সমস্ত বন্দী কম্যুনিষ্টদের মুক্তি দেন।

স্নুতরাং সিরিয়ার আবেদনে নাসেরকে বাধ্য হয়ে সাড়া দিতে হল এবং সেই সঙ্গে দ্রুতগতিতে একটির পর একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটতে স্নুরু হয়।

সমগ্র আরব-জগৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। মিশর, ইরাক, সিরিয়ার বিরোধিতা ভুলে গেলেন জর্ডনের রাজা হুসেন, সৌদি আরবের রাজা ফয়জল। ফয়জল ছিলেন ইংল্যাণ্ডে। সৌদি আরবই প্যালেষ্টাইন

আরবজাতির বলে দাবী জানিয়েছিল, আজ সে নিষ্কর্মার মত চুপ করে থাকতে পারে না।
ফয়জল দেশে ফিরেই ঘোষণা করলেন: ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামে যোগদান না করবে, সে আরব নামেরই যোগ্য নয়।

১৬ই মে।
সমগ্র আরব যুক্তরাষ্ট্রে জরুরী অবস্থা ঘোষণা। সৈন্যবাহিনীকে সতর্ক হওয়ার আদেশ। মিশরীয় সৈন্যবাহিনী সিনাই প্রদেশে ইজরায়েলের সীমানা বরাবর এসে প্রস্তুত হয়ে থাকল।

১৭ই মে।
ইজরায়েল-মিশরের সংযুক্ত ১১৭ মাইলের সীমানা ১৯৫৬ সনের সুয়েজ যুদ্ধের পর থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী তদারক করে আসছিল। নাসের দাবী জানালেন: গাজা সীমান্ত থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘবাহিনী অপসারণ করতে হবে।
রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিদর্শক সমস্ত সংবাদ জানালেন সেক্রেটারি জেনারেল উ-থাণ্টকে। উ-থাণ্ট সমগ্র বিশ্বকে হুঁসিয়ার করে দিলেন: অত্যন্ত মারাত্মক পরিস্থিতি এখন মধ্যপ্রাচ্যে।

১৮ই মে।
নাসের এবার দাবী জানালেন: ইজরায়েল সুয়েজ-যুদ্ধের পর আরোপিত কোন সর্তই যখন মেনে চলছে না, তখন আরব যুক্তরাষ্ট্রও সুয়েজ যুদ্ধের আগের পরিস্থিতিতে ফিরে যেতে চায়। অতএব অবিলম্বে সমগ্র আরব যুক্তরাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘবাহিনী অপসারণ করতেই হবে।
ইজরায়েল থেকে জবাব এল: ইজরায়েলও প্রস্তুত। ইজরায়েলও প্রতি-ব্যবস্থা করছে।
সেইদিনই রাষ্ট্রসঙ্ঘ সেনাবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল

ইন্দরজিৎ রিখিয়ে এরোপ্লেনে করে সীমান্ত পরিদর্শন করছিলেন। ইজরায়েলের ফাইটার প্লেন তাড়া করল সেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্লেনটিকে। চারদিক দিয়ে ঘিরে গুলিবর্ষণ করে ইন্দরজিৎ রিখিয়েকে প্লেন-সমেত ইজরায়েল-ভূমিতে অবতরণ করানোর চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১৯শে মে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিদর্শকের সঙ্গে আলোচনা করে উ-থাণ্ট আরব যুক্তরাষ্ট্র থেকে সমস্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘবাহিনী অপসারণ করার আদেশ দেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে তিনি বলেন: বিবদমান পক্ষগুলির সম্মতি ছাড়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীকে কোন দেশে রাখার কোন অর্থ নেই। রাষ্ট্রসঙ্ঘবাহিনীর অবস্থান মিশরের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে। পরিস্থিতি এখন খুবই জটিল হয়ে পড়েছে, রাষ্ট্রসঙ্ঘবাহিনীর অবস্থান সেই পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তুলবে।

আপত্তি জানালেন রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের প্রতিনিধিরা। তাঁরা বললেন: সৈন্যবাহিনী অপসারণ করলে আরব-ইজরায়েলে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধবে।

উ-থাণ্টকে সমর্থন জানালেন গোষ্ঠ-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিরা।

২০শে মে।

নিরাপত্তা পরিষদে সেক্রেটারি জেনারেল জানালেন যে মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান অবস্থা ১৯৫৬ সনের সুয়েজ-সঙ্কটের সময়ের চেয়েও অনেক বেশি উত্তেজনাকর, অনেক বেশি ভয়াবহ। এই অবস্থার প্রতিবিধান করা কর্তব্য।

২১শে মে।

উ-থাণ্ট শান্তির সন্ধানে কায়রোতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ইজরায়েল তাদের দেশে সমস্ত রিজার্ভ সৈন্যকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে আদেশ দেয়।

মিশরের সৈন্যবাহিনীর সহকারী সর্বাধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল আবদেল হাকিম আমের মিশরের স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রত্যেককে নিজের নিজের ঘাঁটিতে অবিলম্বে প্রত্যাবর্তন করার এক আদেশ ঘোষণা করলেন।

২৩শে মে।

মিশরে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট জনসন নতুন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করলেন। নব-নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্রের সঙ্গে নাসেরকে একটি পত্রে জনসন জানালেন: ইজরায়েল আক্রান্ত হলে আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্টদের কথামত ইজরায়েলকে আমেরিকা সাহায্য করতে বাধ্য হবে।

এই হুমকির উত্তরে নাসের লিখলেন: আমেরিকা যদি আরব যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করে তো তাঁর দেশ যথাসাধ্য সে আক্রমণ প্রতিরোধ করবে, কিন্তু আরব যুক্তরাষ্ট্র তার অধিকার কখনো ত্যাগ করবে না।

তারপর নাসের ঘোষণা করলেন: আকাবা উপসাগর এবং তিরান প্রণালী মিশরের। ইজরায়েলী জাহাজ এবং ইজরায়েলের জন্য যে-কোন মালবাহী জাহাজকে আকাবা উপসাগর এবং তিরান প্রণালীতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

আরো জানালেন: যুদ্ধের সম্ভাবনা স্বীকার করেও এই ব্যবস্থা ব্যতীত আর কোন পথ নেই।

২৪ শে মে।

আরব যুক্তরাষ্ট্র আকাবা উপসাগরে 'মাইন' বসিয়ে সকলকে এ সম্বন্ধে সাবধান করে দিল।

কয়েক ঘণ্টা পরেই নিউ ইয়র্কে নিরাপত্তা পরিষদের অত্যন্ত জরুরি অধিবেশন বসে। আকাবা উপসাগর অবরোধ এবং মধ্যপ্রাচ্যে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি সম্বন্ধে উত্তেজিত আলোচনা চলে। সমাধানের কোন সুষ্ঠু মীমাংসায় পরিষদ আসতে পারে না।

ফ্রান্স একটি প্রস্তাব করে যে গত বিশ্বযুদ্ধের 'চার প্রধান'—ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই সঙ্কটের সমাধানের সূত্র নির্ণয় করা উচিত। প্রধান রাষ্ট্রগুলি তাঁদের মতামত জ্ঞাপনের জন্য সময় নিলেন।

উ-থাণ্ট শান্তির সন্ধানে কায়রোতে এসে উপস্থিত হলেন। আরব যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহম্মদ রিয়াদকে সঙ্গে নিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ করেন। শান্তির কোন আলোই তিনি দেখতে পান নি। স্বীকার করলেন যে তাঁর শান্তি-দৌত্য ব্যর্থ হয়েছে এবং তাঁর বক্তব্য রাষ্ট্রসঙ্ঘে পেশ করবেন।

সৌদি আরবের রাজা ফয়জল তাঁর সেনাবাহিনীকে ইজরায়েলী চক্রান্ত বিনষ্ট করার জন্য জর্ডনে অবিলম্বে যেতে আদেশ করলেন।

২৫ শে মে।

লণ্ডনের সংবাপত্র 'ডেইলি মেল'-এর সংবাদে প্রকাশ যে আমেরিকার ষষ্ঠ নৌবাহিনী জরুরি অবস্থার জন্য সর্বরকম প্রস্তুত হয়ে ভূমধ্যসাগরে মিশরের তীরভূমির কাছে অপেক্ষমান।

ইউ-পি-আই-এর সংবাদ-দাতা জানাচ্ছেন যে আমেরিকার দুটি বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ 'আমেরিকা' ও 'সারাটোগা' পূর্ব ভূমধ্যসাগরের পথে অত্যন্ত দ্রুত ছুটে চলেছে।

২৬ শে মে।

উ-থাণ্ট রাষ্ট্রসঙ্ঘে ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী মিশর শান্তিমিশন সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য দাখিল করলেন। জানালেন যে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা ১৯৫৬ সালের

চেয়েও মারাত্মক, হাতে কিছু সময় পেলেই শান্তির পথ বের করা সম্ভব।

২৭ শে মে।

ইজরায়েলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবা এবান আমেরিকা থেকে ইজরায়েলে প্রত্যাবর্তন কালে ওরলি বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের জানান যে মিশরের আকাবা উপসাগরের অবরোধ ভাঙার জন্য ইজরায়েলের যে-কোন ব্যবস্থায় পূর্ণ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আমেরিকা তাঁকে দিয়েছে।

তারপর ২৮ শে মে।

নাসেরের সেই বজ্রদৃপ্ত ঘোষণা।

ইজরায়েলের প্রধান মন্ত্রী লেভি এসকোল এক ভাষণে বলেন যে, আকাবা উপসাগরের অবরোধ ভেঙে ইজরায়েলী জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ব্রিটেন ও আমেরিকা করবে।

পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। আমার ট্র্যাভেল এজেন্টের কাছ থেকে খবর পেলাম যে দেশে ফেরার প্লেনের টিকেট এখন পাওয়াও সম্ভব নয়। তাছাড়া কাজ শেষ না করে ফিরে যাবই বা কি করে?

পঞ্জিকার ভবিষ্যৎ গণনা কি সত্য হবে?

অনেক গণনাই মেলে না, এবারও না হয় না মিলল। কারুর তো কোন ক্ষতি হচ্ছে না।

৪

সারা সকাল-দুপুর করলেন কি ?—জিজ্ঞাসা করল আলি।

বিকেলে আমার খোঁজে এসেছে হোটেলে। মিশুকে খুব। আমি যে মুখ-চোরা—আমিও ওর সঙ্গে মিশতে বা কথা বলতে খুব অস্বচ্ছন্দ অনুভব করি না। ডাটন পাগলাটে, খামখেয়ালী—যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ হৈ-হল্লা, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে আর একটা দল পেলে সেখানে জমে যাবে, আর সকলের কথা ভুলে যাবে। বেরিন একটু গম্ভীর, কথা কম বলে। আলি একটু ছেলেমানুষ। বয়সে আমার চেয়ে বেশ ছোট।

আলির প্রশ্নের উত্তরে বললাম—কি আর করব ? সকাল কাটল খবরের কাগজ পড়ে, দুপুর ঘুমিয়ে।

আলি হাসল। বলল—বেইরুত ঘুরে দেখেছেন ?

মাথা নাড়লাম।

দেখলে পারতেন—বলল আলি। একটু থেমে আপনমনেই যেন বলল-একা একা না ঘুরে ভালই করেছেন। এখন এমন এক পরিস্থিতি যে অপরিচিত লোককে এদিকে সেদিকে ঘুরতে দেখলে লোকে সন্দেহ করতে পারে। বেইরুতে স্পাই-এর তো অভাব নেই। আপনাকেই হয়ত স্পাই বলে ধরবে।

চমকে উঠে বললাম—সে কি ! আমি এসেছি ব্যবসার জন্য, আমাকে ধরবে কি ?

আলি বলল—একথা শুনলে তো সব চেয়ে আগে ধরবে। কমার্শিয়াল ট্র্যাভেলার, ট্রেড রেপ্রেজেনটেটিভ, টুরিষ্ট, ইনসিওরেন্সের এজেণ্ট এরাই তো পারফেক্ট স্পাই-এর কাজ করতে পারে। আপনার হাতে কোন কাজ নেই, চুপচাপ বসে আছেন—অথচ আপনি কমার্শিয়াল ট্রাভেলার ! একথা কি সহজে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে ?

কিন্তু আমার তো সব কাগজপত্র ঠিক আছে—বললাম আমি।

স্পাইদের কাগজপত্র আরো নিখুঁত থাকে—উত্তর দিল আলি।—আপনাকে মিথ্যা ভয় দেখাচ্ছি না। আপনার ওপর লোকের সন্দেহ হতে পারে, সুতরাং সাবধানে থাকবেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আলি-ই আবার জিজ্ঞাসা করল—কায়রো কেমন লাগল ?

উত্তর দিলাম—ঠিক বলতে পারব না। আমি তো টুরিস্ট নই যে দেশ দেখে বেড়াব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করে পালিয়ে আসার মতলবই ছিল। কায়রোর যতটুকু দেখেছি ভালই লেগেছে। পিরামিড রোড দিয়ে যেতে যেতে সূর্যাস্ত দেখার কথা কখনো ভুলব না।

দেখেছেন ?—একেবারে লাফিয়ে উঠল আলি। —একা দেখায় আনন্দ নেই।

বললাম—একলা দেখি নি। সঙ্গে ছিলেন এক মহিলা। ভারত-মিশর যৌথ প্রচেষ্টায় যে ছবির চেষ্টা করছি সেই ছবিতে সহ-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজি হয়েছেন।

—নাম ?

—চিনবেন না। প্রায় নতুন মুখ। তার নাম জামিলা। সুন্দর মেয়েটি। কায়রো ছাড়িয়ে শহরতলিতে 'সিনেমা সিটি'-তে গেছি স্টুডিও দেখতে সেইখানে আহরাম স্টুডিওতে আলাপ হল। ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়ালাম 'সিটি অব আর্টস'—অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আমাকে লক রেস্তোরাঁতে নিয়ে গেলেন, কায়রো ঘুরিয়ে দেখালেন। পিরামিড রোডের ওপর দুজনে হাত ধরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখলাম।

হেসে উঠল আলি, বলল—খুব রোম্যান্টিক তো! রোম্যান্সটা কতদূর এগিয়েছিল ?

বললাম—মেয়েটা বড় বেরসিক। জিজ্ঞাসা করলাম—আমাদের ছবির হিরোইন হবে? উত্তর দিল—সামীরা আহমেদ, ফাতিন হামামা, মাগদা কামেল থাকতে আমি ? আপনার কি মাথা খারাপ ? সুতরাং সেকেণ্ড

লিড, সেমি-হিরোইন। সেমি-হিরোইনের সঙ্গে প্রেম করা চলে না —একথা আপনার মানতেই হবে!

আবার হেসে উঠল আলি। বলল—জামিলা কি বলত আপনাকে?

—কি আর বলবে? দেখা হলেই বলত—আহলান। জানেন, ঐ একটা মিশরী কথা আমি শিখে ফেলেছি। অনেকটা আমাদের বাংলার মতই —'আসুন' আর 'আহলান' প্রায় একই।

আবার বললাম—জানেন, আপনি যে স্পাই-এর কথা বলছিলেন, সেই স্পাই আমি একদিন দেখেছি কায়রোতে। ওই প্রথম স্বচক্ষে স্পাই দেখা। আমি আর জামিলা যাচ্ছি রু সুলেমান পাশা ধরে। হঠাৎ একটা লোককে ঠিক আমাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে দেখলাম। জামিলার সঙ্গে তার ধাক্কা লাগল, কিন্তু একবার ফিরেও তাকাল না। একটু পরেই দেখলাম আর দুজন লোক হন্ত দন্ত হয়ে এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার দুই দিক দিয়ে দুটো পুলিশের গাড়ি এসে থামল। প্রথম লোকটি হঠাৎ দৌড়োবার চেষ্টা করল, কিন্তু ততক্ষণে পুলিশেরা তাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। লোকের ভিড় জমে গেল, কিন্তু পুলিশরা তাকে সঙ্গে সঙ্গে ধরে গাড়িতে তুলে ছুটে চলে গেল। লোকের মুখে শুনলাম লোকটা একটা স্পাই।

আলি বলল—কায়রোতে কেন সারা মিশরেই গুপ্তচর আছে—ইজ-রায়েলী গুপ্তচর বেশি। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় যাবেন কোথায়?

যাবার ইচ্ছা ছিল সিনেমায়—জবাব দিলাম,—কিন্তু এখন যেতে ইচ্ছা করছে না।

তবে চলুন আমার সঙ্গে আরব কফি হাউসে—বলে উঠল আলি—, বেইরুতে এসে ওখানেই যদি কফি না খেলেন তো আপনার বেইরুতে আসাই বৃথা।

বললাম—এত ভাল কফি? কিন্তু টুরিষ্ট গাইডরা তো কেউ সেরকম কথা বলে নি।

আলি উত্তর দিল—কয়জন জানে আরব কফি হাউসের নাম? গাই-ডদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তারা কফি হাউসের নাম বলবে ডোলচা ভিটা। অবশ্য এটাও সত্যি যে আরব কফি হাউসের কফি যে আশ্চর্য ভাল, সেরকম নয়। জায়গাটাও যে সেরকম তা-ও নয়। অর্থাৎ বেইরুতের লোকেরাও যদি ওই কফি হাউসের নাম না শুনে থাকে তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নয়। কিন্তু আমার বেইরুতের শহরতলির এই কফি হাউসটা খুব ভাল লাগে।

বললাম—ভাল লাগার কোন কারণ তো থাকা উচিত!

আলি উঠে দাঁড়িয়ে বলল—কারণ নিশ্চয়ই আছে, সেটা গাড়িতে যেতে যেতে বলব। এখন চলুন।

একটা ট্যাক্সি ধরা হল। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে আলি বলল—ওই কফি হাউসের মালিক আর খদ্দেরদের সম্পর্কটা এত মধুর যে ওখানকার কফির কোন দোষ আর দোষ বলে মনে হয় না।

—মানে?

—মানে এই যে, এই কফি হাউসটি হয়েছে একটি নিত্য-বিপ্লবের কারখানা। অবশ্য সৌখিন বিপ্লব। শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি—দুনিয়ার সব ব্যাপারের বিপ্লব তৈরি হচ্ছে। আপনি কোনও দলে নেই অথচ আপনি একটা বিপ্লব করতে চান—পথে ঘাটে বলতে সাহস হয় না—পুলিশে ধরবে, লোকে পাগল বলবে!—চলে আসুন এই কফি হাউসে। এখানে নির্ভয়ে আপনার মতবাদ প্রকাশ করুন। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে গেল আপনাকে ঘিরে একটা রেভলিউশানারি দল। যারা আপনার সঙ্গে একমত হল না, তারা বিপরীত কোনে আর একটা টেবিল দখল করে সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টার-রেভলিউশানারি দল খুলে বসবে। টেবিলে টেবিলে এক একটা রেভলিউশানারি পার্টি, চেয়ারে চেয়ারে এক একটি বিপ্লবী। রাস্তায় বের হলে অবশ্য আর এদের মাথায় কোন বিপ্লব থাকে না।

হাসি পেল। বললাম—খুব মজার তো!

আলি বলল—এ একরকম পাগলামি। আর এই পাগলামিতে আস্কারা দিয়ে যাচ্ছেন কফি হাউসের মালিক আবু জাকারিয়া। এই সব পাগলা-বিপ্লবীদের এবং প্রতি-বিপ্লবীদের সমস্ত কথাই শুনবেন—দু দলকেই সমান উৎসাহ দেবেন। পকেটে পয়সা নেই, কুছ পরোয়া নেই। কফির সঙ্গে বিপ্লব চলুক, পরে পয়সা দিলেও চলবে। না দিলেও কিছু বলবেন না। বিপদে পড়েছেন, আস্তানা চাই—চলে আসুন আবুর কাছে। ত্রি-সংসারে কেউ নেই—এদের আর এই সব পাগলামি নিয়েই আছেন। হাতে কিছু পয়সাকড়ি আছে—তাই নির্বান্ধবতা দূর করার জন্য তাঁর এই খেলা। কত লোক যে তাঁর কাছ থেকে অনুগৃহীত বলে শেষ করা যায় না। এখনও দু-একজন তাঁরই কফি হাউসে খায় দায় থাকে।

বললাম—আশ্চর্য লোক তো। সত্যি সত্যিই এই ধরনের লোক আর এই কফি হাউস না দেখলে বেইরুতের অনেক কিছুই অজানা থাকত।

ট্যাক্সি এসে থামল কফি হাউসের সামনে। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে কফি হাউসে ঢুকলাম। যা ধারণা করেছিলাম ঠিক তাই। কলকাতার কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসের আর এক সংস্করণ। সেই একই রকম গোলমাল, একই রকম একটা টেবিল ঘিরে সাত আট দশজন মিলে তিন চার কাপ কফি নিয়ে ভাগ করে খাওয়া আর আড্ডা। এরই মধ্যে দু'একটা টেবিলে দু-এক জোড়া ছেলেমেয়ে আছে, একটা টেবিলে দুজন বা তিনজনও বসে গল্প করছে।

আলি প্রথমেই আমাকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল মালিক আবু জাকারিয়ার সঙ্গে।

আবু সাহেবের বয়স হয়েছে। চুল, দাড়ি, গোঁফ সব পাকা। চোখে একটা কালো চশমা, প্রখর আলো সহ্য হয় না। মুখে সদা-প্রসন্ন হাসি। আমাকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বললেন—আজ প্রথম আপনি আমার কফি হাউসে এলেন, সুতরাং

আজ আপনি আমার অতিথি। যা খুশি আপনি খেতে পারেন—দাম দিতে হবে না। চেয়ার টেবিল দয়া করে ভাঙবেন না কিন্তু যত খুশি বিপ্লব করতে পারেন, যত দলে খুশি মিশতে পারেন।

আমি হেসে ফেললাম, বললাম—আলির কাছ থেকে সব শুনেই ছুটে এলাম এখানে। আপনি এসব এ বয়সে সহ্য করছেন কি করে?

আবু সাহেব বললেন—এই বয়সেই তো এই সব সহ্য করা যায়। একেবারে নিরামিষ বিপ্লব। চীৎকার হয়, কিন্তু কেউ কারো গায়ে আজ পর্যন্ত হাত তোলে নি। আমার বয়স কম হলে নিরামিষ বিপ্লব করতাম না, বিপ্লবের কথা ফলাও করে বলে বেড়াতাম না। আমার কাজ ঘরের মধ্যে হত না, বাইরেই হত। এরা সব বিপ্লবের জানেই বা কি, বোঝেই বা কি? যে বিপ্লব করে সে গোপনে কাজ করে যায়।

বললাম—এত যে বিপ্লবের কথা এখানে হয়, ধরুন পৃথিবীর সব দেশের লোকই এখানে এসে এই সব আলোচনাই করে—পুলিশ কিছু বলে না?

হো হো করে হেসে উঠলেন আবু সাহেব। বললেন—আমাদের এত পাগলা গারদ কোথায়?

ঠিক এই সময়ে একটি মেয়ে সেখানে এল। বছর বাইশ তেইশের সুন্দরী মেয়ে, অপরূপ সজ্জিতা। আলির দিকে তাকিয়ে একবার মিষ্টি হাসল, আমার দিকে একবার ভ্রূ তুলে তাকাল।

আবু সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন—আমার মেয়ে সইদা। আর ইনি মিঃ সেন।

সইদা আর আবু নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগলেন।

আমরা সেখান থেকে ফিরে এসে একটা টেবিল দখল করে বসলাম। ততক্ষণে সইদার কথাবার্তা শেষ হয়ে গেছে, কফি হাউসের ভিড় ঠেলে বেরিয়ে যাচ্ছে। সব টেবিল থেকেই সইদাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলছে, সে-ও মিষ্টি হেসে জবাব দিতে দিতে চলেছে। দু'একজন

উঠে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে দু'একটা কথাও বলল। সকলেরই পরিচিত সইদা।

কফির অর্ডার নিয়ে যাওয়ার পর আমি আলিকে প্রশ্ন করলাম— আপনি যে বলছিলেন আবু সাহেবের কেউ নেই, অথচ তাঁর মেয়ে তো আছে।

আলি বলল —সইদার কথা বলছেন ? সইদা ওঁর মেয়ে নয়। বললাম না যে ওঁর কাছে কেউ না কেউ এসে থাকে ! সইদা বড় বিপদে পড়ে এসেছিল আবু সাহেবের কাছে। উনি ওঁকে আশ্রয় দেন। এখন নিজের মেয়ের মতই আছে। সইদা ওঁকে খুব ভালবাসে, আবুও সইদাকে খুব স্নেহ করেন। এখন সইদা একটা অফিসে রিসেপশনিষ্টের কাজ করে। সইদা আলাদা থাকতেই চেয়েছিল, কিন্তু আবু যেতে দেন নি।

আলি জিজ্ঞাসা করল—কেমন লাগছে জায়গাটা ?

উত্তর দিলাম—কলকাতায় এসে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে। ওখানে বিপ্লবের আড্ডা ঠিক হয় না।

বেইরুত জায়গাটাই অদ্ভুত—বলল আলি।—বেইরুতে স্পাই-এর ছড়াছড়ি, অথচ আমি এতদিন এখানে থেকেও একটা স্পাই দেখি নি। আপনি তো কায়রোতে তবু স্পাই দেখেছেন ! জানেন, এদেশে সবচেয়ে ভাল গুপ্তচরের দল হয়েছে ইজরায়েলের। সারা পৃথিবীতে এদের জাল ছড়ানো রয়েছে। পৃথিবীর যে-কোন দেশের গুপ্তচর-চক্রের সঙ্গে এরা পাল্লা দিয়ে চলতে পারে। দেখলেন না, কি ভাবে এরা ১৯৬০ সনের মে মাসে জার্মান নাৎসি ইহুদি-নিপীড়ক আইখ-মানকে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস এরিস থেকে ধরে নিয়ে এল।

কফি খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল।

আলির কাছে প্রথম শুনলাম ইহুদি গুপ্তচর-চক্র শেরুটেই বেটাহান (Sherutei Betahan) বা সংক্ষেপে শিনবেট (SHINBET)-

এর কথা। ইজরায়েলী গুপ্তচরদের সম্বন্ধে ভীতি আছে সকলেরই, কিন্তু পৃথিবীর খুব কম লোকই জানে তাদের কার্যকলাপের ধারা। অত্যন্ত গোপন রহস্যময়তায় অবগুণ্ঠিত তাদের কার্যবিধি, তাদের সংগঠন। ইজরায়েলের শাসক-গোষ্ঠির মাত্র কয়েকজনই এদের সঙ্গে পরিচিত।

ইজরায়েল প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই যখন প্যালেষ্টাইনের ইহুদিরা একসঙ্গে ইংরেজ আর আরবদের সঙ্গে গুপ্ত লড়াই করছিল, তখন থেকেই তারা ধীরে ধীরে এই গুপ্তচর-বাহিনী গড়ে তোলে। প্যালেষ্টাইনে একটা গুপ্তসমিতি ইহুদিরা গঠন করেছিল—হাগানা। এই হাগানার একটা শক্তিশালী অঙ্গ ছিল তাদের গুপ্তচরচক্র। তারা গোপনে সংবাদ আনত ব্রিটিশ সৈন্যদের অবস্থিতির, গোলা-বারুদের গুদামের, আরবদের গতিবিধির। এদের সঙ্গে যোগ দিল ইউরোপে নির্যাতিত ইহুদিরা। সকলে একত্র হয়ে এক দুর্ধর্ষ গুপ্তচর সমিতি গড়ে তুলল। সিনবেট নাম শুনলে আজ সকলের অন্তরাত্মা তাই কেঁপে ওঠে, বিশেষ করে নাৎসি জার্মানদের।

এই সিনবেটের প্রতিষ্ঠাতা-নেতা ছিল ইয়েহিয়েল গ্রিনস্পান। সিন-বেটের কার্যক্রমকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। হিটলারের জার্মানীতে যারা যারা ইহুদিদের ওপর অত্যাচার করেছে তাদের অনুসন্ধান করে তাদের শাস্তি বিধানের কাজে একদল ব্যস্ত। অপর দল ইজরায়েলের প্রতিরক্ষার কাজে নিযুক্ত।

মিশরের সঙ্গে শত্রুতা ইজরায়েলের সবচেয়ে বেশি। নাসের যখন মিশরের নায়ক হয়ে দেখা দিলেন, তখন তিনি মিশরকে অন্যতম শক্তিশালী জাতি হিসেবে গঠন করার জন্য নানাদেশ থেকে, বিশেষ করে জার্মানী থেকে বৈজ্ঞানিক আনলেন। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, মিসিল, রকেট, জেটপ্লেন তৈরি হতে লাগল মিশরে।

ইজরায়েল প্রমাদ গণল। ব্রিটিশ, আমেরিকা ও ফ্রান্সের দাক্ষিণ্যে ইজরায়েল আজ মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র, কিন্তু মিশর

যদি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিজে তৈরি করতে সুরু করে তবে ইজরায়েল যাবে কোথায় ? সুতরাং সিনবেট সক্রিয় হয়ে উঠল।

জার্মান বৈজ্ঞানিকদের হত্যা করার জন্য চতুর্দিক থেকে সিনবেট আক্রমণ চালাল। পুস্তকতালিকার সঙ্গে বোমা, কফির মধ্যে বিষ, পথেঘাটে গুলি—অনেকে আহত হলেন, অনেকে নিহত হলেন। অনেকের পরিবারবর্গের লোকেদের বন্দী করে বৈজ্ঞানিকদের কাছে চরমপত্র দেওয়া হতে লাগল যে যদি তিনি মিশর থেকে কাজ ছেড়ে না চলে যান, তবে বন্দী আত্মীয়কে হত্যা করা হবে।

অনেক জার্মান বৈজ্ঞানিক ভয় পেয়ে মিশর ছাড়লেন।

পশ্চিম জার্মানীর একজন প্রসিদ্ধ মিসিল-বৈজ্ঞানিক প্রফেসর ইউজেন সায়েঙ্গার এসেছিলেন নাসেরের ডাকে মিশরে। তাঁর ওপর এমন নির্যাতন ও তাঁর পরিবারবর্গকে জার্মানীতে সিনবেটের লোকেরা এমন ভীতি-প্রদর্শন করল যে সায়েঙ্গার কাজ ছেড়ে জার্মানীতে ফিরে গেলেন।

কিন্তু সায়েঙ্গারের সহকারীরা—ডক্টর পিলৎস্, পাউল গোয়ের্কে, হান্স ক্লেইনভেখটার—রয়ে গেলেন। ষ্টুটগার্টে একই বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে সায়েঙ্গারের অধীনে কাজ করতেন তাঁরা। সেই প্রতিষ্ঠানে ছিলেন ডক্টর হাইনৎস ক্রুগ।

সকলে যখন মিশরে চলে এলেন, তখন ক্রুগও সেই প্রতিষ্ঠানের কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন মিউনিকে। সেইখানে তিনি একটি কোম্পানি খুলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে সুরু করলেন। সায়েঙ্গারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য তাঁর কোম্পানি থেকেই সব কিছু মিশরে সরবরাহ হতে লাগল।

সিনবেট প্রফেসর সায়েঙ্গারকে মিশর-ছাড়া করেছে, কিন্তু মিসিল বা রকেট তৈরি বন্ধ করতে পারে নি। যদি জার্মানী থেকে সরবরাহ বন্ধ

করা যায় তবেই কিছুটা কাজ হতে পারে।

ইতিমধ্যে অনেক যন্ত্রপাতির অর্ডার গেল ডক্টর পিলৎসের কাছ থেকে ডক্টর ক্রুগের কাছে। কিছুদিন পরে মিশর থেকে একটি চিঠি গেল ক্রুগের কাছেঃ ইজরায়েলী গুপ্তচরবাহিনী এই সরবরাহ বন্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অথচ মিসিল ও রকেট নির্মাণের জন্য মিশরের এই জিনিষগুলি একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং সেগুলির নির্বিঘ্ন পরিবহনের সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার জন্য মিশরের নিরাপত্তাবাহিনীর কর্ণেল নাদিম শীঘ্রই মিউনিকে যাবেন। এ সংবাদ যেন গোপন থাকে।

কর্ণেল নাদিম এলেন মিউনিকে। চমৎকার জার্মান বলেন, খুব রসিক লোক। লম্বা, চোখে চশমা, ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি। নাদিমের সঙ্গে কথা বলে ক্রুগ মুগ্ধ হলেন। মিশরের কোন কোন ফ্যাক্টরিতে কি কি জিনিষ সরবরাহ করা হবে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হল। মিশরকে বৈজ্ঞানিক শিল্পে উন্নত করার প্রচেষ্টায় জার্মানীর চেষ্টা এবং বিশেষ করে ক্রুগের দান সম্বন্ধে নাদিম উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন। রাত্রে নাদিমকে ডিনারে আপ্যায়িত করলেন ক্রুগ।

পরদিন দুপুরবেলা এলেন নাদিম। আজ তিনি মিশরে ফিরে যাবেন। যাবার আগে ক্রুগকে লাঞ্চে আপ্যায়িত করবেন। ক্রুগের গাড়িতে করে নাদিম আর ক্রুগ অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর ক্রুগ ফিরে এলেন না। তাঁর গাড়িটা মিউনিকের এক নির্জন রাস্তায় খুঁজে পাওয়া গেল। মিশরীয় নিরাপত্তাবাহিনীর কর্ণেল নাদিমও অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সব জায়গায় অনুসন্ধান করা হল। কর্ণেল নাদিম বলে কেউ জার্মানীতে আসে নি বা জার্মানী থেকে চলে যায় নি। মিশরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল তাদের নিরাপত্তাবাহিনীতে কর্ণেল নাদিম বলে কেউ কোনদিন ছিল না বা নিরাপত্তাবাহিনীর কাউকে এ ব্যাপারে জার্মানীতে পাঠানো হয় নি।

ডক্টর হেইনৎস্ ক্রুগ ইজরায়েলের সিনবেট গুপ্তচরবাহিনীর হাতে নিহত হলেন।

এখানেই সিনবেট ক্ষান্ত হল না।

ডক্টর ক্লেইনভেখটার জার্মানীতে ফিরলেন। তাঁর দায়িত্ব পড়ল জার্মানী থেকে সরবরাহের ভার। সেই সঙ্গে লোয়েরাখে একটা লেবরেটরির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন তিনি। একদিন রাত্রে নির্জন রাস্তায় তাঁর গাড়ি চড়াও হয়ে চারজন সশস্ত্র লোক তাঁকে আক্রমণ করল। চারটে গুলি পর পর ছোঁড়া হল, গাড়ির কাঁচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। অন্ধকার গাছপালার ভেতর ছুটে পালিয়ে তিনি কোন রকমে আত্মরক্ষা করলেন।

এবার পাউল গোয়ের্কের পালা।

বাসেল। সুইজারল্যাণ্ড।

থ্রি কিংগ্স্ হোটেলের ডাইনিং হলে এসে বসল সুন্দরী একটি মেয়ে; কিন্তু অজানা আশঙ্কায় রক্তহীন মুখ, চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ। মানসিক উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ রোধ করবার জন্য সমস্ত দেহে যেন এক কাঠিন্য ভর করেছে।

ডাইনিং হলে অনেক লোকজন। মেয়েটি কোন টেবিলে বসবে স্থির করতে না পেরে দাঁড়ানোমাত্র লাল পোশাক-পরা একজন ওয়েটার তার সামনে এসে দাঁড়াল। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল জানলার ধারে একটা টেবিলে।

মেয়েটির নাম হেইদি গোয়ের্কে।

জানলা দিয়ে সে তাকিয়ে রইল শান্ত রাইন নদীর দিকে। শীতল-কালো তার ধীর-প্রবাহিনী জল, এখনো বরফের চাঁই জলে ভেসে যাচ্ছে। নৌকো, লঞ্চ, স্টিমার ধীর গতিতে নদী ধরে যাতায়াত করছে।

টেবিলের ওপর মেনু রেখে একজন ওয়েটার দূরে দাঁড়িয়ে রইল। হেইদিকে মেনু দেখে মনস্থির করতে সময় দিল সে। হেইদি মেনুটা

হাতে করে তুলেও নিল না। ডাইনিং হলের ভেতরটা সে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখে নিল।

ভয়ের কিছু নেই—তাকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ; কিন্তু চেনা একটা মুখও সে দেখতে পেল না। সে জানেও না যে সে যে টেবিলে বসে আছে, তার নীচে একটা মাইক্রোফোন লুকানো আছে, যে কথাই এই টেবিলে হবে তা পাশের ঘরে টেপ রেকর্ডিং হয়ে যাবে। সে জানে না যে ডাইনিং হলের অর্ধেক ওয়েটারই সুইজারল্যাণ্ডের ডিটেক্‌টিভ। তার আশেপাশে যত পুরুষ-স্ত্রী হাসাহাসি গল্প করে খাওয়ায় ব্যস্ত, হেইদির দিকে একবারও চোখ তুলে তাকায়নি—তাদের মধ্যে অনেকেই ডিটেকটিভ এবং হেইদির ওপর তাদের দৃষ্টি ঠিকই আছে। সমস্ত হোটেল ঘিরেই পুলিশ ও ডিটেক্‌টিভ রয়েছে।

এবারে দুজন ভদ্রলোক ডাইনিং হলে ঢুকলেন। একজন মোটাসোটা, মধ্যবয়সী। মাথায় টাক। আর একজনের বয়স বেশী নয়, লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা। একজন ওয়েটারকে মধ্যবয়সী ভদ্রলোক কি যেন বললেন। ওয়েটার তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে স্টুয়ার্ডকে ডেকে আনল। স্টুয়ার্ড তাঁদের কাছ থেকে কথা শুনে হেইদির টেবিল দেখিয়ে দিলেন। ওয়েটার তাঁদের সেই টেবিলের কাছে নিয়ে গেল।

এঁদের দেখে হেইদির চোখ মুখ আরো কঠিন হয়ে উঠল।

পরস্পরকে সম্ভাষণ জানিয়ে তাঁরা লাঞ্চে বসলেন। খাওয়াদাওয়ার মধ্যেই কথাবার্তা চলতে লাগল। মধ্যবয়সী লোকটিই প্রায় সারাক্ষণ কথা বললেন।

কথার সারমর্ম হল, যদি হেইদি চায় যে তার বাবা ডক্টর পাউল গোয়ের্কে বেঁচে থাকেন তবে তার উচিত হবে তার বাবাকে কোন-রকমে মিশর থেকে ফিরিয়ে আনা। তিনি যদি আসতে না চান তো তাঁর মৃত্যু অনিবার্য।

হেইদির হাত কেঁপে উঠে হাত থেকে কাঁটাটা পড়ে গেল।

মাথা নীচু করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বলল—

আপনাদের সমস্ত কথা আমি বাবাকে জানাব। আমি চেষ্টাও করব তাঁকে ফিরিয়ে আনতে।

টেবিল থেকে হঠাৎ উঠে পড়ে হেইদি হন্‌হন্‌ করে চলে গেল।

ডিটেকটিভরা এই দুজনকে সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারত; কিন্তু কিছু না বলে তাদের চলে যেতে দিল। পিছন পিছন লেগে রইল ডিটেকটিভ। এই দুজন বাসেল থেকে ট্রেনে করে এল জুরিখে। জুরিখের একটা হোটেলে এসে তারা উঠল। পুলিশ আর ডিটেকটিভ ঘিরে ধরল সেই হোটেল। জুরিখে সেদিন উৎসব। সেই উৎসবের মধ্যে জনতার ভিড়ে হঠাৎ সেই দুজন মিশে গেল। পুলিশ তাদের সন্ধান হারিয়ে ফেলল। সারারাত ধরে চলল জুরিখের সর্বত্র অনুসন্ধান। অতি সহজেই তারা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছে।

সকালবেলায় দুজন লোককে দেখা গেল জুরিখের বিমান বন্দরে। রোমে যাবেন তাঁরা। দুজনেরই মাথায় ঘন চুল, দুজনেরই চোখে কালো চশমা। অল্পবয়সী লোকটির কাঁধে ভর দিয়ে মধ্যবয়সী লোকটি একটু পা টেনে টেনে হাঁটছেন।

এরোপ্লেনে ঠিক ওঠবার মুখে ডিটেকটিভ আর পুলিশ এসে তাঁদের ধরল। মধ্যবয়সীর মাথা থেকে পরচুল তুলে নেওয়াতে আসল চেহারা ধরা পড়ল। হেইদিকে ভয় দেখানো বা ডক্টর গোয়েৰ্কেকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের কথা অস্বীকার করলেন তাঁরা। কিন্তু সেই টেপ-রেকর্ডিং ছিল, হেইদি এসে সাক্ষী দিল। দুজনের সঙ্গে সিনবেটের সম্পর্ক প্রকাশ পেল এবং দুজনেরই শেষ পর্যন্ত কারাবাস হল।

৫

ডাটনের কাছ থেকে হঠাৎ এক টেলিফোন পেয়ে হাজির হলাম ফিনি-সিয়া হোটেলে।

আমেরিকান কমার্শিয়াল ট্র্যাভেলারদের পক্ষেই একমাত্র এই হোটেলে থাকা সম্ভব। বেইরুতের এক নম্বর হোটেল। এয়ার কণ্ডিশন, টেলি-ভিশন, টেলিফোন ঘরে ঘরে, পার্শিয়ান কার্পেটে সমস্ত শরীর সযত্নে ও নিখুঁতভাবে ঢাকা। দামী আসবাবপত্র আয়নার মত ঝকঝক করছে। শুধু আমি নই, অনেকেই হাজির হয়েছে দেখলাম। জনা কুড়ি বাইশ হবে। সবাই পুরুষ। আলি এসেছে, এসেছে বেরিন আর গুল হামিদ, গিমোলি, পঁয়কারে, ফিটজেরাল্ড এবং নাম-মনে-নেই এমন অনেক ভদ্র সন্তান। এর আগে এদের সকলকে দেখিনি। এদের মধ্যে আছেন কিছু নবাগত কমার্শিয়াল ট্র্যাভেলার এবং কিছু বা ডাটনের হঠাৎ-সংগ্রহ বন্ধু। তাদের কাজের সঙ্গে ডাটনের কোন সংস্রব নেই। না-ই বা রইল, অপ্রতিরোধ্য ডাটন—তার বন্ধুত্বের আক্রমণ প্রতিহত করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। এক নিমেষে অপরিচয়ের প্রাচীর ভেঙে খান খান হয়ে সে সম্পূর্ণ ডাটনের অধিকারে চলে আসবে।

শুনলাম, ডাটন আমাদের এই কুড়ি বাইশ জনকে নিয়ে একটা পার্টি দিচ্ছে। ডাটনই সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে চলল হাত ধরে প্রবল ঝাঁকানি। দুর্বল মানুষের পক্ষে সাহেবী কায়দা যে মোটেই প্রীতিকর নয় সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলাম। ঝাঁকানির চোটে হাত ব্যথা হয়ে গেল।

এ্যাজ মেনি ড্রিংক্‌স্ এ্যাণ্ড এনি ড্রিংক—শ্লোগানের ভঙ্গীতে চীৎকার করে উঠল ডাটন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে যোগ করল—একসেপ্ট বিয়ার অবকোর্স।

বেরিন আর আলি হাসল। আর সকলে বুঝতে না পেরে একবার

আমার মুখের দিকে আর একবার ডাটনের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল— অর্থাৎ তাদের চোখ বলতে চায়, প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর।

তারপর গেলাসে গেলাসে ভরে উঠল নানা জাতীয় পানীয়, সোডার বোতল খোলার বিস্ফোরক শব্দ—যেন একসঙ্গে মেশিন গান থেকে কয়েকটা গুলি ছিটকিয়ে বেরিয়ে গেল।

গেলাস হাতে নিয়ে ভালভাবে বসার পর সকলের মনে আবার নতুন করে আগেকার প্রশ্নটি ফিরে এল ঃ কিসের জন্য হঠাৎ এই পার্টি ?

বেরিন আমাকে প্রশ্ন করল—জান না কি, সেন ?

ফরাসী পঁয়কারেও ত, দ আর চন্দ্রবিন্দু মিশিয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে সেই প্রশ্নই করে বসল। জানাল, আজই তার ডাটনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, আর আজই তার নিমন্ত্রণ।

অবশ্য ডাটনের পক্ষে পার্টি ডাকা একেবারেই বিচিত্র নয়, এই কয়দিনেই সেটা বুঝতে পেরেছি। এই কয়দিনের অধিকাংশ সন্ধ্যাই ওরই খরচে লিডো, ভেনাস বা কাসেনো দ্য লিবাঁতে কেটেছে। অবশ্য, সেই সব পার্টিতে আমরা চার জন পাঁচ জনের বেশি ছিলাম না।

ফিটজেরাল্ড একেবারে সরাসরি প্রশ্ন করে বসল—কি ব্যাপার, ডাটন ? কিসের সেলিব্রেশন ? ডিভোর্স, না নিউ প্রোপোজাল ?

কনফুসিয়াসের মত বিচক্ষণ হাসি হাসল ডাটন। বলল—ধীরে, বন্ধু, ধীরে। আগে মন শক্ত কর, তারপর শুনবে।

সকলেই হাসল। বুঝল, এ ডাটনের আর এক পাগলামি। লোকজন নিয়ে হৈ-হল্লা না করলে তার চলে না, সেই জন্যই হয়ত এই ককটেল পার্টি।

হঠাৎ দূরে কাকে যেন দেখে একেবারে ছুটে চলে গেল ডাটন, ফিরে এল এক ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে নিয়ে। অত্যন্ত লজ্জিত ও বিনয়ের ভঙ্গীতে মার্জনা চাইতে চাইতে বলল—সো সরি, মিসেস্ শেরমানি ! আজ এই সেলিব্রেশনে আপনার কথা একেবারে বেমালুম ভুলে

গিয়েছিলাম। কিন্তু যখন নিজে থেকেই এসে পড়েছেন, তখন আপনার উপস্থিতিতে আমাদের সকলকে এবং এই হতচ্ছাড়া পার্টিকে ধন্য করুন।

সেই ভদ্রমহিলাকে কোন কথা বলতে না দিয়েই ডাটন তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল—ইনি হচ্ছেন মিসেস্ শেরমানি, অরিজিন্যালি আমেরিকান কিন্তু বিবাহ করেছেন এই দেশে এবং সেই থেকে কমপ্লিটলি অ্যারাবাইজড্ হয়ে গিয়েছেন। অত্যন্ত কালচার্ড, এজুকেটেড, আর্টিষ্ট এ্যাণ্ড ক্রিটিক। আর্ট, হাউসকিপিং আর পারসোন্যাল এবং হোম বিউটিফিকেশনের একটা স্কুল মেয়েদের জন্য এখানে মাস ছয় হল খুলেছেন।

আমাদের নাম, ধাম, কর্ম ডাটন তোতা পাখির মত পর পর বলে গেল। সকলেই 'নড' করে চেয়ারে বসলাম।

দেখলাম, দলের মধ্যে তিন চার জন মিসেস্ শেরমানিকে বেশ ভাল করেই চেনেন। কথাবার্তায় চোস্ত, জনপ্রিয়া মহিলা নিঃসন্দেহে—নয়তো মেয়েদের ফিনিশিং স্কুলের ব্যবসা করে এত সাফল্য লাভ করতে পারে কেউ?

মিসেস্ শেরমানিকে মক্ষিরানী করে একদিকে একটি ছোট মধুচক্র গুঞ্জরিত হয়ে উঠল। এক পাশে আমি, গুল হামিদ ও গিমোলি নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছি।

হঠাৎ ডাটনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে বলছে—লেডিজ এ্যাণ্ড জেন্টলমেন!

একেবারে বক্তৃতার ঢঙ।

সকলে চমকে তাকাল তার দিকে।

বিজয়ী বীরের মত সকলের দিকে তাকিয়ে সে আবার বলতে স্বুরু করল—যদিও লেডি এখানে মাত্র একজন, তবুও যে ব্যাপারে যে রেওয়াজ। বন্ধুরা, হয়তো আপনাদের সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। আমি যুদ্ধে চললাম।

বিস্মিত সকলের মুখ দিয়ে এক অস্ফুট শব্দ শোনা গেল—যুদ্ধ।
গুল বলে উঠল—যুদ্ধ, মানে—ভিয়েৎনাম?
—ভিয়েৎনাম! নো—নো—হাত-পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানাল ডাটন।
—ভিয়েৎনাম! নেভার—ওরে বাবা, একেবারে নেশা ছুটিয়ে দিল। ভিয়েৎনাম গেলে কেউ আর বাঁচে?
তবে কোথায়?—জিজ্ঞাসা করল সেকুরা।
মুখ উজ্জ্বল করে ডাটন উত্তর দিল—ইজরায়েল।
কিন্তু ইজরায়েলে যুদ্ধ কোথায়?—পঁয়কারের প্রশ্ন।
ডাটন বলল—যুদ্ধ নেই ঠিকই, কিন্তু হতে পারে। আমি ফিফটি—ফিফটি চান্স নিচ্ছি। আমার এক বন্ধু—এক সংবাদদাতা—চলেছে ইজরায়েলে। আমি তার সঙ্গে চললাম যুদ্ধ দেখতে। আমি অবশ্য ফ্রণ্টে যাব না—ফ্রণ্ট থেকে অনেক দূরে, অর্থাৎ তেল আভিভেই থাকব। যুদ্ধ লাগলে তেল আভিভ ঘিরে সাজ সাজ রব, প্লেনের শব্দ মুহুর্মুহু, ব্ল্যাক আউট, মিলিটারি—সে-ও তো কম উত্তেজনা বা উন্মাদনা নয়।
আলি বলে উঠল—আমি সেই দিনই তোমাকে বলেছিলাম যে তুমি মনে মনে ইজরায়েলের সিম্প্যাথাইজার।
ডাটন উত্তর দিল—ননসেন্স, আলি। এমন আনন্দের সময় আবার পলিটিক্স। তবে এ কথা জেনে রাখ, আমি কোন দলেরই সিম্প্যাথাইজার নই। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে ইজরায়েলও যা আরবও তাই। কমার্শিয়াল দিক দিয়ে দেখতে গেলে ইজরায়েলের চেয়ে আরব আমার কাছে বড়, কারণ আরব-রাষ্ট্রে আমি বেশি জিনিষ বিক্রি করতে পারব। তোমার কায়রোতে বসে যুদ্ধ দেখতে পারলে আমি খুশিই হতাম, কিন্তু কায়রোয় বে-সামরিক বিমান চলাচল বন্ধ। ইজরায়েলেও তাই, কিন্তু যদি কেউ ঝুঁকি নিয়ে যায় তো তার ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। সুতরাং চললাম তেল আভিভ। ওয়ার থিএটারের মধ্যে বসে যুদ্ধের উত্তেজনা অনুভব করা, যুদ্ধে ডাইরেক্টলি

ইনভলভ্‌ড্‌ না হয়েও যুদ্ধ এন্‌জয় করা—এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। যুদ্ধ যদি বাধেই তবে এখানে বসেও তো উত্তেজনা অনুভব করতে পারেন—বললেন মিসেস্‌ শেরমানি।

বেইরুত!—উত্তর দিল ডাটন—বেইরুতে যুদ্ধের হাওয়া ধোপে টেকে না, কেমন যেন জলো হয়ে যায়। পার্টিজ্যান ক্রাউডের মধ্যে না বসলে ঠিক থ্রিল পাওয়া যায় না। বেইরুত বড় কসমোপোলিটান।

ফিটজেরাল্ড জিজ্ঞাসা করল—তুমি কোন দলে?

আগেই বলেছি, আমি নির্দলীয়, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট—বলল ডাটন।—সকার খেলার নিরপেক্ষ এবং আসল সমঝদার দর্শকের মত! যে দল যখন বল নিয়ে চেপে অপর দলের গোল বোমবার্ড করবে, তখন আমি তারই হয়ে চীৎকার করব, হাততালি দেব। খেলার থ্রিল মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করতে গেলে পার্টিজ্যান হলে চলবে না। ধর, মিশর যদি ইজরায়েলের একটা প্লেন ঘায়েল করে, আমি 'কেয়াবাৎ আলি' বলে চীৎকার করব, আবার ইজরায়েলের এ-এ গান যদি মিশরের প্লেন কাবু করে আমি 'ব্র্যাভো বেরিন' বলে নাচব।

সকলেই হেসে উঠে আলি আর বেরিনের দিকে তাকাল।

আর যুদ্ধ যদি না হয়—প্রশ্ন করলেন মিসেস্‌ শেরমানি।

যদি যুদ্ধ না হয়—একটু চিন্তিতভাবেই উত্তর দিল ডাটন—দুঃখ একটু পাবই। মনে হবে, সারাদিন 'কিউ'-তে দাঁড়িয়ে সিনেমা দেখতে পেলাম না।

তারপর হেসে উঠল ডাটন হো হো করে, বলল—আসল কথা কি জান? আমার বরাত বড় খারাপ। আমি যা করতে চাই, তা কোনদিন হয় না। তাই হঠাৎ স্থির করলাম—যাই, গিয়ে যুদ্ধটা দেখে আসি। আমি যুদ্ধ দেখতে এসেছি—সুতরাং যুদ্ধ হবে না নিশ্চিত। যুদ্ধের চেয়ে খারাপ জিনিষ আর নেই।

কিছুক্ষণ পরেই পার্টি ভেঙে গেল।

ডাটন যাবার মুখে আমার হাত ধরে বলল,—সেন, আমার বোধহয় এর পরের এ্যাসাইনমেন্ট ইণ্ডিয়াতে। তোমার ঠিকানা আমার কাছে আছে। তোমাদের দেশে গেলে আবার আমাদের দেখা হবে।

বিদায় নিতে গিয়ে ডাটনের হাত থেকে আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিতে পারলাম না। মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। সামান্য দিনের পরিচয়, কিন্তু কত আপন হয়ে উঠেছিল ডাটন।

সকলের কাছ থেকেই ডাটনের বিদায় নিতে হবে। ওকে আর আটকিয়ে রাখলাম না।

বিদায় পালা শেষ হলে সকলে একে একে নীচে নামলাম।

দাঁড়িয়ে আছি ট্যাক্সির জন্য, হঠাৎ একটা ট্যাক্সি আমাদের দেখেই সেখানে এসে থামল। একজন ট্যাক্সি থেকে গলা বাড়িয়ে আলিকে ডেকে বলল—শুনেছ, সইদা মারা গেছে! এ্যাক্সিডেন্ট!

কে মারা গেছে? কে?—আলি ছুটে গেল। আমি, বেরিন আর মিসেস্ শেরমানিও একটু এগিয়ে ট্যাক্সির কাছে গেলাম।

সেই লোকটি বলতে লাগল—শোন নি? সইদা মারা গেছে ঘণ্টা দুয়েক আগে। বেড়াতে যাবে বলে বেরিয়েছিল, হঠাৎ একটা বোমায়—

প্রশ্নের পর প্রশ্ন তাকে করতে লাগল আলি, বেরিন আর মিসেস্ শেরমানি। সে ঠিকমত উত্তর দিতে পারল না। স্পষ্ট করে সে কিছু জানে না, কিন্তু সে শুনেছে যে এ ধরনের একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। কফি হাউসটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়াতেই সকলে এই খবরটা জানতে পারে। বেচারা আবু, খবর পেয়েই সে কেঁদে ফেলে, পাগলের মত ছুটে চলে যায়। সইদাকে ঠিক নিজের মেয়ের মতই দেখত।

আলি আমাকে জিজ্ঞাসা করল—যাবে না কি, সেন?

মাত্র একদিন আগেই পরিচয় হয়েছে আবু জাকারিয়ার সঙ্গে—চমৎকার লোক। সইদাকেও মাত্র একবারই দেখেছি সেদিন—সুন্দরী মেয়ে। যাব বৈকি!

মিসেস্ শেরমানি যেতে চাইলেন না।

বেরিন বলল—আপনার স্কুলেরই তো ছাত্রী ছিল। যাবেন না? চলুন —চলুন—

মিসেস্ শেরমানি মাথা নেড়ে বললেন—আমার স্কুলের ছাত্রী ছিল বলেই দেখতে যেতে মন সরছে না। ওর মৃতদেহের দিকে আমি তাকাতে পারব না।

ট্যাক্সির ভিতরকার লোকটি বলল—সেদিকে নিশ্চিত থাকুন, মৃতদেহ পোষ্ট মর্টেমের জন্য নিয়ে গেছে। আমরা যাচ্ছি থানায়, মিঃ জাকারিয়া এখন ওখানেই রয়েছেন। ওঁর সঙ্গে আলাপ করবেন একদিন মিসেস্ শেরমানি—অদ্ভুত লোক। নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। সকলকেই ভালবাসেন—তাঁর এত বড় দুঃখ আর বিপদের দিনে একবার তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ানো—এ ছাড়া আর কি?

আলি প্রায় জোর করেই মিসেস্ শেরমানিকে ট্যাক্সিতে তুলে নিল।

মিসেস্ শেরমানি ট্যাক্সিতে করে যেতে যেতে বললেন—আপনাদেরই জিত হল। যে সইদা আমার ছাত্রী ছিল, তাকে মিঃ জাকারিয়া মেয়ের মত ভালবাসতেন। তাঁর সঙ্গে আমি নিশ্চয়ই আলাপ করব। আজ হয়তো হবে না, তবে যথাসম্ভব সত্বর আলাপ আমাদের হবেই।

সকলে গিয়ে থানায় হাজির হলাম। কফি হাউসের বন্ধুরা প্রায় সকলেই খবর পেয়ে এখানে এসেছে,—অনেকে চলে গেছে, কেউ কেউ এখনো আছে।

পুলিশদের কাজ প্রায় সব শেষ হয়ে গেছে। আবু সাহেব মাথা নীচু করে বসে আছেন। দেখেই মনে হয় যেন এরই মধ্যে তাঁর বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে। আমাদের দেখে একবার মুখ তুলে তাকালেন, কি যেন বলতে গেলেন—কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না, আবার মুখ নীচু করে উদ্যত অশ্রু রোধ করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

সান্ত্বনা দেবার আর কি আছে? চুপচাপ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম—মিসেস্ শেরমানি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আবু সাহেবের দিকে।

কিছুক্ষণ পরে বিদায় জানিয়ে চলে এলাম।

রাস্তায় নেমে আলি আমাকে বলল—আপনি তবে একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরে যান। আমি মিসেস্ শেরমানিকে আর একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিচ্ছি। আর আমরা সকলে অন্য দিকে যাচ্ছি।

মিসেস্ শেরমানি বললেন—মিঃ সেন আর আমি যদি এক দিকেরই যাত্রী হই, তবে একটা ট্যাক্সিতেই আমরা দুজনে যেতে পারি। আমি ওঁকে ওঁর হোটেলে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে যাব।

আমি আর মিসেস্ শেরমানি একটা ট্যাক্সিতে উঠলাম। পাশাপাশি বসলাম—কিন্তু কোন কথা নেই। কেমন যেন এক অস্বস্তি লাগছিল। পরিচয় আজই আর কিছুক্ষণ আগে—কথাবার্তা এর আগে একেবারেই হয় নি, তবু মনে হল এইভাবে চুপচাপ বসে থাকাটা খুব বিসদৃশ। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিটা দূর করার জন্য কথা বলার চেষ্টা করামাত্রই তিনি বলে উঠলেন—প্লীজ—

চুপ করে গেলাম। লজ্জায় অপমানে কান দুটো রাঙা হয়ে উঠল। ইচ্ছা হচ্ছিল, ট্যাক্সিটা থামিয়ে আমি নেমে চলে যাই। কিন্তু সে সাহসও হল না।

ট্যাক্সি এসে থামল আমার হোটেলের সামনে। মিসেস্ শেরমানিকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে পড়লাম। তিনি একটা কথাও বললেন না। ট্যাক্সি চলে গেল।

ঘর অন্ধকার করে বসে রইলাম।

একটুও ভাল লাগছিল না। মনটা কেমন যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। একই দিনে প্রায় একই সময়ে কয়েকটা অস্বাভাবিক ঘটনা।—ডাটনের হঠাৎ যুদ্ধ দেখার লোভে ইজরায়েল যাওয়া আমার মনে বেশ ধাক্কা দিয়েছে। এত রগুড়ে লোক, হৈ-হল্লা-গল্প—এ ছাড়া আর তার কোন জীবন নেই। বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়ই হবে। বয়স আমারই বা কম হল কি?

মাত্র কাল আলাপ হল আবু জাকারিয়ার সঙ্গে—আর এক ধরনের মজার লোক। বৃদ্ধ বয়সে সময় কাটানোর জন্য কফি হাউস খুলে বসেছেন। সকলের বিপদে আপদে বুক পেতে দাঁড়ানো তাঁর স্বভাব। হঠাৎ তিনিই আজ এত বড় এক দুঃখ পেলেন—মাত্র কিছুক্ষণ আগে। আর এই মিসেস্ শেরমানি। স্বেচ্ছায় আমাকে তাঁর ট্যাক্সিতে তুলে নিলেন, কিন্তু কথা বলার চেষ্টা করামাত্রই যেভাবে আমাকে থামিয়ে দিলেন তাতে অপমানিত বোধ করা অস্বাভাবিক নয়। বিদায় নেওয়ার সময়ও তাঁর চুপ করে থাকা আমার সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল।

ঘুরে ফিরে বার বার মনে পড়তে লাগল মিসেস্ শেরমানির কথা। মন থেকে তাঁকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছি না। সৌজন্যবোধে ভাল করে তাকিয়ে দেখি নি তাঁকে। সুন্দরী নিশ্চয়ই—তরুণী ন'ন, যৌবনের প্রান্ত সীমায় উপস্থিত—যদিও যুবতী বলে ভ্রম হওয়াও বিচিত্র নয়।

কিন্তু দুর্নিবার আকর্ষণী-শক্তি ভদ্রমহিলার। ডাটন থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেককেই দেখলাম তাঁর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে। অত্যন্ত সপ্রতিভ, ককটেল পার্টিতে পুরুষদের দলের মধ্যে একা নারীর বসে থাকতে সঙ্কোচ নেই। দল বেঁধে পুরুষদের সঙ্গে ট্যাক্সি করে যেতেও আপত্তি হয় না। আমেরিকান মহিলা বলেই হয়তো এতদূর সম্ভব।

রুম-বয় খবর দিল যে আমার টেলিফোন এসেছে। আলি কিংবা বেরিন হবে।

টেলিফোন ধরে বললাম—হ্যালো।

কে ? মিঃ সেন ?—অপর প্রান্ত থেকে মেয়েলি গলায় প্রশ্ন।

বললাম—হ্যাঁ। আপনি ?

—আমি মিসেস্ শেরমানি। মিঃ সেন, আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত এবং দুঃখিত। আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল—আমারই ছাত্রীর হঠাৎ মৃত্যুতে মনে এমন আঘাত পেয়েছিলাম যে তখন কোন কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। আপনি

কিছু মনে করেন নি তো? আমাকে মাপ করবেন মিঃ সেন। আমাদের দেখা হবেই—এর পর দেখা হলে কিন্তু আপনি খুব অবাক হবেন। আচ্ছা, বা—ই।

টেলিফোন রেখে দিলেন।

ঘরে ফিরে এলাম। টেবিলের ওপর একটা বড় চিঠি পড়েছিল। এতক্ষণ সেটা খুলেও দেখি নি, ইচ্ছাই করে নি দেখতে। এবার খুললাম। একটা চিঠির সঙ্গে একটা ফটো।

ফটোটার দিকে চোখ পড়ল। জামিলার ফটো। সুন্দর মিষ্টি চেহারা। হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। একটা ফটো চেয়েছিলাম, তাই পাঠিয়ে দিয়েছে।

চিঠিটা পড়লাম। ইংরাজীতে লেখা। জানিয়েছে—একটা ছবিতে সে নায়িকার ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছে। ছবিটির নাম 'নহর'। 'নহর' শব্দের অর্থ নদী। আমার জন্যই নাকি তার এই উন্নতি। ভারতীয় ছবিতে অভিনয় করার সংবাদ প্রকাশ হওয়া মাত্রই তাই তাকে তারা চুক্তিবদ্ধ করেছে।

'নহর' মিশরের ফেলাহিনদের কাহিনী। অটোমান তুর্কিদের শোষণ আর নিপীড়নে মিশর জীবন্মৃত। দেশের শতকরা নিরানব্বই জনই ফেলাহিন। ফেলাহিনদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। দারিদ্র্য, অনাহার আর অত্যাচার তাদের নিত্যসঙ্গী। এক ফেলাহিন মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইল। এই অন্ধকার রাত্রির অবসান ঘটিয়ে সে ডেকে আনতে চায় সূর্যকে। কোথায় সেই সূর্যদেব, যিনি মিশরের অন্ধকার ঘুচিয়ে দেবেন?

এমন সময় নেপোলিয়ন সসৈন্যে অবতরণ করলেন মিশরে।

সেই ফেলাহিন যেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হতশ্বাস মিশরের মুক্তি-দেবতার সন্ধান পেল। সে ছুটে চলল নীল নদী ধরে···নীল নদী ধরে সে ছুটে চলল···

নেপোলিয়ন যেখানে শিবির পেতেছেন।

৬

সন ১৭৯৮ সাল।

রূপকথার রাজপুত্র পক্ষীরাজে করে এলেন, হাতে তাঁর সোনার কাঠি। সোনার কাঠির স্পর্শে রাজকন্যার ঘুম ভেঙে গেল। দেড় হাজার বছরের নিদ্রা তার ভেঙে গেল। উজ্জ্বল আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সাদরে বরণ করে নিল সেই রাজপুত্রকে।

ফরাসী সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিশরের মাটিতে পদার্পণ করলেন। চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় নেমে উদার বিস্তৃত মিশরভূমির দিকে তাকালেন।

মিশরও তাকিয়ে দেখল তাঁকে। মিশরের দেড় হাজার বছরের ঘুম ভাঙল।

মধ্যযুগের অন্ধ তমসায় আচ্ছন্ন মিশরের সঙ্গে প্রগতিশীল পশ্চিম ইউরোপের এই প্রথম পরিচয়।

শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি—সব দিক দিয়েই তাদের জীবন তখন বন্ধ্যা। নব প্রচেষ্টা নব আবিস্কারের দিকে আর তাদের চেতনা নেই। সঙ্কীর্ণ ধর্মান্ধতায়, কুসংস্কারে দেশ ভরে গিয়েছে। মহামনীষিদের রচনা পাঠ ও আলোচনা আর নেই। ইব্‌ন সিনা, আল ফারাবি, আল গাজালি তখন বিস্মৃতপ্রায় নাম। সামাজিক ও নৈতিক জীবন অবক্ষয়ের ফলে কদর্যতায় এসে দাঁড়িয়েছে। বহুবিবাহ, উপপত্নীরক্ষণ হয়েছে প্রচলন। ফলে সমাজে স্ত্রীজাতির অবস্থা অত্যন্ত হীণ। ছেলেমেয়েরাও এই কুৎসিৎ পরিবেশে বড় হচ্ছিল।

অটোমান তুর্কী সম্রাট তখন মিশরের অধীশ্বর। তাঁর প্রতিনিধি হয়ে মামলুক বংশ মিশর শাসন করছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর থেকেই তাঁদের কর-দাবী ও কর-পীড়নে মিশরের অর্থনৈতিক কাঠামো অন্যান্য আরব-দেশের মত একেবারে ভেঙে ধূলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত দেশে

চরম অশান্তি, চরম দারিদ্র্য। দারিদ্র্য আনে অজ্ঞতা। অজ্ঞতা এনে দেয় নৈতিক অবক্ষয়।

ইউরোপের তখন বিপরীত অবস্থা। ইউরোপের তখন স্বর্ণযুগ। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, শৈল্পিক, বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে ইউরোপে তখন পুনরুজ্জীবন, দ্রুত অগ্রগতি। তারা আবিস্কার করছে নিত্য নতুন দেশ। আমেরিকা এসেছে তাদের হাতের মুঠোয়, ভারতে যাওয়ার নতুন সমুদ্র-পথ তারা খুঁজে পেয়েছে। প্রভূত সমৃদ্ধিশালী তখন ইউরোপ।

চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে নেপোলিয়ন আলেকজান্দ্রিয়ায় নামলেন।

ফরাসী সরকারের হঠাৎ এই আফ্রিকা অভিযানের কারণ আজও পরিস্ফুট নয়। ব্রিটেনের সঙ্গে নিয়ত যুধ্যমান ফ্রান্স হয়তো চেয়েছিল ব্রিটেনের রসদ বন্ধ করতে, কিংবা হয়তো চেয়েছিল উত্তর আফ্রিকায় এক নতুন উপনিবেশ গড়ে তুলতে। কিন্তু অধিকৃত মিশর থেকে কয়েক বছরের মধ্যেই ফরাসী সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে নিয়ে আসা ফরাসী সরকারের এই সদিচ্ছায় সায় দেয় না। মনে হয়, নেপোলিয়নের রণ-নৈপুণ্য, সামরিক বাহিনীতে নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তা ফরাসী সরকারের মনে ভীতি সঞ্চার করেছিল। তাঁরা নেপোলিয়নকে ফ্রান্স থেকে দূরে রাখাই সমীচীন মনে করেছিলেন। তাই তাঁদের হঠাৎ মিশর-অভিযান।

কিন্তু নেপোলিয়ন এই অভিযানে বেশ খুশিই হয়েছিলেন। যুদ্ধের উন্মাদনা তাঁর কাছে চিরকাল প্রিয়, আর তাছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিলিয়ে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য গঠন করা তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন।

তুর্কী সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে মিশর শাসন করছেন তখন মামলুক বংশের মুরাদ বে।

ফরাসী আক্রমণে মুরাদ বে পরাজিত হলেন। তুর্কী সম্রাটের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করলেন তিনি। সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য তিনি সৈন্যবাহিনী পাঠালেন ; কিন্তু নেপোলিয়নের কাছে তাদের বারবার পরাজয় হল।

কিন্তু মিশরে তিনি ফরাসী শাসন প্রবর্তন করলেন না। মিশর সম্পূর্ণ অধিকার করার চেষ্টাও করলেন না। মামলুক বংশ নিশ্চিহ্ন হল না, মুরাদ বে মিশরেই রয়ে গেলেন। শুধু মামলুক শাসনের গোড়া ধরে প্রবল নাড়া দিলেন, একটু ঝড়েই যাতে তা পড়ে যায়। তিনি মামলুক বংশের মর্যাদা একেবারে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছিলেন, সামরিক সামন্ত-তন্ত্রের গোড়ায় আঘাত হেনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

আর তিনি দিয়েছিলেন মিশরকে পুনরুজ্জীবনের সুযোগ। এ অভিযান শুধু সামরিক নয়, সাংস্কৃতিকও। নেপোলিয়নের সঙ্গেই এই দেশে এলেন ফ্রান্স থেকে পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার। মিশরে প্রথম ছাপাখানাও এল এই সময়ে।

নেপোলিয়ন মিশরে ছিলেন মাত্র এক বছর। ফরাসী সৈন্য ছিল আরো দু' বছর। ১৮০১ সনে সমস্ত ফরাসী সৈন্য অধিকৃত মিশর ছেড়ে স্বেচ্ছায় ফ্রান্সে ফিরে যায়।

কিন্তু নেপোলিয়নের এই অভিযান ব্যর্থ হয় নি। আর এক দিক দিয়ে এই অভিযান মিশরের জাতীয় জীবনে সমুজ্জ্বল হয়ে রইল। এই অভিযানে একজন লোকের ভাগ্য-সূর্য মধ্য-গগনে উদিত হল। এই ভাগ্যবান মামলুক বংশের গোড়ায় কুঠার হানলেন, তিনিই শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠলেন আধুনিক মিশরের প্রতিষ্ঠাতা এবং আধুনিক আরব যুগের উদ্গাতা।

ইনি হলেন মোহম্মদ আলি।

নেপোলিয়ন মিশর আক্রমণ করলে তুর্কী সম্রাট ফরাসী অভিযান বাধা দেবার জন্য যে আলবানীয় সেনাবাহিনী মিশরে পাঠালেন মুরাদ বে-কে সাহায্য করার জন্য, মোহম্মদ আলি ছিলেন সেই সেনা-বাহিনীর একজন অফিসার। নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীর সামনে এই আলবানীয় সেনাবাহিনী একটুও দাঁড়াতে পারে নি, ফরাসী সামরিক অভিযানে এতটুকু বাধা দিতে পারে নি ; কিন্তু সুচতুর মোহম্মদ আলি

এই সুযোগ হস্তচ্যুত করলেন না। আলবানীয় সেনাবাহিনীর সুখদুঃখের দিকে তিনি দৃষ্টি দিলেন, ফলে সেনাবাহিনীতে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। এই জনপ্রিয়তাকে কেন্দ্র করে সেনাবাহিনীর ওপর তিনি তাঁর প্রভুত্ব ও প্রভাব ধীরে ধীরে বিস্তার করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনিই হলেন সেই আলবানীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

১৯০১ সনে ফরাসী সৈন্যবাহিনী মিশর ত্যাগ করল।

মুরাদ্ বে আবার আত্মপ্রকাশ করলেন, মিশরের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য আবার প্রস্তুত হলেন। কিন্তু এবার বাধা দিলেন স্বয়ং মোহম্মদ আলি। তাঁর আলবানীয় সেনাবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুরাদ বে-র ওপর। মুরাদ বে বন্দী হলেন এবং প্রাণের সঙ্গে সিংহাসনও তুলে দিলেন মোহম্মদ আলির হাতে। নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মোহম্মদ আলি মামলুক বংশের প্রধানদের নির্মম-ভাবে হত্যা করলেন, সন্দেহজনক ব্যক্তিকে পাঠালেন কারাগারে। সেনাবাহিনীর সহায়তায় মোহম্মদ আলিই হয়ে উঠলেন মিশরের প্রকৃতপক্ষে অধীশ্বর, নামে মাত্র তিনি তুর্কী সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন।

মিশরের নব-জাগরণের ইতিহাসে মোহম্মদ আলির নাম চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে তিনি এবং তাঁর পুত্র ইব্রাহিম পাশা মধ্য-প্রাচ্যের অন্ধকার আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত আলো বিকীরণ করেন। সামরিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তিনি বিপ্লব সূচনা করেন। রাজ্য-বিস্তার, ইউরোপীয় শক্তির—বিশেষতঃ ব্রিটিশ শক্তির—বিরুদ্ধাচরণ, তুর্কী সুলতানের শাসন অস্বীকার করে মিশরের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রভৃতিতে আরব জাতির মধ্যে নতুন উন্মাদনা আনেন এবং মিশরকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করেন, যদিও সেই জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ মিশরবাসী তাঁরই প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে উচ্ছেদ করার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত সক্ষমও হয়।

মিশরের আভ্যন্তরীন উন্নতির দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। ফরাসীদের কর্ম-ক্ষমতায় তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। সুতরাং মিশরের রাজা হয়ে তিনি প্রথমে ফ্রান্স থেকে কলাকুশলী ও শিল্পবিদ আনিয়ে দেশের উন্নতির চেষ্টা করলেন, আর সেই সঙ্গে কৃতী মিশর-বাসীদের পাঠালেন ফ্রান্সে জ্ঞান অর্জন করতে।

তুর্কী সম্রাট মোহম্মদ আলির দিন দিন ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত মোহম্মদ আলি তাঁর অধীনতা অস্বীকার করবেন, কিন্তু মোহম্মদ আলিকে বেঁধে রাখবার কোন নিশ্ছিদ্র উপায়ও তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না!

ঠিক এই সময়ে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ওয়াহাবি সম্প্রদায় এবং সৌদি রাজবংশের মধ্যে মৈত্রীর ফলে আরবিয়া অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। তাদের সম্মিলিত চেষ্টায় এবং বিঘ্ন সৃষ্টিতে ইরাক ও সিরিয়াতে তুর্কী সম্রাটের আধিপত্য বিপন্ন হয়ে ওঠে। তুর্কী সম্রাট নিজে এই বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হয়ে মোহম্মদ আলিকে আদেশ দিলেন এই বিদ্রোহ চূর্ণ করতে। তখন পর্যন্ত মিশর তুর্কী সম্রাটের অধীনস্থ সামন্ত রাজ্য।

১৮১১ সনে মোহম্মদ আলি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইব্রাহিমকে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী দিয়ে সম্রাটের ইচ্ছা পালনের উদ্দেশ্যে পাঠালেন। সাত বছর প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ইব্রাহিম ওয়াহাবি শাসনকর্তাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে তুর্কী সম্রাটের আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

এবারে তুর্কী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে মোরিয়াতে গ্রীকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সম্রাট আবার মোহম্মদ আলিকে সেই বিদ্রোহ দমন করতে অনুরোধ জানালেন। মোহম্মদ আলি তাঁর ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বিস্তারের লোভ এবারও সংবরণ করতে পারলেন না। এবারেও তিনি ইব্রাহিমকে এই বিদ্রোহ দমন করতে পাঠালেন। এই অভিযানেও ইব্রাহিম সহজেই বিজয়ী হয়ে ফিরলেন।

তুর্কী সম্রাট খুশি হয়ে মোহম্মদ আলিকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন।

সামান্য অর্থের দিকে লোলুপ দৃষ্টি ছিল না তাঁর। তিনি সম্রাটকে অনুরোধ করলেন যেন তাঁকে পুরস্কার-স্বরূপ সিরিয়া রাজ্যটি দেওয়া হয়। তুর্কী সম্রাট সিরিয়া হস্তান্তর করতে অস্বীকার করলেন। অতএব ১৮৩২ সনে মোহম্মদ আলি ইব্রাহিমকে পাঠালেন তুর্কী সম্রাটের হাত থেকে জোর করে সিরিয়া ছাড়িয়ে নিয়ে দখল করতে। সিরিয়াবাসীরা সম্রাটের কুশাসনে এবং অত্যাচারে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ছিল। ইব্রাহিমকে মনে করল তারা তাদের দেশের পরিত্রাতা। ইব্রাহিম যেন তাদের তুর্কী সম্রাটের অধীনতার হাত থেকে মুক্তি দেবেন। মুসলমান ও খৃষ্টান সমস্ত সিরিয়াবাসীই ইব্রাহিমকে তুর্কী সম্রাটের বিরুদ্ধে সাহায্য করতে একযোগে অগ্রসর হল। ইব্রাহিমের কাছে অটোমান তুর্কী সম্রাট ভীষণভাবে পরাজিত হলেন। সিরিয়া ইব্রাহিমের করায়ত্ত হল।

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই সিরিয়াবাসীদের স্বপ্নভঙ্গ হল। তারা যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল, সে স্বাধীনতা তো এল না বরং এক পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত হয়ে আর এক পরাধীনতায় তারা নিক্ষিপ্ত হল। ইব্রাহিম মুক্তিদাতা হয়ে সিরিয়ায় প্রবেশ করলেন না, প্রবেশ করলেন বিজয়ী শাসনকর্তা হয়ে।

তুর্কী সম্রাট আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। সংবাদ পেয়ে সম্রাটকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইব্রাহিম ১৮৩৩ সনে আবার সসৈন্যে তুর্কী হানা দিলেন এবং তুর্কী-বাহিনীকে তাড়া দিয়ে কনষ্টান্টিনোপল পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। ব্রিটেন মোহম্মদ আলির শক্তিবৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। হৃতবল তুর্কী সাম্রাজ্য বজায় থাকলে মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেনের ক্ষমতা প্রসারের সুবিধা হবে, কিন্তু মোহম্মদ আলির প্রবল শক্তি যদি সেখানে এসে প্রধান হয় তবে ব্রিটেন পড়বে মুস্কিলে। সুতরাং এবার ব্রিটেন ইব্রাহিমকে বাধা দিল। ইব্রাহিম কনষ্টান্টিনোপলের দরজা থেকে ফেরৎ এলেন, কিন্তু সিরিয়া ত্যাগ করলেন না। সাত বছর তিনি পিতা মিশর-রাজ মোহম্মদ আলির নামে সিরিয়া শাসন করলেন। এবারে ব্রিটেনের সঙ্গে একত্র হল অন্যান্য

ইউরোপীয় শক্তি। ইউরোপীয় শক্তির সমবেত চাপে ইব্রাহিম শেষ পর্যন্ত সিরিয়া ত্যাগ করে মিশরে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হলেন।

উত্তরে যখন ইব্রাহিম মিশরের গৌরব-ধ্বজা তুলে বেড়াচ্ছেন, তখন দক্ষিণেও মোহম্মদ আলি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। আর এক পুত্রকে তিনি পাঠালেন দক্ষিণে। ১৮২০ সনে সুদান মিশরের পদানত হল।

মোহম্মদ আলি ছিলেন আলবানীয়, আরব নন। আরবী ভাষাও তিনি জানতেন না। পরিণত বয়সেই তিনি এসেছিলেন আরব রাজ্যে, আরব সম্বন্ধে তাঁর কোন মোহ বা হৃদয়-দৌর্বল্য ছিল না। এই আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় তিনি আরব জাতীয়তাবাদের কথা চিন্তাও করেন নি। তাঁর একই চিন্তা ছিল—তুর্কী সম্রাটের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করে নিজের জন্য একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।

কিন্তু ইব্রাহিমের মনোভাব ছিল মোহম্মদ আলির বিপরীত। ইব্রাহিম প্রথম যৌবনেই এসেছেন মিশরে। আরব পরিবেশে তিনি বড় হয়েছেন, আরবী ভাষায় তিনি কথা বলেন। আরব জনসাধারণের সঙ্গে মিশেছেন, তাদের আশা-আকাঙ্খা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। কিছুটা হৃদয়-দৌর্বল্য, কিছুটা রাজনৈতিক কূটচালে তিনি আরব ঐতিহ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন এবং আরব সাম্রাজ্য গঠনে আরব জাতীয়তাবাদকে একটি কঠিন অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আরব জাতীয় আন্দোলনের জনক ইব্রাহিম পাশা।

কিন্তু তাঁর স্বপ্ন সফল হতে পারে নি। তিনি কোনদিন মিশরের রাজা হতে পারেন নি। পিতার মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

মোহম্মদ আলির মৃত্যুর পর মিশরের পাশা হলেন ইব্রাহিমের পুত্র আব্বাস। অত্যন্ত গোঁড়া, আধুনিকতা-বিমুখ। মোহম্মদ আলি দেশের উন্নতির জন্য যে-সব প্রকল্প সুরু করেছিলেন, তিনি সিংহাসনে বসেই সে-সব বন্ধ করে দিলেন। রাজদরবার থেকে বিদেশীদের সরিয়ে দিলেন। সৈন্য সংখ্যা গেল কমে। ফলে দেশবাসীর ওপর করভার অনেক কমে গেল এবং দেশের চাষী-সম্প্রদায় বা ফেলাহিনরা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস

ফেলে বাঁচল। কিন্তু দেশের উন্নতি যথেষ্ট ব্যাহত হল।

আব্বাসের মৃত্যুর পর ১৮৫৪ সনে মিশরের পাশা হলেন তাঁর খুল্লতাত সৈয়দ। মিশরের রূপ পরিবর্তিত হতে সুরু করল এবং এই অত্যন্ত স্ফূর্তিবাজ খামখেয়ালি রাজা এমন কয়টি কীর্তি করেছিলেন যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঠিক আব্বাসের বিপরীত চরিত্র। আব্বাস যতদূর পুরাতনপন্থী ও গোঁড়া, তিনি ঠিক ততদূর উদার ও আধুনিক। আব্বাস বিদেশীদের একেবারে পছন্দ করতেন না, সৈয়দের বিদেশী-প্রীতি ছিল অত্যন্ত বেশী। এই বিদেশী বন্ধুদের পরামর্শেই তিনি রাজকার্য চালাতেন।

ফেলাহিনদের দুঃখ দুর্দশা দেখে তিনি স্বপ্রবৃত্ত হয়ে কয়েকটি আইন প্রণয়ন করে জমিজায়গা ও রাজস্বের সুবিধা করে দিলেন। তারপর ১৮৫৮ সনে কায়রো থেকে সুয়েজ পর্যন্ত নির্মিত হল রেলপথ—আধুনিকতার দিকে একধাপ অগ্রসর। কিন্তু তাঁর অবিনশ্বর কীর্তি হয়েছে সুয়েজ খাল খনন।

সৈয়দের আজীবন বন্ধু ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ফার্দিনান্দ দ্য লেসেপস ভূমধ্যসাগর ও আরব সাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে পাশ্চাত্য দেশ থেকে প্রাচ্যে জাহাজ যাতায়াতের স্বপ্ন দেখছিলেন অনেকদিন ধরে। তখন সমুদ্র দিয়ে যাতায়াতের পথ ছিল উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে—বিপদসঙ্কুল সমুদ্রে অনেকদিনের পথ। দ্য লেসেপস তাঁর এই ইচ্ছার কথা কারুর কাছে প্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছিলেন না। এমন অসম্ভব পরিকল্পনাকে সকলে পাগলামি বলে উড়িয়ে দেবে। সমস্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করে তিনি সৈয়দকে তাঁর মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। একটা নতুন কিছু করার সুযোগ পেয়ে সৈয়দ সাহায্য করতে সানন্দে সম্মত হলেন। যেখানে এই খাল খনন করা হবে, সে জমি তাঁর নিজের, এবং নিজের রাজ্যের অন্তর্গত। কারুর কিছু বলার নেই। অর্থ সাহায্যও তিনি করতে সম্মত হলেন, যদিও দ্য লেসেপস ব্যয়ের কিছু অংশ অন্যত্র সংগ্রহ করার দায়িত্ব নিলেন।

ইতিহাসের সুরু তখনই। মিশরের এই আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে অধিকার তার আছে বলে মনে করল ব্রিটেন। সুয়েজ খাল প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাল ব্রিটেন, সেই সঙ্গে তুর্কী সুলতান। আজও ব্রিটেন মিশরের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে সেই অধিকার প্রয়োগ করতে চায়—ইতিহাস তার সাক্ষী দেবে।

ব্রিটেনের হুমকিতে ভয় পাবার পাত্র আর কেউ হোক—সৈয়দ পাশা নয়। দ্য লেসেপসকে জানালেন যে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি তিনি সহ্য করতে প্রস্তুত, ব্রিটিশ ও তুর্কীর রক্তচক্ষুকে অস্বীকার করেই তিনি সুয়েজ খাল খনন অবিলম্বে করতে চান! ব্রিটেন ও তুর্কী প্রবল বাধা দিল, তবু দ্য লেসেপস ফ্রান্স থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করলেন, অবশিষ্ট অর্থ দিলেন সৈয়দ। একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হল। সৈয়দ খালের জন্য ভূমি দিলেন সেই কোম্পানিকে। ১৮৫৯ সনে ফার্দিনান্দ দ্য লেসেপসের পরিকল্পনা অনুযায়ী সুয়েজ খাল খনন সুরু হল। দ্য লেসেপস বন্ধুর এই উৎসাহ, এই ত্যাগ এবং এই প্রীতিকে সম্মানিত করলেন সুয়েজ খালের মুখে সমুদ্রবন্দরটির নাম পোর্ট সৈয়দ রেখে।

সৈয়দ বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেন নি। ১৮৬৩ সনে তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে মিশরের পাশা হলেন ইব্রাহিমের এক পুত্র ইসমাইল। পরস্পর-বিরোধী চরিত্রের অধিকারী এই ইসমাইলের স্বপ্ন ছিল আকাশচুম্বী, কিন্তু কর্মক্ষমতা ছিল না আদৌ। এক একটি পরিকল্পনা সুরু করার পর ব্যর্থ পরিচালনায় তা শুধু বানচাল হয়েই যেত না, দেশকে ঋণগ্রস্ত করে ফেলত। ষোল বছর পরে তিনি যেদিন সিংহাসনচ্যুত হলেন, সেদিন মিশর অতল জলে নিমজ্জিত।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার অত্যন্ত অনুরাগী, কিন্তু প্রজাদের শাসনের ব্যাপারে তিনি মধ্যযুগীয় সুলতানদের মত কঠোর, নিষ্ঠুর। অথচ দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য রেলপথ, পথঘাট, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি নির্মাণ তিনি করেছিলেন। রাজস্বের অধিকাংশ তিনি বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করতেন এবং যখনই অর্থের প্রয়োজন হত তখনই বিদেশী

মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতেন। মিশরী তুলা রপ্তানি ছিল তাঁর অর্থ-উপার্জনের সবচেয়ে বড় পথ, কিন্তু আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ায় মিশরী তুলার দাম হঠাৎ পড়ে যায়, কিন্তু তাঁর চৈতন্য হয় না। ১৮৬৯ সনে সুয়েজ খাল উদ্বোধনের সময় ইউরোপের রাজন্যবর্গকে আপ্যায়িত করলেন বিশ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ করে এবং ১৮৭৫ সনে মাত্র চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ডে সুয়েজ খাল কোম্পানির তাঁর সমস্ত শেয়ার ব্রিটিশ সরকারকে বিক্রয় করে দিলেন।

চতুর্দিকে ঋণভারে এমনভাবে জড়িত যে মিশরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। কোন উপায় না দেখে ঋণ পরিশোধের সময় পিছিয়ে দেওয়া তিনি স্থির করলেন। বোলতার চাকে যেন ঢিল পড়ল। বিদেশী মহাজনেরা যার যার দেশের সরকারের ওপর চাপ দিলেন এবং অবিলম্বে ঋণ পরিশোধের জন্য গণ্ডগোল সুরু করলেন। নিরুপায় ইসমাইলের ওপর চাপ দিল ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার। এই দুই দেশের চাপে ইসমাইল নামে মাত্র পাশা থেকে রাজ্য শাসনভার এক মন্ত্রীসভার ওপর ন্যস্ত করতে সম্মত হলেন। ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের অনুমোদনে তিনজনের এক বিচিত্র মন্ত্রীসভা স্থাপিত হল—প্রধান মন্ত্রী এক আর্মেনিয়ন; অপর দুইজনের মধ্যে একজন ব্রিটিশ, অপর জন ফরাসী।

নিশ্চেষ্ট রইলেন না ইসমাইল পাশা। দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদের জিগির তুললেন। এই বিজাতীয় ও বিদেশী মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে মিশরবাসীরা প্রবল আন্দোলন করল। মন্ত্রীসভা বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করল। শেরিফ পাশা ততদিনে কনস্টিটিউশানাল ন্যাশানাল পার্টি (সি, এন, পি) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন। ইসমাইল শেরিফ পাশাকে একটি সর্বমিশরীয় মন্ত্রীসভা গঠন করতে আদেশ দিলেন।

কিন্তু ইসমাইলের ভরা ডুবি হয়ে এসেছিল। সামরিকবাহিনী তাঁর তুর্কী-প্রীতি সুনজরে দেখতে পারে নি। আবিসিনিয়া যুদ্ধের বিপর্যয়ের কথাও তারা বিস্মৃত হয় নি। ব্রিটেন এবং ফ্রান্সও তাদের মন্ত্রীসভা

ভেঙে দেওয়ার মূলে ইসমাইলের কূটনীতির কথা ভোলে নি। তুর্কী সম্রাট ইসমাইলের বড় হওয়ার স্বপ্নে ছিলেন ঈর্ষান্বিত। ঘরে বাইরে শত্রু, দেশে অরাজকতা। ফ্রান্স ও ব্রিটেন তুর্কী সম্রাটের ওপর চাপ দিলেন। ইসমাইল সিংহাসন-চ্যুত ও নির্বাসিত হলেন।

মিশরের পাশা হলেন ইসমাইলের পুত্র তৌফিক।

দেশবাসীর আশা ছিল যে শেরিফ পাশার মন্ত্রীত্বে হয়তো তাদের দুঃখদুর্দশার অবসান ঘটবে, কিন্তু তাদের সে আশা নির্মূল হল যখন বুঝতে পারল যে দেশের প্রকৃত শাসন-ভার তৌফিকের হাতে নয়, শেরিফ পাশার হাতে নয়—ব্রিটিশ ও ফরাসী কনসাল জেনারেলদের হাতে। শেরিফ পাশা একটি সংবিধান রচনা করেন, কিন্তু ব্রিটিশ ও ফরাসী পরামর্শে তৌফিক তা বাতিল করেন। ক্ষুব্ধ শেরিফ পদত্যাগ করেন। তৌফিক মন্ত্রীসভা গঠনের ভার দেন রিয়াজ পাশার ওপর।

ব্রিটেন তাদের চিরাচরিত কূটরাজনৈতিক চাল প্রয়োগ করতে সুরু করল। মিশরের আভ্যন্তরীন শাসন ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপের পথ সুগম করার জন্য প্রস্তুত হল। দেশের মধ্যে বিভেদ-নীতি প্রয়োগ করলেন ব্রিটিশ কনসাল। প্রধান মন্ত্রী রিয়াজ পাশাকে তিনি পরামর্শ দেন যে সেনাবাহিনীতে তুর্কী অফিসারদের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করলে তুর্কী সুলতান প্রীত হবেন এবং সেনাবাহিনীও কড়া শাসনে থাকবে। ওদিকে সেনাবাহিনীর মিশরীয় অফিসারদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে তুর্কীরাই সেনাবাহিনীতে প্রধান, তাদের নিজের দেশের সেনাবাহিনীতে তারা গৌণ। দেশের আভ্যন্তরীন শাসন ব্যাপারেও রিয়াজ পাশাকে এমন পরামর্শ দিতে সুরু করলেন যে যার ফলে জন-সাধারণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

মিশর সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল ব্রিটেন। মিশরের চক্ষুশূল যুদ্ধমন্ত্রী তুর্কী ওসমান রিফকির বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

মিশরের প্রথম জাতীয়তাবাদ আন্দোলন। এই আন্দোলনে সক্রিয়

সাহায্য করতে অগ্রসর হল মিশরের উদারপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহ, শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় এবং দেশের ফেলাহিনরা। এই বিদ্রোহের নেতা কর্নেল আহম্মদ আরবি—মিশরীয় জাতীয়তাবাদের প্রথম নায়ক। সফল সামরিক বিদ্রোহের পর তিনি দেশে দেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। দেশের জনসাধারণকে বিদেশী কূট চক্রান্তের ক্রীড়নক হয়ে থাকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। দেশের যে দুঃখবেদনা তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন. দেশের জনগণের সম্মুখে তা-ই তিনি উপস্থাপিত করলেন। সমগ্র দেশ তাঁকে অনুসরণ করল। আরবি তখন মিশরের অবিসম্বাদী জননায়ক।

শেরিফ পাশার সি, এন, পি দলের সঙ্গে একত্রিত হয়ে আরবি নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। কিন্তু ব্রিটেন দেশে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, দেশে একতা আনতে চায় নি। তারা চায়ও নি যে আরবি এতদূর জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং সমগ্র দেশ জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। আরবি মন্ত্রীসভার পতন ঘটানোর জন্যে ব্রিটিশ কনসাল জেনারেল তৎপর হলেন।

মন্ত্রীসভা গঠন করে আরবি দাবী জানালেন যে দেশের অর্থনৈতিক ব্যয়-বরাদ্দের ওপর শুধু ব্রিটিশ ও ফরাসীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে না, মন্ত্রীসভারও ক্ষমতা থাকা চাই। ব্রিটিশ ও ফরাসী কন্সাল জেনারেল আরবির এই ঔদ্ধত্যে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। এই দাবী তাঁরা দুজন শুধু নাকচ-ই করে দিলেন না, ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার একটি কড়া নোট পাঠালেন—যাতে মিশরের স্বাধীন অস্তিত্বের প্রতি ব্যঙ্গ ইঙ্গিত ছিল। অপমানিত বোধ করলেন আরবি। মিশর-রাজ তৌফিক ব্রিটিশ ও ফরাসীর হাতের ক্রীড়নক। এই অপমানের বিরুদ্ধে তিনি কোন কথা বলতে সাহস করলেন না। কিন্তু এই ভীতি-প্রদর্শনে স্বাধীন-চেতা আরবি পিছু হটলেন না। ব্রিটিশ ও ফরাসী শক্তির হাত থেকে মিশরকে উদ্ধারের জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হলেন। আরবিকে অপসারিত

করতে চাইলেন তদানীন্তন ফরাসী প্রধান মন্ত্রী গাম্বেতা। ব্রিটিশের ষোল আনা ইচ্ছা থাকলেও হঠাৎ এরকম কঠিন ব্যবস্থার পক্ষপাতী তারা ছিল না। ধীরে সুস্থে এগোনোই উচিত মনে হল তাদের। তারা টালবাহানা করতে লাগল। ইতিমধ্যে গাম্বেতার মন্ত্রীসভার পতন হল। ব্রিটেনের একটা ফাঁড়া কেটে গেল।

মিশরের আভ্যন্তরীন শাসন ব্যাপারে ব্রিটিশ ও ফরাসী হস্তক্ষেপের ফলে দিন দিন দেশের অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগল। তৌফিক মিশরের খেদিভ (রাজা), কিন্তু কাপুরুষ—ব্রিটিশ ও ফরাসী কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত। মিশরীয় মন্ত্রীসভা দেশের শাসনের জন্য দায়ী, কিন্তু সমস্ত ক্ষমতা ব্রিটিশ ও ফরাসী কন্সাল জেনারেলের হাতে। মিশরের সৈন্যবাহিনী—অথচ সমস্ত উচ্চপদে অ-মিশরীয়, অধিকাংশই তুর্কী—যারা মিশরের মন্ত্রীসভার আদেশ অমান্য করে ব্রিটিশ ও ফরাসী কন্সাল জেনারেলের আদেশ মেনে চলে।

এই দুরূহ পরিস্থিতি দূর করার জন্য আরবি প্রয়াসী হলেন। আরবির সঙ্গে বিরোধ বাধল শেরিফ পাশার। আরবি দমলেন না—কারুর যদি সাহায্য না পান তো তিনি একাই সংগ্রাম চালাবেন। মিশরের খেদিভ তৌফিককে সিংহাসনচ্যুত করা ও সেনাবাহিনী থেকে তুর্কী অফিসারদের অপসারণের জন্য তিনি গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহে ব্রতী হলেন। তৌফিক বিপদ গনলেন। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও তুর্কীর কাছে আবেদন জানালেন। তুর্কী সম্রাট এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে শুধু এক ব্যক্তিগত দূত পাঠালেন এই সমস্যা সমাধানের জন্য। ব্রিটেন ও ফ্রান্স রণতরী পাঠাল। আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে উপস্থিত হল সমরসম্ভারে সজ্জিত ব্রিটিশ ও ফরাসী রণতরী। না হলেন আরবি ভীত, না হল মিশরীয়েরা।

কলুষ ব্রিটিশ রাজনীতি আরবি এবং মিশরকে দমন করার জন্য একটি ঘৃণ্য উপায় অবলম্বন করল। ১৮৮২ সন, জুন মাসে হঠাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধল। একদিকে ইউরোপীয় ও আরবীয় খৃষ্টান, অপর দিকে

আররীয় মুসলমান। কি করে দাঙ্গা বাধল, কেন বাধল—সে কথা অবান্তর। আরবি ব্রিটিশ কূটনীতি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে সামরিকবাহিনীর সহায়তায় কঠোরভাবে সেই দাঙ্গা দমন করলেন। ব্রিটিশ কনসাল জেনারেল কিন্তু ঘোষণা করলেন যে আরবির কুশাসনে মিশরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন বিপন্ন, সুতরাং মিশরীয় শাসনের পরিবর্তে ব্রিটিশের শাসনভার গ্রহণ করা উচিত।

আরবি এবং সমগ্র মিশরবাসী সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত মর্মে মর্মে অনুভব করতে পেরেছিলেন, কিন্তু স্বদেশকে বিনা যুদ্ধে পরহস্তে সমর্পন করতে সম্মত হলেন না। ব্রিটিশ এ্যাডমিরাল আরবিকে এক চরমপত্র দিলেন যে মিশর তাঁর রণতরী ধ্বংস করার মতলব করেছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন, সুতরাং তিনি তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন।

১১ই জুলাই, ১৮৮২।

ব্রিটিশের কলঙ্কময় সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসে আর একটি ঘৃণ্য কলঙ্ক-কলুষ দিন সংযোজিত হল। ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল আলেকজান্দ্রিয়ায় বোমাবর্ষণ করতে সুরু করলেন। ব্রিটিশ সৈন্য অবতরণে প্রবলভাবে বাধা দিল মিশরীয় সেনাবাহিনী।

মিশর নতি স্বীকার করল না। মিশরের এই ঔদ্ধত্যে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টান রাগে লাল হয়ে উঠলেন। জাতীয়তাবাদী মিশরীয়দের ধ্বংস করার জন্য ইউরোপীয় বিভিন্ন শক্তির সাহায্য চাইলেন। প্রত্যেককেই অনুরোধ জানালেন সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য করতে।

তুর্কী সম্রাট প্রথমে পাঁচ হাজারের এক সৈন্যবাহিনী দিতে স্বীকৃত হয়ে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেলেন। ফ্রান্স এই ঘৃণ্য ব্যাপারে কোনরকম সাহায্য করতে অস্বীকার করল। ব্রিটেন অবশেষে দ্বারস্থ হল ইটালির কাছে। কিন্তু ইটালিও অসম্মত হল।

ব্রিটিশ সেনাবাহিনী একাই মিশর আক্রমণ করল। উন্নত সামরিক অস্ত্র-সজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে মিশরীয় সেনাবাহিনী পরাজিত

হল। আরবি আত্ম-সমর্পন করলেন। ব্রিটিশ সামরিক বিচারালয়ে আরবি অপরাধী প্রমাণিত হলেন এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে তাঁর প্রাণদণ্ড হল। ব্রিটিশ ও মিশরীয় সরকারের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তার ফলে আরবির শেষ পর্যন্ত প্রাণদণ্ড মকুব হয়, কিন্তু তাঁকে যাবজ্জীবন নির্বাসিত করা হল।
মিশরের প্রথম জাতীয় অভ্যুত্থান ব্যর্থ হল।

মিশরের শাসনভার চলে গেল ব্রিটিশ কনসাল জেনারেলের হাতে। প্রথম শাসনকর্তা হয়ে এলেন লর্ড ক্রোমার। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিপুণ ধ্বজাধারী। মিশরের ভাল-মন্দ বোঝবার ক্ষমতা তাঁর চেয়ে বেশি আর কারুর নেই—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে শাসন করতে সুরু করলেন। বিদেশীদের অর্থশোষণের পথ পরিস্কার করে দিলেন তিনি। বিদেশ থেকে ব্যবসায়ী এনে মিশরে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সুগম করে দিলেন। দেশের অর্থ বিদেশে চালান হতে লাগল। দেশের জন-সাধারণের দুঃখ-দুর্দশার দিকে দৃষ্টি দেবার সময় তাঁর নেই। বাছাই-করা কয়েকজন মিশরীয় তাঁর অনুগ্রহে দিন দিন ধনী হয়ে উঠতে লাগল। দেশের ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্য দিন দিন প্রকট হতে লাগল। মিশরের জাতীয় চেতনায় অবিশ্বাসী লর্ড ক্রোমার কঠোর হস্তে সমস্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করলেন। অধিকাংশ মিশরীয়দের মধ্যে দিন দিন অসন্তোষ জমা হতে লাগল।
দেশ এবং দেশবাসীর এই চরম দুর্দিনে দুইজন তরুণ নেতার সাক্ষাৎ পেল মিশর।
একজন হলেন চরম বামপন্থী হিজব-অল-ওয়াতানি (ন্যাশানাল পার্টি) দলের নেতা মুস্তাফা কামাল। মারা যান মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বয়সে, কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেই মিশরীয় জন-মানসে তাঁর আসন সুদৃঢ় করে যান।
অপর জন হলেন কিছুটা নরমপন্থী হিজব-অল-উম্মা দলের সাদ জঘলুল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্রোমার অবসর গ্রহণ করলেন। তাঁর পরিবর্তে গভর্ণর জেনারেল হয়ে এলেন স্যার এলডন গোর্ষ্ট। যদিও পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী লর্ড ক্রোমারের চেয়ে কিছুটা উদার ছিল। লর্ড ক্রোমারের শাসন কালে মিশরের খেদিভের অবস্থা অত্যন্ত অপমানজনক ছিল, কিন্তু গোর্ষ্ট তদানীন্তন খেদিভ দ্বিতীয় আব্বাসের পূর্ব-মর্যাদা কিছুটা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। মিশরের জাতীয়তা-বাদ আন্দোলনেও তিনি বিমুখ ছিলেন না, বরং নরমপন্থী জাতীয়তা আন্দোলনের জন্য তিনি সাহায্যও করেন। কিন্তু এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে ন্যাশানালিষ্ট পার্টি, কারণ এই নরমপন্থীরা মিশরবাসীদের প্রকৃত প্রতিনিধি ছিলেন না। তাঁরা তুর্কী, খৃষ্টান প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।

১৯১১ সনে গোর্ষ্ট হঠাৎ ক্যান্সারে মারা গেলেন। এবার এলেন সু-বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ লর্ড কিচেনার। তিনি মিশরীয় গণ-চেতনার প্রতি একটু সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। মিশরের শাসন-ব্যবস্থার আমূল সংস্কারে ব্রতী হয়ে ১৯১৩ সনে একটি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এবং একটি জেনারেল এ্যাসেম্বলি গঠন করেন এবং আভ্যন্তরীন শাসনভারের কিছুটা মিশরীয়দের হাতে তুলে দেন।

১৯১৪ সনে লাগল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। লর্ড কিচেনারের ডাক পড়ল ইংল্যাণ্ডে। তিনি চলে গেলেন। মিশরে প্রবর্তিত হল সামরিক শাসন। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে তুর্কী জার্মানীর সঙ্গে একত্র হল। মিশরের খেদিভ দ্বিতীয় আব্বাসকে তুর্কীপন্থী সন্দেহ করে ব্রিটেন তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে তার পরিবর্তে মিশরের খেদিভ করল তাঁর ভাই বৃদ্ধ হুসেন কামেলকে। মিশর হল ব্রিটেনের আশ্রিত রাজ্য।

যুদ্ধকালীন সময়ে জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের ভবিষ্যৎ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন এবং তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন সাদ জঘলুল। মিশরের খেদিভ হুসেন মারা গেলেন যুদ্ধের মধ্যেই ১৯১৭ সনে এবং

এবার খেদিভ বা সুলতান হলেন তাঁর ভাই ফুয়াদ।

যুদ্ধ শেষ হলে পর শান্তি সম্মেলন বসল লণ্ডনে এবং প্যারিসে।

মিশরের স্বাধীনতা-প্রস্তাব এই শান্তি সম্মেলনে পেশ করার জন্য অনুমতি নিতে সাদ জঘলুলের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল (ওয়াফদ) ব্রিটিশ হাইকমিশনরের সামনে উপস্থিত হলেন। মিশরের স্বাধীনতা? —হাই কমিশনরের চোখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। সে আবেদন সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত তো হলই, উপরন্তু এক মুহূর্ত কাল বিলম্ব না করেই জঘলুল সমেত সেই প্রতিনিধি দলের প্রত্যেককে মাল্টায় নির্বাসিত করা হল।

জাতীয়তাবাদী মিশর হাই কমিশনরের এই ঔদ্ধত্য মেনে নিল না। ১৯১৯ সনের বিপ্লব সুরু হল সেই মুহূর্তেই। এই বিপ্লব চালিত হয়েছিল অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে, দেশবাসীর পূর্ণ সহযোগিতায়। সমগ্র দেশে হরতাল, যানবাহন চলাচল বন্ধ, কায়রোর সঙ্গে সমস্ত জগতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, পথেঘাটে গুপ্ত ঘাতকের হাতে সামরিক ও বেসামরিক ব্রিটিশ নিহত হতে লাগল। ব্রিটিশ সামরিক শক্তি নির্মম নির্যাতনে সেই বিপ্লব চূর্ণ করল।

কিন্তু বিপ্লব সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নি। ব্রিটেনের বিনা কারণে দেশনায়কদের নির্বাসন, বিপ্লব দমনের অজুহাতে দেশবাসীর ওপর অমানুষিক অত্যাচারের সংবাদ সমগ্র পৃথিবী জানতে পেরেছিল। বৃহৎ শক্তিদের চাপে ব্রিটেনের নতি স্বীকার করতে হল। বাধ্য হয়ে ব্রিটেন নির্বাসিত নেতাদের মুক্তি দিল। সাদ জঘলুল প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে মিশরের দাবী পেশ করলেন।

কিন্তু শান্তি সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদের পদানত জাতির কথা শুনবে কে, যেখানে সেই সম্মেলনের সর্বময় প্রধান দুই চরম সাম্রাজ্যবাদী—ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ এবং ফরাসী প্রধান মন্ত্রী ক্লেমেনসো? এই দুই ঔপনিবেশিক শক্তি যে পদানত উপনিবেশের দুঃখ-বেদনার কাহিনীতে কর্ণপাত করবে না তা সকলেই জানত। সেখানে ব্যর্থ হয়ে জঘলুল আবেদন জানালেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের

কাছে ; কিন্তু তিনি পূর্বেই ব্রিটেনকে কথা দিয়েছিলেন যে মিশর ব্রিটেনের আশ্রিত রাজ্য থাকবে। আমেরিকার বহু-বিজ্ঞাপিত পরদেশী স্বাধীনতার মন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস হারাল মিশর। আবেদনে নিবেদনে স্বাধীনতা লাভ করা যায় না—এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেন মিশরের জাতীয়তাবাদীরা।

আশ্রিত রাজ্য মিশরের জন্য নতুন সংবিধান রচিত হবে স্থির করলেন ব্রিটিশ সরকার। ঔপনিবেশিক সচিব লর্ড মিলনারের নেতৃত্বে এল সেই মিশন মিশরে জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করতে। মিশরীয় রাজনৈতিক দল তাঁদের অভ্যর্থনা জানাল কৃষ্ণ পতাকা দেখিয়ে এবং সম্পূর্ণরূপে বয়কট করে। জনসাধারণ আর এক ধাপ এগিয়ে গেল। সমগ্র মিশরে বাধল ব্রিটিশ-বিরোধী দাঙ্গা, গুপ্তহত্যা, অরাজকতা। লর্ড মিলনার দলবল নিয়ে মিশর ত্যাগ করলেন। মিশর যেন আর শান্ত হবে না। জঘলুল এবং অন্যান্য ওয়াফ-দিষ্ট নেতাদের কয়েকবারই নির্বাসিত করা হল। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির সামান্যতম উন্নতি দেখা গেল না।

ব্রিটিশ সরকার প্রমাদ গণলেন। পশু সামরিক শক্তি দিয়ে দেশ জয় করা যেতে পারে,দেশের মানুষ জয় করা যায় না। মিশরে ব্রিটিশ অনেক কিছুই হারিয়েছে, যদি কিছুটা তার থেকে উদ্ধার করা যায় এই আশায় ব্রিটেন এক নতুন শ্বেতপত্র প্রকাশ করল। সেই ঘোষণা অনুযায়ী ব্রিটেন মিশরের সঙ্গে এক নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। ব্রিটিশ মেনে নেবে মিশরকে এক স্বাধীন রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে, পরিবর্তে ব্রিটিশের হাতে থাকবে মাত্র কয়েকটি ক্ষমতা—মিশরের প্রতিরক্ষা, মিশরে বিদেশীদের নিরাপত্তা।

এই চুক্তির ফলে খেদিভ ফুয়াদ রাজা ফুয়াদ হলেন।

নতুন সংবিধান রচনা শেষ হলে পর দেশের জনসাধারণের আবার মোহভঙ্গ হল। এ আর এক রকম একনায়কতন্ত্র, স্বেচ্ছাচারতন্ত্রও বলা যেতে পারে। নতুন সংবিধানে বিধান সভা সৃষ্টি হল, বিধান সভার

সদস্যরাই মন্ত্রীসভা গঠন করবেন, আইন প্রণয়ন করবেন—সে দিক দিয়ে কোন গোল নেই ; গোল বাধল বিধান সভার সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে এবং রাজার ক্ষমতায়। বিধান সভার নির্দিষ্ট সভ্য সংখ্যার মধ্যে পাঁচ ভাগের তিন ভাগ জনসাধারণের ভেতর থেকে নির্বাচিত হবে এবং দুই ভাগ রাজা নিজের পছন্দমত মনোনীত করবেন। রাজার আর একটি বিশেষ ক্ষমতা হল, তিনি যখন খুশি বিধান সভা ভেঙে দিয়ে নিজের হাতে শাসনভার তুলে নিতে পারবেন।

মিশরের রাজনৈতিক আকাশে এখন তিন গ্রহের সহাবস্থানে জটিল পরিস্থিতি। ব্রিটিশ, রাজা এবং ওয়াফদিষ্ট পার্টি—প্রত্যেকেই নিজের শক্তি প্রদর্শনে ব্যস্ত। এর মধ্যে ব্রিটিশের শক্তি সবচেয়ে বেশি। নির্বাচনে প্রতিবারই জঘলুলের নেতৃত্বে ওয়াফদিষ্ট পার্টি বিপুল সংখ্যাধিক্যে বিধান সভা দখল করছে, মন্ত্রীসভাও গঠন করছে। যখনই ব্রিটিশের মনে হচ্ছে যে ওয়াফদিষ্ট পার্টির হাতে আর শাসনভার রাখা উচিত নয় তখনই তারা চাপ দিচ্ছে রাজার ওপর। রাজা ওয়াফদিষ্ট পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করে সংখ্যালঘু দল নিয়ে শাসন করতে চেষ্টা করেন, না পারলে আবার নির্বাচনের আদেশ দেন।

১৯২৭ সালে মারা গেলেন জঘলুল। তাঁর মৃত্যুতে ওয়াফদিষ্ট পার্টি একটু দুর্বল হয়ে পড়ল। এবার নতুন নেতা হলেন নাহাশ পাশা। রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলাল না। আবার আগের মতই নির্বাচন, ওয়াফদিষ্ট পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা, নাহাশ পাশার মন্ত্রীতে মন্ত্রীসভা গঠন, রাজার খুশিমত বিধানসভা মুলতুবী। ১৯৩০ সনে নির্দলীয় নেতা ইসমাইল সিদ্দিকী পাশা প্রধানমন্ত্রী হয়ে সংবিধান রদ করে পাঁচ বৎসর কাল নিজে স্বেচ্ছাচারী মন্ত্রিত্ব করে গেলেন।

ফলে মিশরীয় অন্তর্ঘাতী সমিতির জন্ম হল। এবারে আর ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ নয়, এক একটি ব্রিটিশকে হত্যা করা স্থির হয়। এই অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চরমে উঠল সেদিন যেদিন মিশরীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং সুদানের গভর্ণর জেনারেল স্যার লি

স্ট্যাককে কায়রোয় হত্যা করা হয়। ব্রিটিশ সরকারের কড়া নোট এল : এই মুহূর্তে সুদান থেকে সমস্ত মিশরীয় সেনাবাহিনী সরিয়ে ফেলতে হবে এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড দিতে হবে। ভয়ে মিশর সরকার ব্রিটিশের দাবী মেনে নিল।

এই ব্যাপারের ফল হল দ্বিমুখী। একদিকে সুদানেও জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত হল, অপরদিকে সুদানে মিশরীয় প্রভাব দূর হয়ে গিয়ে মিশর ও সুদানের এক রাষ্ট্র হওয়ার আশাও সম্পূর্ণ নির্মূল হল। 'সুদান ফর সুদানীজ্' ধ্বনি উঠল এই সময়েই, শত চেষ্টা করেও ভবিষ্যতে নেগুইব বা নাসেরের মিশর সেই সুদানকে মিশরের সঙ্গে একত্রিত করতে পারে নি।

ইসমাইল সিদ্দিকী ছিলেন ধনী শিল্পপতি এবং জমিদারদের হাতের লোক। এঁদেরই সাহায্যে ও প্রচেষ্টায় ওয়াফদিষ্ট পার্টির হাত থেকে শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হল ১৯৩৭ সালে—সাদিষ্ট পার্টি।

নতুন দল গঠিত হলে হবে কি—প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের ভারতবর্ষের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মত মিশরে ১৯৫২ সন পর্যন্ত ওয়াফদিষ্ট পার্টি ছাড়া আর প্রকৃতপক্ষে কোন রাজনৈতিক দল ছিল না। ওয়াফ-দিষ্ট পার্টির মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শক্তিকে মিশর থেকে উৎখাৎ করা —সেইজন্যই সকলে ওয়াফদিষ্ট পার্টির পতাকা তলে এসে মিলিত হত। অথচ দৃষ্টিভঙ্গীর গোঁড়ামির জন্য ও স্বার্থদুষ্ট লোকের অনুপ্রবেশে দিন দিন এই পার্টির কার্যকলাপে ও সংগঠনে পচন ধরছিল। ক্ষমতা মানুষকে দুষ্ট করে ; এক নাগাড়ে এতদিনকার একচ্ছত্র রাজনৈতিক গগনে একাধিপত্য করার ফলে সেই দোষ এসে বাসা বেঁধেছিল এই দলে এবং এই দলনেতাদের মধ্যে।

১৯৩৬ সনে মুসোলিনির দৃষ্টি পড়েছিল উত্তর আফ্রিকার ওপর। মিশরের আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে মুসোলিনি মিশরের ওপরও লুব্ধ দৃষ্টি দেন। ব্রিটিশও যেমন শঙ্কিত হল, মিশরও

তদনুরূপ শঙ্কিত হল। অপরিচিত শত্রুর চেয়ে বরং পরিচিত শত্রুর সঙ্গে একত্র ঘর করা ভাল—এই মনে করে ব্রিটিশ ও মিশরের জাতীয়তা-বাদী নেতারা কিছুদিনের জন্য পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলালেন। আবার একটা নতুন চুক্তি সম্পাদিত হল। ব্রিটিশ মিশরকে সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করতে সম্মত হল; নিজেদের হাতে রাখল শুধু মিশরের আকাশ-পথে ব্রিটেনের সামরিক বিমান চলাচলের অধিকার, সুয়েজ খালে ব্রিটিশ সেনাঘাঁটি এবং যুদ্ধের সময় মিশরের সক্রিয় সাহায্য।

কিছুদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল। ১৯৪০ সনে উত্তর আফ্রিকায় এই যুদ্ধ এসে হানা দিল। চুক্তি অনুযায়ী মিশর ব্রিটিশকে সাধ্যমত সাহায্য করতে অগ্রসর হল। মিশরীয়দের মধ্যে আর ব্রিটিশ বৈরীভাব নেই, এ যেন তাদের নিজেদের দেশের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ।

১৯৪২ সনে জার্মান সেনাপতি রোমেল মিশরের দিকে অগ্রসর হলেন। রাজা ফারুক এই সময় আলি মেহের পাশাকে মন্ত্রীসভা গঠন করতে আহ্বান জানালেন। ব্রিটিশের ধারণা ছিল আলি মেহের পাশা সম্পূর্ণ জার্মান-দরদী। জার্মান-সহানুভূতিসম্পন্ন প্রধান মন্ত্রী একদিকে, অপর দিকে জার্মান সেনাপতি রোমেল। ব্রিটিশ আর স্থির থাকতে পারল না। চুক্তি ভঙ্গ করে মিশরের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অগ্রসর হল।

রাজা ফারুক তাঁর আবেদিন রাজপ্রাসাদে সুখনিদ্রায় মগ্ন। হঠাৎ ব্রিটিশ হাইকমিশনার স্যার মাইলস্ ল্যাম্পসন এবং মিশরের ব্রিটিশ সামরিক অধিকর্তা সেই আবেদিন প্রাসাদের চতুর্দিক ট্যাঙ্ক ও ব্রিটিশ সৈন্য দিয়ে ঘিরে ফেললেন। ট্যাঙ্কের কামানগুলো লক্ষ্য করে রইল আবেদিন প্রাসাদের ওপর। ব্রিটিশ সামরিক অধিকর্তা স্বয়ং এই অবরোধ পরিচালনা করলেন। ভীত-বিস্মিত রাজপ্রহরীদের অস্ত্রহীন করা হল।

এবার স্যার মাইলস্ ল্যাম্পসন একটা ছাপা কাগজ হাতে নিয়ে

আবেদিন প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। হাঁক দিলেন—রাজা ফারুককে এখনি আমার সঙ্গে দেখা করতে বল।

রাজার এই সবে ঘুম ভেঙেছে, এখনো বাইরের কারুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন নি—উত্তর হল।

একটা কথাও শুনতে চাই না—হুঙ্কার দিলেন ল্যাম্পসন।—এই মুহূর্তে ডাক দাও, নয়তো কামানের গোলায় রাজা-সমেত আবেদিন প্রাসাদ উড়ে যাবে।

সংবাদ পেয়ে রাজা ফারুক ছুটে এলেন।

ল্যাম্পসন হাতের কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বললেন—হয় এই কাগজে এখনই সই করতে হবে, নয়তো এই মুহূর্তে সমস্ত লোকজন-রাজা-সমেত প্রাসাদ অবরোধকারী ব্রিটিশ বাহিনী কামান দেগে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।

কাগজে লেখা ছিল ঃ আলি মেহের পাশাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করে নাহাশ পাশাকে মিশরের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করা হল।

রাগে, অপমানে রাজা ফারুকের কর্ণমূল রক্তরাঙা হয়ে উঠল। নিরুপায় অসহায়তার কথা স্মরণ করে সেই কাগজে তিনি সই করলেন ; কিন্তু এই অপমান তিনি জীবনে বিস্মৃত হলেন না।

নাহাশ পাশা প্রধান মন্ত্রী হলেন।

এই মারাত্মক চালে ব্রিটিশ সেই সময় জয়ী হল বটে, কিন্তু মিশরে ব্রিটিশ প্রভাবের কবরও খোঁড়া হল এই চালের সঙ্গে সঙ্গে।

এই মারাত্মক চাল ভবিষ্যতে আরও দুটি ব্যাপারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিল—এক, ওয়াফদ্ আন্দোলন ধ্বংস এবং দুই, মিশরে রাজতন্ত্র বিলোপ।

ওয়াফদিষ্ট পার্টি তখনও সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল, কিন্তু ইতিমধ্যে মিশরে আরো রাজনৈতিক দল দিন দিন বড় হচ্ছে। সাদিষ্ট পার্টি তো ছিলই, এখন এল সোস্যালিষ্ট পার্টি, কম্যুনিষ্ট পার্টি আর মুসলিম ব্রাদারহুড। এদের মধ্যে মুসলিম ব্রাদারহুডের রাজনীতি

মান্ধাতা আমলের। এর সর্বাধিনায়ক সেখ হাসান এল-বান্নার-র ধারণা একমাত্র "বিশুদ্ধ ইসলাম"-এর উজ্জীবনের ফলেই দেশের সব সমস্যা দূর হবে। এই ব্রাদারহুড দল তাদের রাজনৈতিক কার্য-সিদ্ধির জন্য একটি অন্তর্ঘাতী শাখা খুলল এবং গুপ্ত রাজনৈতিক হত্যায় মত্ত হল।

আর একটি দলও গোপনে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। মিশরের সামরিক বাহিনীর কয়েকজন অফিসার 'ফ্রি অফিসারস' নাম দিয়ে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করে নিজেদের লক্ষ্যে অত্যন্ত গোপনে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

ব্রিটিশের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পর রাজা ফারুক ব্রিটিশদের ওপর যেমন প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক সেইরকম মিশরের আভ্যন্তরীন রাজনীতিতেও আস্থাহীন হয়ে পড়েছিলেন। নিজে ইউরোপের বিলাসভূমিতে বিলাসব্যসনে সব সময় মত্ত থাকতেন। তাঁর সম্বন্ধে নানারকম সত্য মিথ্যা কাহিনীতে মিশর সর্বদা মুখর। মিশরের জনগণ তাঁর কীর্তিকলাপে তাঁর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

ঠিক এই সময় ১৯৪৮ সনে ব্রিটিশ প্যালেষ্টাইনের শাসনভার (ম্যাণ্ডেট) ত্যাগ করল এবং নতুন ইহুদি-রাষ্ট্র ইজরায়েলের জন্ম হল। জবরদখল ইহুদি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সমস্ত আরবজাতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। সমস্ত আরব-রাষ্ট্র যখন ইহুদিদের প্যালেষ্টাইন অধিকারে বাধা দেওয়ার জন্য উদ্যোগী হল, রাজা ফারুকও ব্রিটিশ-পালিত ইহুদিদের ধ্বংসের জন্য অপ্রস্তুত মিশরীয় সেনাবাহিনীকে প্যালেষ্টাইন অধিকার করতে পাঠালেন।

এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মিশর পরাজিত হল। সে অন্য ইতিহাস। কিন্তু আর এক ইতিহাসের ক্ষেত্রও প্রস্তুত হল এই সময়ে। এই পরাজয়ের ফলস্বরূপ মোহম্মদ আলির প্রতিষ্ঠিত মিশরের রাজবংশ ধ্বংস হল সামান্য কিছুদিন পরেই।

ইজরায়েল প্রতিষ্ঠার পর মিশরের জনগণের মধ্যে ব্রিটিশের প্রতি বিরোধিতা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। নাহাশ পাশা ১৯৩৬ সনের স্বাক্ষরিত মিশর-ব্রিটেন চুক্তি একতরফা নাকচ করেন। ব্রিটেনকে সুয়েজ থেকে সৈন্য অপসারণ করতে বলা হয়। ব্রিটেন স্বীকৃত হয় না। দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক তিক্ততা বৃদ্ধি পায়।

ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিরাজউদ্দীন মুসলিম ব্রাদারহুডের সাহায্যে সুয়েজ অঞ্চলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ওপর গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। সুয়েজে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করা হল, সুয়েজ খালে কাজ করার জন্য মিশরীয় মজুর আর পাওয়া গেল না।

প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ১৯৫২ সালের ২৫শে জানুয়ারি ইসমাইলিয়ার পুলিশের প্রধান দপ্তর অবরোধ করে পঞ্চাশজন পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করে, শতাধিক আহত হয়।

পরদিন কায়রোতে জ্বলে উঠল আগুন। প্রতিটি ব্রিটিশের বাড়ি, অফিস, ক্লাব আগুনে ভস্মীভূত হল। ব্রিটিশ খয়ের-খাঁদের একটি বাড়িও বাদ গেল না।

রাজা ফারুক নাহাশ পাশাকে বরখাস্ত করলেন। আবার প্রধান মন্ত্রী হলেন আলি মেহের পাশা।

কিন্তু তাঁর মন্ত্রিত্ব টিঁকে ছিল মাত্র এক মাস।

ফারুক মিশরের রাজা হয়ে থাকতে পেরেছিলেন তারপর আর মাত্র পাঁচমাস।

জাতীয় পুনরুজ্জীবনে লেবানন ও সিরিয়াও মিশরের চেয়ে বেশি পিছিয়ে ছিল না। মিশরের পাশা মোহম্মদ আলি যখন তুর্কী সম্রাটের হাত থেকে জোর করে সিরিয়া দখলের জন্য তাঁর পুত্র ইব্রাহিমকে পাঠালেন, সেই সময়েই এই দুই দেশে জাতীয় পুনরুজ্জীবন দেখা দিল। তুর্কী সম্রাটের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেশের সকলে সেদিন আক্রমণকারী ইব্রাহিমকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। তারা ইব্রাহিমের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে নি সত্য, কিন্তু ইব্রাহিম তাদের জাতীয় চেতনা-জাগরণে অন্যদিক দিয়ে সাহায্য করলেন।

ইব্রাহিম মোহম্মদের মত ছিলেন না। তিনি আরব দেশে মানুষ হয়েছেন, আরবদের তিনি ভালবাসতেন, আরব-ঐতিহ্যের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। এই দেশের পাশা হয়ে তিনি প্রথম এই দেশবাসীর নৈতিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিলেন।

আমেরিকা ও ফ্রান্স থেকে তখন দলে দলে খৃষ্টান মিশনারী বিভিন্ন দেশে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করছে। ইব্রাহিম তাঁর রাজ্যে তাদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দিলেন।

সিরিয়া-লেবাননে মিশনারী বিদ্যালয় খোলার ধূম পড়ে গেল। ফরাসী, আমেরিকান, ইংরেজ, স্কচ, জার্মান, রাশিয়ান মিশনারীরা যে-যেখানে পারল স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি খুলতে সুরু করল। এল ক্যাথলিক, প্রোটেষ্ট্যান্ট, প্রেসবিটারিয়ান, জেস্যুইট খৃষ্টান সম্প্রদায়েরা। কয়েক বছরের মধ্যে লেবানন হল আরব-রাষ্ট্রে পাশ্চাত্য-শিক্ষার পীঠস্থান। এক বেইরুতে সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে চল্লিশটিরও বেশি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হল।

ফরাসী স্কুলে শিক্ষার মান ছিল উন্নত; কিন্তু এই সব বিদ্যালয়ে ফরাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর দৃষ্টি দেওয়া হত যত বেশি, দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতি হত তত অবহেলিত। কিন্তু আমেরিকানরা জোর দিলেন দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর। সমস্ত আরব দেশ থেকে ছাত্রেরা পড়তে আসতে সুরু করল এই সব মিশনারি স্কুলে। এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যমেই ছাত্রেরা নতুন করে দেশীয় ভাষা ও দেশীয় সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করতে সুরু করল। সমস্ত আরব রাষ্ট্রের একই ভাষা, একই সংস্কৃতি ও একই সমস্যা। ছাত্রদের মধ্যে ধীরে ধীরে একটি আন্দোলন গড়ে উঠতে লাগল—আরব-ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এই আন্দোলনে খৃষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ দেখা গেল না, সকলেই আরব—এই তাদের একমাত্র পরিচয়। তাদের সকলের এই একই ধারণা হয়েছিল যে এক ভাষা, এক সংস্কৃতি এবং এক ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে তারা সকলে একত্র হয়ে অটোমান তুর্কী সম্রাটের হাত থেকে পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে পারবে।

এই আন্দোলনের প্রথম বহিঃপ্রকাশ হল ১৮৮০ সনে।

বেইরুতে একটি জাতীয় পুনরুজ্জীবন সমিতি সংগঠিত হল। এর সদস্য হলেন জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেক আরববাসী। কর্মপন্থা স্থির হল: আরবী ভাষাকে এ দেশের সরকারী ভাষার মর্যাদা দিতে হবে, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। সিরিয়া ও লেবাননের বড় বড় শহরে এই সমিতি আন্দোলন সুরু করলেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় এই আন্দোলনে যোগ দিলেন; কিন্তু অনেকেই সহানুভূতি সম্পন্ন হয়েও তুর্কী সম্রাটের সম্মুখ বিপক্ষ আচরণ করতে ভীত হয়ে নীরব দর্শকের মত রইলেন। তুর্কী পুলিশ সংস্থা এই সমিতির সদস্যদের পিছনে লাগল এবং নির্যাতনের ফলে এই সমিতি ভেঙে যায়।

তুর্কী সম্রাটের অত্যাচারে পীড়িত অনেক আরবই আমেরিকা, মিশর ও সুদান প্রভৃতি জায়গায় চলে যায়। অধিকাংশই যায় মিশর ও সুদানে—পূর্ব বাসভূমির কাছে—প্রায় একইরকম ভাষা ও সংস্কৃতি।

তা ছাড়া তুর্কীর অধীনতার চেয়ে ব্রিটিশের অধীনতা অনেক ভাল— এতদিনে এই ধারণাই তাদের হয়েছিল। এই আরব-খৃষ্টানেরা মিশরের জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে একাত্ম হতে পারেন নি আন্দোলনকারীদের ঐশ্লামিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য; কিন্তু সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানে তাঁরা যে শুধু সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তা-ই নয়, অনেক ক্ষেত্রে অগ্রণীও ছিলেন। মিশরে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন এই আরব-খৃষ্টানেরা।

তুর্কী সুলতানের স্বেচ্ছাচারে তুর্কীর অধিবাসীরা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। তুর্কীর তরুণরা এই সুলতানের আইন-বিরোধী খেয়ালখুশি মাফিক রাজ্য-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য একটি সমিতি গঠন করল। নাম—Young Turks বা তরুণ তুর্কী। এই তরুণ তুর্কী সমিতি দিন দিন অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তরুণ তুর্কীরা সারা তুর্কীতে সুলতানী স্বেচ্ছাতন্ত্রের অনাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালায়। তুর্কীর অধীন আরব দেশও এই আন্দোলনে যোগ দিল।

এই আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করলেন সম্রাট। বত্রিশ বছরের মুলতুবি সংবিধান অনুযায়ী দেশে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সম্মত হলেন এবং অটোমান সাম্রাজ্যে জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেকের সমান অধিকার ঘোষণা করলেন। ফলে তুর্কীদের সঙ্গে আরবদেরও সমান অধিকার স্বীকৃত হল। পার্লামেণ্ট ও মন্ত্রীসভায় তুর্কীদের সঙ্গে একা-সনে আরবরা বসলেন। তুর্কী ও আরবদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠ হল।

কিন্তু তেলে জলে কখনো মিশ খায় না; রাজার দেশের লোক ও প্রজার দেশের লোকেরও মিল হতে পারে না। কিছুদিনের মধ্যেই আরবদের স্বপ্নভঙ্গ হল। অটোমান সাম্রাজ্যে তুর্কীর সংখ্যার চেয়ে আরবের সংখ্যা অনেক বেশি, অটোমান সাম্রাজ্যে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত হলে পার্লামেণ্টে ও মন্ত্রীসভায় আরব প্রতিনিধির

সংখ্যাধিক্য হওয়া উচিত। কিন্তু তুর্কীরা নির্বাচন এমনভাবে অনুষ্ঠিত করত যে তুর্কী প্রতিনিধির সংখ্যা আরব প্রতিনিধির সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি হত।

বিক্ষুব্ধ আরববাসীরা আরো দেখল যে তরুণ তুর্কী দল সম্রাটের কাছ থেকে তাদের দাবী আদায়ের পর থেকে তাদের এই আন্দোলন নিজে-দের মধ্যেই সীমিত রাখার চেষ্টা করছিল, আরবদের দল থেকে সরিয়ে দিচ্ছিল। মর্মাহত আরবরা তুর্কী-প্রেমের বিষ-দংশনে ব্যথিত হয়ে দূরে সরে এল এবং নিজেরাই একত্র হবার চেষ্টা করতে লাগল।

আরবরা তুর্কীদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে নিজেরাই গোপন আন্দোলন স্থুরু করলেন। কয়েকটা গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠল। ইয়ঙ্গ টার্কস্-এর মত গঠিত হল ইয়ঙ্গ আরবস্ বা অল-ফাতাত। আর একটি দল—অল-আহদ। সাধারণ দেশবাসীর মত অটোমান সৈন্য-বাহিনীর আরব অফিসারেরাও তুর্কীদের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে-ছিলেন। তাঁরাও এসে এই দুই দলে গোপনে যোগ দিলেন।

সিরিয়া ও লেবাননে আরব জাতীয়তাবাদের বীজ অঙ্কুরিত হলেও অন্যান্য আরবদেশে তার হাওয়া ঠিক পৌঁচোচ্ছিল না। আরব দেশ-গুলির মধ্যে যোগাযোগ ও যাতায়াতের ব্যবস্থার চরম দুরবস্থার জন্যই আরবদেশগুলির মধ্যে জাতীয়তাবাদের সামগ্রিক প্রসার ও বিস্তারে অসুবিধা হচ্ছিল। এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাওয়ার একমাত্র উপায় হয়েছে উট। মরুভূমির ভেতর দিয়ে এক দেশ থেকে আর এক দেশে উটে করে যেতে সময়ও লাগত অনেক; কিন্তু অটোমান স্থলতান নিজেই সেদিক দিয়ে কিছুটা স্থবিধা করে দিলেন। তিনি দামাস্কাস থেকে মদিনা পর্যন্ত একটি রেলপথ নির্মান করে দিলেন। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কৃতজ্ঞতাভাজন হওয়ার জন্য ঘোষণা করলেন যে হজ যাত্রীদের স্থবিধার জন্যই তাঁর এই প্রচেষ্টা, কিন্তু মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। আরব উপদ্বীপে যাতায়াতের পথ অত্যন্ত অসুবিধাজনক থাকায় তুর্কী থেকে ওই দেশের ওপর তাঁর আধিপত্য

বজায় রাখা কঠিন হয়ে ওঠে। সামরিক বাহিনীর যাতায়াতের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যেই তিনি এই রেলপথ চালু করেন।
এই রেলপথ কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদ প্রচারে সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়ে উঠেছিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই এই আন্দোলনকে সমগ্র আরব-ভূমিতে সুদৃঢ় করে তুলল। জাতীয়তাবাদী নেতারা একদেশ থেকে অন্য দেশে অল্প সময়ের মধ্যে গিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে নিজেদের মতবাদ সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কিন্তু আরব জাতির স্বাধীনতা আন্দোলন শীঘ্রই দুই বিভিন্ন মুখে প্রবাহিত হতে সুরু করল।
১৯১১ সনে তুর্কী সুলতান আব্দুল হামিদকে পরাজিত করে ইটালি ত্রিপোলিট্যানিয়া অধিকার করে নেয়। ১৯১২ সনে ফ্রান্স হানা দিল মরোক্কোয় এবং সেই দেশ গ্রাস করল। ইতিপূর্বেই আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়া ফ্রান্সের করায়ত্ত হয়েছে। মিশরেও ব্রিটিশ শক্তি শক্ত শিকড় নিয়ে বসে আছে। অর্থাৎ উত্তর আফ্রিকার সব কয়টি আরব রাজ্যই ইউরোপীয়—বিশেষতঃ খৃষ্টান—শক্তির পদানত।
আর অন্য দিকে লেবানন, ইরাক, সিরিয়া এবং আরব উপদ্বীপ আর এক ইউরোপীয়—যদিও মুসলমান—শক্তির পদানত।
১৯১৪ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধলে তাই আরব-জাতীয়তাবাদীরা দিশেহারা হয়ে পড়লেন। কার পরাজয়ের জন্য তাঁরা সংগ্রাম করবেন? একদিকে আলজেরিয়া, মরোক্কো, তিউনিসিয়া, ত্রিপোলিট্যানিয়া ও মিশরের জাতীয়তাবাদীরা চাইছিল মিত্রশক্তি অর্থাৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালির পরাজয়; অপরদিকে অন্যান্য আরব-রাজ্যগুলি কামনা করছিল তুর্কীর পরাজয়। দুই দলেরই পরস্পর-বিরোধী একই স্বার্থ-প্রণোদিত কামনা; তাদের পদানতকারীর পরাজয়ে তারা স্বাধীনতা লাভে সক্ষম হবে।
একের লাভ, অপরের ক্ষতি।

কিন্তু এই দুই দলেরই শেষ পর্যন্ত নিরাশ হতে হল।

যুদ্ধে মিত্র শক্তি জয়ী হল। সুতরাং উত্তর আফ্রিকার আরব রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা লাভ আর হল না। যুদ্ধে তুর্কী পরাজিত হল, কিন্তু শান্তি সম্মেলন এবং ব্রিটেন আর ফ্রান্সের মধ্যে গোপন চুক্তি অনুযায়ী এশীয় আরব রাষ্ট্রগুলিকে এই দুই ইউরোপীয় শক্তি নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল।

আরব উপদ্বীপে কুয়াইৎ, ইয়েমেন ও কাতার প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই ব্রিটিশ প্রভাবে ছিল। ব্রিটিশের সাহায্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই আব্দুল আজিজ ইবন সৌদ এই অঞ্চলের একচ্ছত্র শাসনকর্তা হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং সমগ্র আরব উপদ্বীপ ব্রিটিশ প্রভাবাধীনে এসে পড়ল।

কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের পুরোধা হয়ে দাঁড়ালেন মক্কার শেরিফ হুসেন। এই আরব জাতীয়তাবাদের ধ্বজা তুলেই তিনি তাঁর এক পুত্র আবদাল্লাকে জর্ডনের রাজা এবং অপর পুত্র ফয়জলকে ইরাকের রাজা করতে সক্ষম হন।

তুর্কী সুলতান আবদুল হামিদ হুসেনকে ১৯০৮ সনে কনষ্ট্যান্টিনোপলে নজরবন্দী করে রেখে দেন। আন্দোলনের ভয়ে শেষে তাঁকে মুক্তি দিয়ে মক্কার শেরিফ করে পাঠান। কিন্তু এত অল্পে খুশি হবার লোক হুসেন নন। মক্কার শেরিফ নামে জমকালো হতে পারে, প্রকৃতপক্ষে ভেতর ফাঁপা। ইসলামের তীর্থস্থানগুলি দেখা শোনা করাই তাঁর কাজ। তাঁর উচ্চাকাঙ্খা অনেক অনেক বেশি। শুধু হেজাজের শাসনকর্তা হয়ে তিনি থাকতে চান না।

আরব উপদ্বীপে তিনিও ক্ষমতাশালী হতে চান। সুতরাং হেজাজের সমস্ত জাতি ও উপজাতির ওপর তিনি ধীরে ধীরে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করতে লাগলেন। এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাও হস্তগত করলেন

প্রথমেই তুর্কীর বন্ধন ছিন্ন করা প্রয়োজন, নয়তো তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতার কোন মূল্য নেই। ব্রিটিশ আরব উপদ্বীপে ইতিপূর্বেই যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে, সুতরাং তুর্কীর ক্ষমতা-মুক্ত সমগ্র আরব উপদ্বীপে তাঁর প্রভাব বিস্তারে ব্রিটেন হয়তো সম্মত হতে পারে।

তুর্কীর বিরাগভাজন হবেন জেনেশুনেই তিনি তাঁর পুত্র আবদাল্লাকে পাঠালেন মিশরে লর্ড কিচেনারের কাছে। হুসেনের যে প্রস্তাব নিয়ে আবদাল্লা গেলেন তা হল ঃ হুসেন তুর্কী সুলতানের শাসন-ক্ষমতা ছিন্ন করবে এবং পরিবর্তে ব্রিটিশ তাঁকে স্বাধীন আরব-রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করুক।

তখন ১৯১৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাস। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ তখনও বাধে নি। তুর্কী তখনও ব্রিটেনের বন্ধু। ব্রিটেন এই প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হতে পারে না। শূন্য হাতে আবদাল্লা ফিরে এলেন।

কিন্তু জার্মানীর সঙ্গে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধল আর কয়েক মাস বাদেই। তরুণ তুর্কীদের চাপে পড়ে তুর্কী এই যুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে যোগ দিয়ে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মধ্য-প্রাচ্যে ধর্মান্ধ আরবজাতিকে যদি ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা যায়, তবে এদিকে মিত্রশক্তির দাঁড়ানো কঠিন হয়ে পড়বে। সুতরাং তুর্কী সুলতান সমগ্র আরবজাতিকে বিধর্মী ব্রিটিশ ও ফরাসীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে আহ্বান জানালেন।

মধ্যপ্রাচ্যে বিপজ্জনক পরিস্থিতি। মুসলমান তুর্কী সম্রাট মুসলমান আরবদের বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে বলেছেন। এদের সংযত রাখা সর্বপ্রথম প্রয়োজন, তার পর তুর্কীর বিরুদ্ধে এদেরই নিয়োগ করা। ব্রিটেনের মনে পড়ে গেল হুসেনের প্রস্তাবের কথা। হুসেন মক্কার শেরিফ, তার ওপর হজরতের বংশধর। সুতরাং ধর্মান্ধ মুসলমানেরা তুর্কীর সুলতানের চেয়ে হুসেনের কথাই বেশি মানবে।

হুসেন কিন্তু এদিকে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নেই। তিনি সিরিয়া ও ইরাকের

জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য করেছিলেন যে, পাশ্চাত্য শক্তির সাহায্য ব্যতীত তাদের স্বাধীনতা লাভ কোনমতে সম্ভব নয়।

ব্রিটেন মিশরের তদানিন্তন গভর্ণর জেনারেল স্যার হেনরি ম্যাকমোহনকে লিখলেন হুসেনকে দলে টানতে। ম্যাকমোহন ও হুসেন দীর্ঘ দিন ধরে পত্রালাপ চালালেন।

এই পত্রালাপে সমগ্র আরবজাতি স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খায় উন্মুখ হয়ে উঠল। তারা স্বপ্ন দেখল আরব উপদ্বীপ, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, ইরাক, এবং লেবানন জুড়ে এক বিরাট আরব-সাম্রাজ্য। কিন্তু হুসেনকে এই সাম্রাজ্যের নেতা বলে মেনে নিতে সিরিয়া ও লেবাননের বাধছিল। শিক্ষাদীক্ষায় তারা অনেক বেশি উন্নত, তাদের দেশ অনেক প্রগতিশীল। কিন্তু তুর্কীর এত কাছাকাছি থেকে তাদের পক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা তো আর সম্ভব নয়। সুতরাং হুসেনই বিদ্রোহ করুন।

হুসেন প্রথম থেকেই ম্যাকমোহনকে স্বাধীন আরব রাজ্যের সীমানা নির্দিষ্ট করে দিতে লিখছিলেন। ম্যাকমোহন তাতে সহজে সম্মত হচ্ছিলেন না। তিনি জানালেন, যুদ্ধে জয়লাভ না করা পর্যন্ত কোন কিছু নির্দিষ্ট করা উচিতও নয়, বুদ্ধিমত্তার পরিচায়কও নয়। কিন্তু নাছোড়বান্দা হুসেন। শেষ পর্যন্ত ম্যাকমোহন হুসেনের নির্দিষ্ট আরব-রাজ্যের সীমানা মেনে নিতে বাধ্য হন—শুধু জানান যে বাগদাদে কিছু ব্রিটিশ সৈন্য রাখতে দিতে হবে এবং লেভাণ্ট প্রদেশের ওপর ফরাসীদের ক্ষমতা থাকবে।

হুসেন সম্মত হলেন।

ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সমগ্র আরবজাতি তুর্কীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। মধ্যপ্রাচ্যে তুর্কীর ক্ষমতা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। এমন সার্থক বিদ্রোহ, এমন অপূর্ব আত্মত্যাগ অনেকদিন দেখা যায় নি। তুর্কীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশের যুদ্ধে জয়লাভ এই আরব বিদ্রোহের জন্যই অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়েছিল।

কিন্তু ব্রিটিশ কূট রাজনীতির কাছে হুসেন অত্যন্ত শিশু।

হুসেনের সঙ্গে ব্রিটেন আরব-স্বাধীনতার চুক্তি স্বাক্ষর করার পরই ফ্রান্সের সঙ্গে একটি গোপন চুক্তি সম্পাদন করল। এই চুক্তির ফলে হুসেনের কাছে স্বীকৃত আরব-স্বাধীনতা একেবারে অসম্ভব। এই সাইকস্-পিকো চুক্তির ফলে স্থির হয় যে, সিরিয়া ও লেবানন ফ্রান্সের অধিকারে থাকবে এবং ব্রিটেনের অধীনে আসবে ইরাক ও জর্ডন। স্বতন্ত্র ইহুদি-রাষ্ট্রের আন্দোলনকারীদের (জিয়নিষ্ট) ব্রিটেন পরে এই আশ্বাস দেয় যে প্যালেষ্টাইনে একটি ইহুদি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে এবং প্যালেষ্টাইন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে থাকবে। এই চুক্তি স্বাক্ষরের সময় ব্রিটেন ফ্রান্সকে হুসেনের সঙ্গে চুক্তির কথা প্রকাশ করে নি এবং হুসেনকেও এই চুক্তির ব্যাপারটা জানায় নি।

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে আরবজাতি স্বাধীনতা লাভের আসায় উল্লসিত হয়ে উঠল। কিন্তু বিজয়ী ইউরোপীয় শক্তি তখন ব্রিটেন ও হুসেনের মধ্যেকার চুক্তি আমল না দিয়ে সাইকস্-পিকো চুক্তি ত্বরান্বিত করতে অগ্রসর হল।

সান রেমোতে শান্তি সম্মেলন বসল।

এই সম্মেলনে স্থির হল যে তখনকার সিরিয়াকে তিন অংশে ভাগ করা হবে—লেবানন, প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া। প্যালেষ্টাইন ব্রিটেনের ম্যাণ্ডেটে থাকবে। লেবানন থাকবে ফ্রান্সের অধীনে, সিরিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে কিন্তু ফ্রান্স তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

এই ব্যাপারে আরবরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল।

জেনেশুনে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। চুক্তি-পত্রে সই করে, আরব-রাজ্যসীমানা নির্দেশ করে, সমস্ত রকম আশ্বাস দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গেই এই ব্যবহার? তারা ইউরোপীয় নয়—এশীয়, এই জন্যই তাদের এই তাচ্ছিল্য।

হুসেনের পুত্র ফয়জল তখন দামাস্কাসে। ব্রিটেনের স্বাক্ষরিত চুক্তিমত স্বাধীন সিরিয়া রাজ্য ঘোষণার পর শাসন-ক্ষমতা নেবার জন্য প্রস্তুত। শান্তি সম্মেলন সিরিয়াকে ত্রিধা করে বিশাল সিরিয়া রাজ্যের মাত্র ছোট্ট এক টুকরোকে সিরিয়া নাম দিয়ে স্বাধীনতা দিয়েছিল। মনোক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন ফয়জল, কিন্তু কিছু বলেন নি। ছোট্ট সিরিয়ারই রাজা হবেন তিনি।

শান্তি সম্মেলনের নির্দেশ অনুযায়ী সিরিয়াকে স্বাধীনতা দিতে ফ্রান্স বাধ্য ; কিন্তু ফ্রান্স স্বাধীন সিরিয়া রাজ্যকে সুনজরে দেখতে পারে নি। সিরিয়া স্বাধীন থাকলে ফ্রান্সের অধীনস্থ লেবানন স্বাধীন হতে চাইবে। ফ্রান্স মনে করল, ব্রিটিশ চক্রান্তের ফলেই সমগ্র সিরিয়াকে তারা হস্তগত করতে সক্ষম হল না।

সিরিয়াকে কবলস্থ করা চাই-ই। ফ্রান্স সুযোগের অপেক্ষায় রইল। লেবাননের ফরাসীরা গোলমাল শুরু করায় তাদের সঙ্গে ফয়জলের বিরোধ বাধল। ফ্রান্স সঙ্গে সঙ্গে ফয়জলকে অত্যন্ত অপমানজনক এক চরম-পত্র দিল। এই ভীতি-প্রদর্শনের অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ফ্রান্সের ইচ্ছা কারুরই অজানা নেই—একটা ছুতো করে সিরিয়া গ্রাস। কিন্তু ফয়জল তখন সিরিয়াকে আগ্রাসী ফ্রান্সের হাত থেকে যে-কোন উপায়ে রক্ষা করতে চান। তিনি সেই অপমানকর চরমপত্র স্বীকার করে নিলেন।

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। ফ্রান্স তাতেও সন্তুষ্ট হল না, সিরিয়া আক্রমণ করল। আরব জাতীয় বাহিনী বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম চালাল, কিন্তু দেশকে রক্ষা করতে পারল না। সিরিয়া ফ্রান্সের পদানত হল।

ফয়জল সিরিয়া ত্যাগ করলেন।

আরব অসন্তোষ আর এক দেশেও ধূমায়িত হচ্ছিল এবং অল্প দিনের মধ্যেই বিদ্রোহের আকারে তার বিস্ফোরণ হল।

সে দেশ ইরাক।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইঙ্গ-ফরাসী যৌথ ঘোষণায় আরব জাতির স্বাধীনতার কথা স্বীকৃত হয়েছিল। এই ঘোষণায় জাগ্রত হয়ে উঠল ইরাকী জাতীয়তাবাদ। সিরিয়ায় তখন রাজ-সিংহাসনে বসেছেন ফয়জল। সিরিয়া থেকে দলে দলে জাতীয়তাবাদী আরব ইরাকে এসে উপস্থিত হল।

ব্রিটেনের তখন ত্রিশঙ্কুর অবস্থা।

ইঙ্গ-ফরাসী ঘোষণা অনুযায়ী ইরাককে তারা স্বাধীনতা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিন্তু বাদ সেধেছে ভারত-শাসক ব্রিটিশ সরকার। ইরাককে স্বাধীনতা দিলে ভারতকেও স্বাধীনতা দিতে হয়, কিন্তু তারা ভারতকে স্বাধীনতা দেবে না।

ইরাকে অবস্থিত ব্রিটিশ উপদেষ্টা পরিষদও ভারত সরকারের মতানুযায়ী ইরাককে স্বাধীনতা দিতে রাজি নন। ইরাকে পুরোপুরি ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের কথাই তাঁরা সুপারিশ করলেন।

শ্যামও রাখি এবং কুলও রাখি—এই করতে গিয়ে ব্রিটেন ইরাকে যে শাসন প্রবর্তন করল তাতে ইরাকীরা হয়ে উঠল অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। জাতীয়তাবাদী ইরাকীদের এই বিক্ষোভে ইন্ধন জোগাল রুশ বলশেভিকরা। তুর্কীরাও এগিয়ে এল। সিরিয়ার অল-আহদ দলের নেতারা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে আহ্বান জানাল এবং দামাস্কাসে তারা রাজা ফয়জলের ভাই আবদাল্লাকে ইরাকের রাজা বলে ঘোষণা করল।

সান রেমো শান্তি সম্মেলন ইরাককে ব্রিটিশের শাসনাধীন রাজ্য বলে মেনে নিল। সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষুব্ধ ইরাক ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

তিন মাস ধরে চলল সমানে লড়াই। দুই দলে প্রচুর ক্ষতি হল। শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন ইরাক সম্বন্ধে তাঁদের নীতি পরিবর্তন করতে স্বীকৃত হল।

কায়রো সম্মেলন, ১৯২০ খৃষ্টাব্দ।

ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক সচিব উইনস্টন চার্চিল ইরাক সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের পুনর্নির্ধারিত নীতি ঘোষণা করলেন। ইরাকে সংবিধান-সম্মত একটি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। শাসন করবে নির্বাচিত বিধান সভার সহায়তায় এক সম্পূর্ণ ইরাকী মন্ত্রীসভা। এই মন্ত্রীসভাকে সাহায্য করার জন্য এক ব্রিটিশ উপদেষ্টা থাকবেন এবং ব্রিটিশ হাই-কমিশনরের হাতে সামান্য ক্ষমতা থাকবে। সান রেমোর শান্তি সম্মেলন যদিও ব্রিটেনকে ইরাকের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছে, কিন্তু ব্রিটেন সেই ম্যাণ্ডেট প্রয়োগ করবে না। তারা ইরাকের বন্ধু হয়ে থাকতে চায়।

বিদ্রোহের সময় দামাস্কাসে ঘোষিত আবদাল্লা ইরাকের রাজা হলেন না। রাজা হলেন তাঁরই ভাই সিরিয়া-বিতাড়িত ফয়জল।

কিন্তু শাসনকার্য চালাতে গিয়ে দেখা গেল মন্ত্রীদের হাতে ক্ষমতা নেই, ব্রিটিশ উপদেষ্টা সব ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন। রাজা সে দেশের কেউ নয়, সর্বপ্রধান ব্রিটিশ হাই কমিশনর।

এ রকমের স্বাধীনতা ইরাক চায় নি। রাজা ফয়জলকেও তারা তাঁর গৌণ অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তাদের চাপে পড়ে ফয়জলও ব্রিটিশ প্রভুত্ব মেনে নিতে আপত্তি জানালেন; কিন্তু ব্রিটিশের হুমকিতে তিনি নতি স্বীকার করলেন।

এর পর থেকে আর ফয়জলের সঙ্গে ব্রিটেনের সদ্ভাব বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নি। ব্রিটেন নিজের হাতে পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা দপ্তর রেখে আর সব ক্ষমতা রাজার হাতে ছেড়ে দিল। ফয়জলের বিচক্ষণতায় ইরাক দ্রুত উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে লাগল, কিন্তু ইরাক পূর্ণ স্বাধীনতালাভ করার পূর্বেই ফয়জল মারা গেলেন।

সুরু হল ইরাকী শাসনে অরাজকতা। ফয়জলের পুত্র মোটর দুর্ঘটনায় গতায়ু। তার শিশু-পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে কাকা রিজেণ্ট হয়ে শাসন-কার্য পরিচালনা করছেন। কিন্তু ১৯৪১ সনের মধ্যে মাত্র পাঁচ বছরেই সাত বার সামরিক অভ্যুত্থান এবং প্রত্যেকটি অভ্যুত্থানের নেতার

শাসন-ক্ষমতা অধিকার ইরাককে এক ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় নিক্ষেপ করল।

এমন সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিল।

প্যালেষ্টাইনে ইহুদি-রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেওয়ায় ইরাক ব্রিটিশের ওপর বোধহয় সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হয়েছিল। এই যুদ্ধে ব্রিটিশের পরাজয়ই তাই তারা মনে মনে কামনা করতে লাগল।

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ইরাকের এই আক্রোশে ইন্ধন যোগাতে বাগদাদে উপস্থিত হলেন জেরুজালেমের মুফতি হাজি আমিন অল-হুসেনি। যুদ্ধের আগে ব্রিটিশ তাঁকে প্যালেষ্টাইন ত্যাগ করতে বাধ্য করে। তিনি লেবাননে ফরাসী আশ্রয়ে ছিলেন। যুদ্ধ বাধার পর ফ্রান্সও তাঁকে আর লেবাননে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে। জার্মান-ভক্ত মুফতি ইরাককে জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করাতে বাগদাদে এসে উপস্থিত হলেন।

ইরাকের রিজেণ্ট মুফতির কথায় কর্ণপাত করলেন না। শিশু-রাজার অভিভাবক তিনি, এই রাজ্যকে তিনি অযথা যুদ্ধবিগ্রহে নিয়ে যেতে সম্মত হলেন না। মুফতি তখন তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে লাগলেন রাজনীতিক এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যে। রাজনীতিক রসিদ আলি অল-গয়লানি মুফতির প্রভাবে পড়লেন।

ইরাকী সেনাবাহিনীর চার কর্ণেল রসিদ আলির সঙ্গে মিলে আর এক সামরিক অভ্যুত্থানের বলে দেশের শাসন-ক্ষমতা অধিকার করল। এই শাসক-গোষ্ঠি জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত করল। রিজেণ্টকে বন্দী করার পূর্বেই রিজেণ্ট, শিশু-রাজা, ইরাকের সুপরিচিত রাজনীতিবিদ নুরি এল-সৈয়দ প্রভৃতি কয়েকজন গোপনে বাগদাদ ছাড়লেন এবং ব্রিটিশের সাহায্যে দেশত্যাগ করে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হলেন।

চার কর্ণেলের বিদ্রোহ গোল্ডেন স্কোয়্যার বিদ্রোহ নামে খ্যাত। এই নতুন সামরিক শাসক-গোষ্ঠি ভেবেছিল যে জার্মানীর পক্ষে ব্রিটেনের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে সঙ্গে সঙ্গেই জার্মান সৈন্যবাহিনী তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। ইরাকের এই বিদ্রোহী সামরিক কর্তৃপক্ষ মুফতির পরামর্শমত ব্রিটিশ বাহিনী আক্রমণ করে বসল। কিন্তু জার্মানী এই বিদ্রোহ এবং তাদের পক্ষে ইরাকের যুদ্ধ ঘোষণাকে অভিনন্দিত করলেও সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে সাহায্য করল না। ফলে এই বিদ্রোহী ইরাক বাহিনী ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে ভীষণভাবে পরাজিত হল। মুফতি এবং গোল্ডেন স্কোয়্যারের চার কর্ণেল ব্রিটিশের বাগদাদে প্রবেশ করার আগেই ইরাক ছেড়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। বিদ্রোহী সামরিক নেতাদের পলায়নের পর আবার ইরাকের রিজেণ্ট শিশু-রাজাকে নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। অন্যান্য জন-নায়কেরাও ইরাকে ফিরলেন। দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনাতে ব্রিটিশ রিজেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করল। প্রতিদানে ১৯৪৩ সনে ইরাক জার্মান-ইটালি অক্ষ-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল, কিন্তু ব্রিটিশের সামরিক ঘাঁটি রয়ে গেল ইরাকে। নামে ইরাক স্বাধীন, কিন্তু ব্রিটিশ-অধিকারের চিহ্ন তখনও সুপরিস্ফুট। ব্রিটিশকে ইরাকের ভূমি থেকে একেবারে দূর করে না দেওয়া পর্যন্ত ইরাকীরা নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। ব্রিটিশের কূটনীতিকে তারা মনে মনে ভয় করে।

১৯৪৭ সনে ইরাকী কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করল, যেন ১৯৩০ সনে সম্পাদিত ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তি পুনর্বিবেচনা করে দেখা হয়। ব্রিটিশ সরকারের আমন্ত্রণে নতুন চুক্তি সম্পাদনে ইরাকের প্রধান মন্ত্রী নুরি এল-সৈয়দ ব্রিটেনে গেলেন। পোর্টসমাউথে ব্রিটেন ও ইরাকের এক বৈঠক বসে। ব্রিটেনের পক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রী আর্নেষ্ট বেভিন, ইরাকের পক্ষে প্রধান মন্ত্রী নুরি পাশা এল-সৈয়দ। ব্রিটেন-ইরাকের মধ্যে এক নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। স্থির হল ইরাকে অবস্থিত ব্রিটেনের দুটি সামরিক ঘাঁটিই ব্রিটেন ইরাকের হাতে ফিরিয়ে দেবে। ব্রিটিশ সামান্য-সংখ্যক সৈন্য নিজেদের ব্যয়ে রাখতে পারবে, তবে এই সৈন্যদল ইরাকী

পারচালনাধীনে থাকবে এবং শুধুমাত্র যুদ্ধ বাধলেই ব্রিটিশ তাদের সামরিক ঘাঁটি দুটি পুনর্দখল করতে পারবে।

সরকারী মহল মনে করল যে এটি একটি সম্মানজনক চুক্তি, কিন্তু *বিরুদ্ধ দল ব্রিটিশের সমস্ত চিহ্ন মুছে দিতে আগ্রহী। সুতরাং এই চুক্তির সর্ত যখন ইরাকে প্রকাশিত হল তখন বিরুদ্ধ দল এই চুক্তির* বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-আন্দোলন সুরু করল। নিরুপায় ইরাকী সরকার বাধ্য হয়ে এই চুক্তি নাকচ করে দিল।

১৯৫৫ সনে ইরাক তুর্কীর সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করল। ব্রিটিশ এই চুক্তিতে সম্মতি দেওয়ায় আপনা থেকেই ব্রিটিশের সঙ্গে ইরাকের সম্পাদিত ১৯৩০ সনের চুক্তি বাতিল হয়ে গেল। ব্রিটিশ বাহিনী ইরাকী ভূমি ত্যাগ করল।

যুদ্ধ শেষে ফ্রান্স সিরিয়া ও লেবাননে এল অতিমাত্রায় আত্মতৃপ্তি ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে। স্বাক্ষরিত স্বাধীন সিরিয়া তারা তাদের কূটচালে খতম করেছে, সিরিয়ার আরব-বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করেছে, রাজা ফয়জল পলায়িত। সিরিয়া সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

লেবানন সম্বন্ধে ফ্রান্সের কোনদিনই চিন্তা ছিল না। ফরাসী মিশনারীরাই লেবাননের অধিবাসীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে, তাদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়ে শিক্ষিত জনসমাজের মধ্যে ফরাসী-প্রীতি এবং ফরাসী-প্রভাব বহুদিন আগে থেকেই ছড়িয়ে দিয়েছে।

লেবাননে আরব জাতীয়তাবাদের যে খৃষ্টানরা জনক এবং সক্রিয় অংশীদার ছিল, তারা স্বাধীন আরব-রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমান ধর্মাবলম্বী-আরবদের সঙ্গে একত্র হয়ে সংগ্রাম করা সত্বেও স্বাধীনতা-লাভের মুখোমুখি দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল। স্বাধীন আরব-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তারা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ হয়ে পড়বে এবং ঐশ্লামিক জিগির ধ্বনিত হলে সেই আরব-রাষ্ট্রে তাদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হয়ে উঠবে। ধনে, প্রাণে বাঁচলেও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক কিংবা সমস্ত অধিকার খুইয়ে

পরাধীন জাতির মত বাস করতে হবে।—এই হল তাদের ভয়।
এই জন্য সিরিয়াকে যখন ভাগ করে খৃষ্টান-অধ্যুষিত লেবাননকে পৃথক একটি রাজ্য করা হল তখন তারা অখুশি তো হয়ই নি, বরং ফ্রান্সকে তারা লেবাননে স্বাগত জানাল।

লেবানন ও সিরিয়া অধিকার করে ফ্রান্স প্রথমেই স্থির করল যে আরব জাতীয়তাবাদ চিরকালের জন্য ধ্বংস করতে হবে। তারা জানে যে খৃষ্টান-অধ্যুষিত লেবাননের সাহায্য এবং সৌহার্দ তারা সব সময়েই পাবে।

লেবাননকে ফরাসী-প্রীতির জন্য পুরস্কৃত করতে এবং আরব সংহতি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স প্রথমেই সিরিয়ার কিছু অংশ লেবাননের সঙ্গে যুক্ত করে লেবাননের আয়তন বৃদ্ধি করল। লেবানন যেমন খুশি হল, সিরিয়া সেইরকম বিক্ষুব্ধ হল। কিন্তু সিরিয়ার কপালে আরও অনেক দুঃখ লেখা ছিল। ফরাসী শয়তানির কতটুকুই বা তারা দেখেছে? এবার সিরিয়াকে চারটি পৃথক শাসন-অঞ্চলে ভাগ করল ফ্রান্স, চারটি অঞ্চলে চার রকম শাসন-ব্যবস্থা। আর এই চার অঞ্চলের মধ্যে যাতে কোন রকম সদ্ভাব না থাকতে পারে তার জন্য ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এক একটি সম্প্রদায়ের অধ্যুষিত বাসভূমি নিয়ে গঠিত হল এক একটি অঞ্চল। এর চেয়ে ঘৃণ্য 'divide and rule' নীতি আর সিরিয়াতে কোনদিন প্রচলিত হয় নি। নানা কূটচালে প্রতি মুহূর্তেই সংখ্যালঘুদের মনে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ত্রাসের উদ্রেক করার প্রচেষ্টায় ফ্রান্স ছিল সব সময়ে সচেষ্ট।

সিরিয়ার জাতীয়তাবাদীরা কিন্তু ফরাসী চালে ভুল করে নি। ফ্রান্সের এই জঘন্য মনোবৃত্তিতে সমস্ত সিরিয়াবাসী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ বাড়া দূরে থাকুক, তাদের মধ্যে বরং সম্প্রীতি বৃদ্ধি পেল। ফরাসীদের সিরিয়া থেকে না দূর করতে পারলে তাদের পরিত্রাণ নেই—একথা তারা স্পষ্ট বুঝতে পারল।
সিরিয়ার একটি অঞ্চল জেবেল দ্রুস। ১৯২৫ সনে এই জেবেল দ্রুস

ফরাসীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সমস্ত সিরিয়াবাসী ফরাসীদের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতী কাজে লিপ্ত হল। জেবেল দ্রুসের কাছে ফরাসী সেনাবাহিনী পরাজিত হল। জেবেল দ্রুসের সেনাবাহিনী দামাস্কাসকে ফরাসী-মুক্ত করার জন্য সসৈন্যে দামাস্কাসের দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে এল, ফরাসীরা তাদের কোন রকমে বাধা দিতে পারল না।

পরাজিত ফ্রান্স তখন আত্মসম্মান রক্ষা এবং সিরিয়াবাসীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য বোমাবর্ষণ করতে সুরু করল। যত না বোমা পড়ল জেবেল দ্রুসের সৈন্যবাহিনীর ওপর, তার চেয়েও বেশি পড়ল নিরীহ দেশবাসীর বাসস্থানের ওপর—যাতে ভবিষ্যতে আর তারা বিদ্রোহ করতে সাহসী না হয়।

জেবেল দ্রুসের বিদ্রোহ শেষ হল, কিন্তু সুরু হল সমগ্র সিরিয়ায় ফরাসী-বিরোধী বিক্ষোভ। সিরিয়ায় ফরাসী শাসন প্রায় অচল, ফরাসী জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন। ফ্রান্স এখন সিরিয়া ত্যাগ করে চলে যেতে পারলেই বাঁচে।

আরব জাতীয়তাবাদের কাছে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হল ফ্রান্স।

লেবানন ও সিরিয়াকে দুটি পৃথক প্রজাতন্ত্র রাজ্য বলে তাদের ঘোষণা করতে হল। সিরিয়ার চারটি পৃথক অঞ্চল আবার একত্রিত হয়ে একটি রাষ্ট্রে পরিণত হল। কিন্তু আরব-রাষ্ট্র ত্যাগ করার সময়েও বিদায়-পদাঘাত করার লোভ সামলাতে পারল না। ব্রিটেনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তুর্কীকে কনষ্ট্যান্টিনোপল দান করে গেল।

প্রধানমন্ত্রী মঁসিয়ে ব্লামের ফরাসী মন্ত্রীসভা স্থির করল যে লেবানন ও সিরিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। ফ্রান্স এই দুটি দেশের সঙ্গে দুটি পৃথক চুক্তি স্বাক্ষর করতে সম্মত হল। সিরিয়ার সঙ্গে চুক্তিতে স্থির হল যে সিরিয়া মাত্র দুটি অঞ্চলে শুধু পাঁচ বছরের জন্য ফ্রান্সকে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখতে দেবে। লেবাননের সঙ্গে চুক্তিতে লেবানন ফ্রান্সকে তাদের দেশে ফ্রান্সের যেখানে খুশি যত ইচ্ছা সৈন্য

রাখার অধিকার দিতে সম্মত হল।

কিন্তু এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগেই ফ্রান্সে মঁ ব্লামের মন্ত্রীসভার পতন হল। কোন চুক্তিই আর স্বাক্ষরিত হতে পারল না।

এরই মধ্যে লেবাননে ধীরে ধীরে আর এক জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠতে সুরু করেছে। খৃষ্টান জন-সাধারণের অধিকাংশই ইসলাম ধর্ম ও ঐতিহ্যের আধিপত্যের ভয়ে ফরাসী কর্তৃত্ব মেনে নিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল; কিন্তু খৃষ্টান বুদ্ধিজীবিসম্প্রদায় ফরাসী আধিপত্যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিনাশের সম্ভাবনা দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হলেন যে লেবাননের খৃষ্টানেরা যেহেতু আরবজাতিরই এক ভগ্নাংশ, ঐশ্লামিক আরব-জগৎকে বাদ দিয়ে তাদের বাঁচা অসম্ভব। সুতরাং তারা লেবাননের অধিবাসী মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাত মেলালেন এই সর্তে যে লেবাননের খৃষ্টান ও মুসলমান সকলেই একত্র হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করবে; ফ্রান্সকে খৃষ্টান সম্প্রদায় আহ্বান জানাবে না, পরিবর্তে মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের লেবাননের ঐতিহ্যবাহী হয়ে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকতে হবে এবং লেবাননকে সিরিয়ার সঙ্গে একত্র করার জন্য কোন-রকম আন্দোলন করতে পারবে না।

লেবাননের খৃষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস ও প্রীতি পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হল। একযোগে সংগ্রামের জন্য তারা প্রস্তুত হল।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল।

তখনও পর্যন্ত ফ্রান্স ১৯৩৬ সনের নির্ধারিত চুক্তি লেবানন ও সিরিয়ার সঙ্গে সম্পাদিত করে নি। তার ওপর যুদ্ধ বাধবার কিছু আগেই ফরাসীরা সিরিয়ার সংবিধান রদ করে এবং ফরাসী রাষ্ট্রদূতের হাতে সমস্ত শাসন-ক্ষমতা তুলে দেয়। সিরিয়াকে আবার ভেঙে পৃথক শাসন-অঞ্চলে পরিণত করা হল। যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গেই লেবাননের সংবি-ধানও রদ হল। ফরাসীরা লেবাননের শাসনও নিজের হাতে তুলে নিল।

১৯৪০ সালে জার্মানির কাছে ফ্রান্স পরাজিত হল। সমগ্র ফ্রান্স জার্মানির পদানত। জার্মান-খবরদারিতে ভিসি সরকার ফ্রান্সে তাঁবেদার-রাজত্ব চালাচ্ছে। সিরিয়া ও লেবাননে ফ্রান্সের অধিকার বিপন্ন হয়ে উঠল। ভিসি সরকার অবশ্য এই দুই দেশকে কঠোর হাতে নিজের অধীনে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল—কিন্তু তাদের পায়ের তলার মাটিই সরে গিয়েছে, তারা দাঁড়াবে কোথায় ? তাদের নিজেদের দেশ আজ পরাজিত, শত্রুর কবলে নিষ্পেষিত—সুতরাং এই দুই অধিকৃত দেশের ওপর তাদের এই ঠুনকো অধিকার যে বেশিদিন স্থায়ী হবে না তারাও যেমন বুঝতে পেরেছিল, লেবানন ও সিরিয়ার অধিবাসীরাও ঠিক সেইরকম বুঝতে পেরেছিল। সিরিয়া ও লেবানন নীরবে প্রতীক্ষা করতে লাগল সেই শুভ মুহূর্তের।

সেই দিন এল ১৯৪১ সনে। জেনারেল দ্য গল ইংল্যাণ্ডে স্বাধীন ফরাসী সরকার প্রতিষ্ঠা করে জার্মানি ও জার্মান-তাঁবেদার ফ্রান্সের ভিসি সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ব্রিটিশ ও জেনারল দ্য গলের বাহিনী একত্র হয়ে লেবানন ও সিরিয়াতে অবস্থিত ভিসি সরকারের ফরাসীবাহিনীকে আক্রমণ করল। দ্য গলের স্বাধীন ফরাসী সরকারের নামে এই সেনাবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল কাত্রু ঘোষণা করলেন যে তাদের সরকার সিরিয়া ও লেবাননকে দুটি পৃথক স্বাধীন রাজ্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের স্বাধীনতা মেনে নিয়ে ফ্রান্স তাদের সঙ্গে পৃথক চুক্তি স্বাক্ষর করতে চায়। ব্রিটেনও এই চুক্তিতে সাগ্রহে স্বাক্ষর দিল।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ঠিকই, কিন্তু দেশবাসীর মনে উল্লাস দেখা গেল না। কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজি—এই ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই ভাল করে চিনে নিয়েছে। তখনও তারা এই দুই দেশকে স্বাধীনতা দিতে স্বীকৃত হয়ে পরে চুক্তি ভঙ্গ করতে এতটুকু দ্বিধান্বিত বা লজ্জিত হয় নি। সে কথা এই দুই দেশ সহজে ভুলতে পারে না।

সুতরাং এই দুই দেশ দাবী জানাল—যদি তারা সত্য সত্যই স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পেয়ে থাকে তবে তাদের দেশে নির্বাচন হোক এবং সংবিধান-সম্মত শাসন প্রবর্তন হোক। দুই দেশে এই নিয়ে প্রবল আন্দোলন সুরু হল। ফ্রান্স এই আন্দোলন দমন করতে চাইল, কিন্তু ব্রিটেন তখন এই যুদ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে জয় চায়—কোনরকম গোলমালে সেই আশা যে বাধাপ্রাপ্ত হয় তারা তা চায় না। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের চাপে দ্য গল সম্মত হলেন।

দুই দেশেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। পার্লামেণ্ট বসামাত্র দুই দেশই তাদের স্বাধীনতার অন্তরায় যে-সব আইন ছিল তা বাতিল করতে সুরু করল। সিরিয়া ও লেবাননের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই যে, আজ দুর্বল বলে ফ্রান্স তাদের স্বাধীনতা দিতে স্বীকৃত হয়েছে; কিন্তু যুদ্ধ শেষে ফ্রান্স আবার শক্তি সঞ্চয় করতে পারলেই আবার এই দুই দেশ গ্রাস করবে, তাদের আর স্বাধীনতা দেবে না। সুতরাং ফ্রান্স দুর্বল থাকার সময়েই এবং ব্রিটিশ সৈন্য এই দেশে থাকার সময়েই তারা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করে নিতে বদ্ধপরিকর হল।

লেবাননই প্রথমে ফ্রান্সের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করল। ফ্রান্স সঙ্গে সঙ্গে লেবাননের প্রেসিডেণ্ট ও মন্ত্রীমণ্ডলীকে বন্দী করল এবং পার্লামেণ্ট ভেঙে দিয়ে স্বাধীনতা-আইন নাকচ করে দিল। লেবাননের সমস্ত অধিবাসী—মুসলমান ও খৃষ্টান—এক হয়ে দাঁড়াল ফ্রান্সের এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে। দুইজন মন্ত্রী ফরাসী কারাগার থেকে পালিয়ে গুপ্ত স্থান থেকে স্বাধীন লেবানন সরকারের নামে আদেশ জারি করতে লাগলেন। সমস্ত লেবাননে ধর্মঘট। লেবাননের স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত।

সমস্ত আরব রাষ্ট্র—বিশেষ করে মিশর এগিয়ে এল সিরিয়া ও লেবাননের সাহায্যে। মিশরের প্রধান মন্ত্রী নাহাশ পাশা সমস্ত স্বাধীন আরব রাষ্ট্রকে একত্রিত করে একটা 'আরব লীগ' গঠনে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন। সিরিয়া ও লেবানন স্বাধীন না হলে এই

লীগে তারা যোগ দিতে পারবে না। সুতরাং নাহাশ পাশা তাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নিজে অগ্রসর হয়ে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রকেও যোগ দিতে আহ্বান জানালেন।

এই যুদ্ধের মধ্যে হঠাৎ আরব-বিরোধিতা ব্রিটিশ কোনমতে চায় না। আরব বিরোধিতায় উত্তর আফ্রিকা ও মধ্য-প্রাচ্যে তাদের জয়লাভ কষ্টকর হয়ে পড়বে এবং জার্মানি ও ইটালির অনেক সুবিধা হবে। এবারও ব্রিটেন ফ্রান্সের ওপর চাপ দিল। ফ্রান্স লেবাননের প্রেসিডেণ্ট ও মন্ত্রীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হল এবং লেবানন ও সিরিয়ার এক তরফা স্বাধীনতা ঘোষণা মেনে নিল।

কিন্তু মাত্র কিছু দিনের জন্য।

১৯৪৫ সন। ইউরোপে যুদ্ধ থেমেছে। দ্য গল কায়েম হয়ে ফ্রান্সে বসেছেন। এবার তিনি ঘোষণা করলেন যে, লেবানন ও সিরিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হোক বা না হোক—ফরাসী সৈন্য ওই দুই দেশে থাকবেই। লেবানন ও সিরিয়া আপত্তি জানাল। দ্য গল সে আপত্তিতে কর্ণপাত করলেন না। কয়েক জাহাজ বোঝাই করে তিনি ফরাসী সৈন্য পাঠালেন। দুই দেশই প্রবলভাবে বাধা দিল। দেশের লোকেরা দাঙ্গা বাধাল। ফরাসীরা আবার দামাস্কাসে বোমাবর্ষণ করল।

যুদ্ধ তখনও শেষ হয় নি। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে। ব্রিটিশ এই খণ্ডযুদ্ধে বাধা দিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে লেবানন ও সিরিয়া দাবী জানাল যে তাদের দেশ থেকে সমস্ত ফরাসী ও ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ করতে হবে। অধিকাংশ রাষ্ট্রের ভোটে এই দাবী গৃহীত হল। এক বছরের মধ্যে এই দুই দেশ থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য চলে গেল।

সিরিয়া ও লেবানন পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করল।

এই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই মধ্য-প্রাচ্যে আরও দুটি নতুন আরব-রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

সৌদি আরব ও জর্ডন।

সোদি আরব রাজ্যটি আবদুল আজিজ ইবন সৌদের একক সৃষ্টি। আরব পেনিনস্যুলার অন্তর্গত নেজদ-এর অধিপতি। ব্রিটিশের সামন্তরাজ।

১৯১৪ সনে বিশ্বযুদ্ধের সময় ইরাকের আরব জাতীয়তাবাদীরা এবং ব্রিটেন সৌদের কাছে তুর্কীর বিরুদ্ধে আরব-বিদ্রোহে যোগদানের জন্য সাহায্য চেয়েছিলেন ; কিন্তু নৈতিক সমর্থন ছাড়া আর বিশেষ কিছুই তিনি করতে পারেন নি।

তার কারণ ছিল। দুই দিকে তাঁর দুই শত্রু। দুই শত্রুই তাঁকে নিশ্চিহ্ন করে তাঁর রাজত্ব অধিকার করার ষড়যন্ত্র করছে।

নেজদ-এর উত্তরে জেবেল সাম্মার। তার আমির ইবন রসিদ তাঁর চির-শত্রু এবং তুর্কীর মিত্র। ইবন রসিদের লোলুপ দৃষ্টি নেজদ-এর ওপর অনেক দিন থেকেই। তাঁর শক্তিও ইবন সৌদের সমান।

আর এক দিকে মক্কার শেরিফ হুসেন। হুসেনের সঙ্গে সৌদের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত। ইবন সৌদ মক্কা ও মদিনাকে পৌত্তলিক আরাধনার কেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই মনে করতেন না। হুসেন ইবন সৌদকে বলতেন বেদুইন উপজাতির সর্দার। হুসেনের দৃষ্টি তখন অনেক উঁচুতে, তিনি সমগ্র আরব রাজ্যের সম্রাট হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন এবং ব্রিটেনের সঙ্গে সেই সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করছেন।

এই সম্পর্ক অত্যন্ত চরমে উঠল যখন ১৯১৬ সনে হুসেন নিজেকে আরব-রাজ বলে ঘোষণা করলেন এবং ১৯২৪ সনে খালিফ উপাধি গ্রহণ করলেন।

১৯১৯ সনেই প্রথম সম্মুখ সংঘর্ষের সূত্রপাত। হুসেন ইবন সৌদকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর পুত্র আবদাল্লাকে সসৈন্যে পাঠালেন নেজদ আক্রমণ করতে, কিন্তু আবদাল্লা ইবন সৌদের হাতে ভীষণভাবে পরাজিত হলেন। এবার ইবন সৌদের পালা। তিনি হুসেনকে শিক্ষা

দেওয়ার জন্য সৈন্য নিয়ে হেজাজ আক্রমণ করতে চললেন। ব্রিটেন দোটানায় পড়ল। একদিকে ইবন সৌদ ব্রিটিশ সামন্তরাজ, অপর দিকে হুসেনের সাহায্যে তাঁরা তুর্কীর বিরুদ্ধে আরব-বিদ্রোহের চেষ্টা করছেন। নিরুপায় ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ করল এবং ইবন সৌদ মনের আক্রোশ মনে চেপে দেশে ফিরে গেলেন।

যুদ্ধ শেষ হল। তুর্কী পরাজিত। জেবেল সাম্মারের আমির ইবন রসিদের এখন আর সে ক্ষমতা নেই, তুর্কীর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশাও নেই। এই সুযোগ নিলেন ইবন সৌদ। তিনি জেবেল সাম্মার আক্রমণ করে ইবন রসিদকে পরাজিত করে সাম্মারকে নেজদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

এদিকে হেজাজে হুসেনের পরিস্থিতিও খুব ভাল নয়। প্যালেষ্টাইন সমস্যা নিয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে হুসেনের মনান্তর সুরু হল। হজযাত্রা নিয়ে মিশরের সঙ্গে হুসেনের বিরোধ বাধল। নিজে থেকে আরব দেশের খালিফ উপাধি গ্রহণ করাতে সমস্ত আরব-রাজ্যই হুসেনের ওপর বিরক্ত।

হুসেন ইবন সৌদকে সিংহাসন-চ্যুত করার চক্রান্ত করতে সুরু করেন। সুতরাং ইবন সৌদ হেজাজ আক্রমণ করলেন। এবার আর ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ করতে চাইল না। এই যুদ্ধে হুসেন পরাজিত হয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। হেজাজও নেজদ-এর অন্তর্ভুক্ত হল।

নেজদ, সাম্মার ও হেজাজ—এই তিন রাজ্য নিয়েই গঠিত হল ইবন সৌদের নূতন রাজ্য—সৌদি আরব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি অনুযায়ী সিরিয়ার একটি অংশ ট্রান্স-জর্ডন ব্রিটিশের শাসনাধিকারে এসেছিল।

১৯২০ সনে ফরাসী জোর করে সিরিয়া দখল করে ফয়জলকে বিতাড়িত করলে সমস্ত আরব রাজ্যে বিক্ষোভ জেগে ওঠে। ব্রিটিশ সেই বিক্ষোভের আভাস পেয়ে ঘোষণা করেন যে তাঁরা ট্রান্স-জর্ডনকে

স্বায়ত্তশাসন দিতে সম্মত।

ঠিক এই সময় ফয়জলের ভাই আবদাল্লা এসে উপস্থিত হলেন ট্রান্স-জর্ডনে এবং আরব-অধিবাসীদের আহ্বান জানালেন একত্র হয়ে ফরাসীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে। ব্রিটিশ তাঁকে বাধা দিল বটে, কিন্তু মনে মনে বিপদ গণল। শেষ পর্যন্ত আবদাল্লাকে সেই দেশের রাজা বলে মেনে নিতে স্বীকৃত হল এই সর্তে যে তিনি ব্রিটিশের রক্ষণাবেক্ষণে রাজত্ব করবেন।

আবদাল্লা সম্মত হলেন।

প্রতিষ্ঠিত হল আরব রাজ্য জর্ডন।

৮

সকাল বেলাতেই হোটেলে এসে উপস্থিত হলেন মিসেস্ শেরমানি। আশ্চর্যই হয়ে গিয়েছিলাম ঠিক পরদিনই এত সকালে তাঁকে নিজে থেকে আমার হোটেলে এসে হাজির হতে দেখে। মনে পড়ে গেল টেলিফোনে তাঁর কথা : 'এর পর দেখা হলে কিন্তু আপনি খুব অবাক হবেন।'

তখন বুঝতে পারি নি তাঁর কথার মানে। হঠাৎ দেখা দিয়েই অবাক করা কি তাঁর সে কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল?

আমাকে অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি যেন একটু লজ্জিত বোধ করলেন। রুম-বয়কে নিজেই ইঙ্গিতে চলে যেতে বললেন। এবারে আমি যেন সম্বিত ফিরে পেলাম।

বললাম—কি আশ্চর্য! আপনি এখন, মিসেস শেরমানি?

মিষ্টি হেসে উঠলেন তিনি। চোখ নাচিয়ে বললেন—কেমন, আশ্চর্য করে দিয়েছি তো? কাল বলেছিলাম না যে আপনি আমাকে দেখে আশ্চর্য হবেন!

হাসলাম। বললাম—আপনার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হতেই হয়। শুধু আমি না—সকলেই হতে বাধ্য।

আবার হেসে উঠলেন মিসেস শেরমানি। বললেন—পিয়র এ্যাণ্ড সিম্পল্ ফ্ল্যাটারি, মিঃ সেন। কিন্তু আপনাকে আমি আর একবার আশ্চর্য করে দিতে পারি। দেখবেন?

আমি তাঁর দিকে তাকালাম। হঠাৎ তিনি খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর হাত জোড় করে ভাঙা ভাঙা বাঙলায় বললেন—ন-ম-স্কা-র।

এবার সত্যই আমার আশ্চর্য হবার পালা। চমকে উঠলাম।

বললাম—বাঃ! চমৎকার তো! বাঙলা শিখলেন কোথায়?

চেয়ারটা টেনে বসে পড়ে তিনি হেসে উঠলেন। বললেন—অবাক করে

দিয়েছি তো মিঃ সেন। কিন্তু আপনিও আমাকে অবাক করে দিয়েছেন! কেন—আপনি এখন বুঝতে পারবেন না, কিন্তু সত্যিই আপনিও আমাকে অবাক করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন করলাম—কি করে?

আমার দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়েই আবার মুখ নীচু করলেন।

বললেন—থাক, সে কথা পরে বলব।

বুঝে উঠতে পারলাম না, আমি মিসেস্ শেরমানিকে কি ভাবে অবাক করে দিয়েছি। সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ জেগে উঠল। ছলনাময়ী নারী বোধহয় এইভাবেই ধীরে ধীরে প্রলুব্ধ করে পুরুষকে তার জালে আবদ্ধ করে।

আমার আগের প্রশ্নে ফিরে এলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—বললেন না তো আপনি কোথায় বাঙলা শিখলেন?

উত্তর দিলেন—কোথায় আবার? আমার দেশে। আমার এক বন্ধু ছিলেন—অনেক দিন আগে—তাঁর কাছেই শিখেছিলাম দু-একটা বাঙলা কথা। দু-একটা মানে সত্যি সত্যিই দু-একটা। একটা বাঙলা গানও ভাঙা ভাঙা দু-এক লাইন শিখেছিলাম—

অবাক হলাম। বললাম— এখন আমেরিকায় বাঙালীর তো অভাব নেই। ভাল করে শিখতেও তো পারতেন। কোন বাঙলা গান শিখেছিলেন? শোনাতে আপত্তি আছে?

বললেন—তখনও ভাল জানতাম না। এখন বোধ হয় ভুলেই গেছি। আজকের কথা তো আর নয়। আমার বয়স তো আর কম নয়!

বোধহয় মিসেস্ শেরমানির একটা ঘোর আমার দেহ-মন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তাঁর কথার উত্তরে, মিথ্যা বলছি জেনেও, তাঁকে খুশি করার জন্য বলে ফেললাম—কত আর হবে? হার্ডলি থার্টি।

তিনি হেসে, চোখ ঘুরিয়ে, ভ্রূ নাচিয়ে যে কথা বললেন তার সরল অর্থ হয়েছে—তবে রে দুষ্টু ছেলে! আমার মন রাখবার চেষ্টা? মেয়েদের

সুড়সুড়ি দেবার বিদ্যেটা আয়ত্ত্ব করেছেন তো বেশ দেখছি।
বললাম—আপনাকে দেখে আমার যা মনে হল, তা-ই বলে ফেলেছি। বয়স যদি বেশি বলে থাকি, আমি অত্যন্ত দুঃখিত।
অসন্তুষ্ট হলেন না মোটেই, আমার দিকে তাকিয়ে বসে বসে পা নাচাতে লাগলেন।
এবার ভদ্রতার পর্বগুলো সারতে হয়। অতিথি সৎকার করা গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য। বললাম—চা, না কফি?
বললেন—কফি খাওয়ার জন্যই আপনার কাছে এসেছি। তবে কিছু না মনে করলে এখানে খেতে চাই না। চলুন না, মিঃ জাকারিয়ার কফি হাউসে। জায়গাটাও দেখে আসব, কফি খাওয়াও হবে এবং সেই সঙ্গে মিঃ জাকারিয়ার সঙ্গে আলাপও করতে পারব।
বললাম—চলুন, তাই ভাল। তবে ওঁর কাল এত বড় ক্ষতি হয়ে গেল, আজ ওঁর 'মুড' কেমন আছে কে জানে?
সইদার কথা বলছেন?—প্রশ্ন করলেন মিসেস্ শেরমানি।
মাথা নাড়লাম।
এর পর যেন আমাদের কথা হারিয়ে গেল। আমি বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম।

আবু সাহেব কফি হাউসে তাঁর নির্দিষ্ট জায়গাতেই বসেছিলেন।
কফি হাউসে ভিড় ছিল, তবে সেদিনের মত এত গোলমাল নেই। আবু সাহেবের মানসিক অবস্থার দিকটা চিন্তা করেই খদ্দেরদের এই স্ব-নিয়ন্ত্রণ। আবু সাহেবের ওপর এদের শ্রদ্ধা দেখে বেশ খুশিই হলাম।
মিসেস্ শেরমানিকে নিয়ে আবু সাহেবের কাছে গেলাম। দুজনের পরিচয় করিয়েও দিলাম। আবু সাহেব ব্যথিত দৃষ্টি তুলে তাকালেন মিসেস্ শেরমানির দিকে। চোখ দুটো যেন একবার স্থির হয়ে গেল, তারপর তিনি আবার চোখ নামিয়ে নিলেন।

মিসেস্ শেরমানি কিন্তু তাঁর দিকে সহজভাবে তাকিয়ে বলতে লাগলেন—আপনার কথা বন্ধুবান্ধবদের মুখে খুব শুনেছি। অনেকদিন ধরেই আলাপ করার ইচ্ছা ছিল, সুযোগ হয় নি। সইদা আমার স্কুলের ছাত্রী ছিল, তার কাছেও আপনার কথা শুনতাম। কিন্তু হঠাৎ যে সইদা—

মিসেস্ শেরমানি চুপ করে গেলেন।

একটু পরে আবার বললেন—কাল গিয়েছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু তখন আর আলাপ করা সম্ভব হয় নি।

আবু সাহেব বললেন—কাল ? থানায় ? আপনাকে দেখেছি বলে তো—

মিসেস্ শেরমানি আমার দিকে তাকালেন।

এবার আমি বললাম—উনি কাল আমাদের সঙ্গেই গিয়েছিলেন।

ওঃ—বলে চুপ করলেন আবু সাহেব।

হঠাৎ তিনি মিসেস্ শেরমানিকে বললেন—আপনাকে বড় চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় দেখেছি যেন !

মিসেস্ শেরমানি বললেন—আপনি আমেরিকায় ছিলেন কি ? ধরুন —ডেট্রয়েট, ইলিনয়েস—। কিংবা দামাস্কাস ? আমি বাবার সঙ্গে অনেকদিন দামাস্কাসে ছিলাম। সেখানেই মিঃ শেরমানির সঙ্গে আমার পরিচয়।

মিঃ শেরমানি এখন কোথায় ?—প্রশ্ন করলেন আবু।

মারা গেছেন—আস্তে উত্তর দিলেন মিসেস্ শেরমানি। —তারপরে আর আমেরিকায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করে নি। এখানেই একটা স্কুল খুলে কোন রকমে চালাচ্ছি।

মিসেস্ শেরমানি হঠাৎ বললেন—আপনার সম্বন্ধে আপনার ভক্তেরা তো এক একটা ইলিয়াড-অডিসি রচনা করে ফেলেছে, কিন্তু বোধহয় অধিকাংশই অতিরঞ্জিত। আপনার দেশ কোথায় ?—অবশ্য যদি বলতে আপত্তি না থাকে !

আবু বললেন—আপত্তি থাকবে কেন ? দেশ মিশরে।

মিশর! —বললেন মিসেস্ শেরমানি। —এখনও দেখি নি, তবে যাওয়ার বড় ইচ্ছা। ল্যাণ্ড অব প্যাগোডাজ্ এ্যাণ্ড মাম্মীজ্!

আমি বললাম—আর কয় দিন আগেই আমি কায়রো ঘুরে এসেছি।

হঠাৎ মিসেস্ শেরমানি বলে উঠলেন—আপনি তো ভাগ্যবান পুরুষ। আপনি তো জেরুজালেমও ঘুরে এসেছেন। সেদিন বলছিলেন—

আমি একেবারে চমকে উঠলাম। আমি যে জেরুজালেম কোনদিন গিয়েছি, সে কথা মিসেস্ শেরমানিকে আমি একেবারেই বলি নি। জেরুজালেমে আমি গিয়েছি—সে আজ প্রায় বাইশ বছর আগে।

অবাক হয়ে তাকালাম মিসেস্ শেরমানির দিকে।

আবু সাহেব তাকালেন আমার দিকে।

মিসেস্ শেরমানির দৃষ্টি আবু সাহেবের ওপর স্থির-নিবদ্ধ। একটু পরে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

মিসেস্ শেরমানি আমাকে বললেন—অবাক হচ্ছেন? সেদিন ডাটন যখন তেল আভিভে যায়, আপনি তখন ডাটনকে বলেন নি যে আপনি ১৯৪৫-এ জেরুজালেমে ছিলেন। মনে করে দেখুন। মেয়েদের আড়ি পাতা স্বভাব। আমি ঠিক শুনতে পেয়েছিলাম।

ঠিক মনে করে উঠতে পারলাম না। ককটেল পার্টিতে কি বলেছি না বলেছি মনে করা সম্ভবও নয়।

আবু সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি জেরুজালেমে গিয়েছিলেন? ১৯৪৫-এ?

উত্তর দিলাম—হ্যাঁ। মাত্র কয়েক দিনের জন্য। একটা সিনেমা তোলার কাজে—সাজ্ঘাতিক দিন ছিল তখন ওখানে। প্রাণ নিয়ে কোনরকমে পালিয়ে এসেছি।

মুখে হাসি ফুটে উঠল আবু সাহেবের। বললেন—আপনি ধন্য। তিন ধর্মের তীর্থস্থানে আপনি গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি বড় হতভাগ্য—ওখানে এখনও যাওয়া হয়ে উঠে নি। আর এখন যে রকম অবস্থা—হয়তো কোনদিন যাওয়াও হবে না।

মিসেস্ শেরমানির দিকে তাকিয়ে বললেন—মিসেস্ শেরমানি, আপনি আজ প্রথম এলেন আমার কফি হাউসে। আজ আপনি আমার অতিথি। আজ আপনারা যা খুশি যত খুশি এখানে খেতে পারেন, দাম দিতে হবে না।

আবু সাহেবের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা একটা টেবিল অধিকার করে বসলাম।

কফি নাড়তে নাড়তে আমি বললাম— দেখুন মিসেস্ শেরমানি, আমার নিজের যতদূর মনে পড়ছে সেদিন ডাটনকে আমি জেরুজালেমে যাওয়ার কথা বলি নি। ও ব্যাপারটা কোন একটা বিশেষ কারণে আমি কারুর সঙ্গেই আলোচনা করি না, তবু আপনি কি করে যে একথা জানলেন আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

মিসেস্ শেরমানি তাঁর সুন্দর চোখ দুটো তুলে আমার দিকে তাকালেন। বয়স হলেও সে চোখ দুটো আজও যে-কোন পুরুষের হৃদ্-চাঞ্চল্য এনে দিতে সক্ষম। অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন। আমি কেমন যেন এক অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

হঠাৎ বলে উঠলেন তিনি—বলেছিলাম না আপনি আমাকে দেখে অবাক হবেন। অবাক হওয়া এখনই শেষ হয়েছে নাকি? কিন্তু মিঃ সেন, আপনিও আমাকে কম অবাক করছেন না।

—কিসে? আমি আবার কি করলাম?

—আপনি বড় বোকা।

হেসে উঠলেন মিসেস্ শেরমানি।

বললাম—ওকথা যাক্। আবু সাহেবকে কেমন লাগল?

চমৎকার—বলে উঠলেন মিসেস্ শেরমানি। —যা ভেবেছিলাম তাই। অতি বুদ্ধিমান।

—প্রশংসা বলে তো মনে হচ্ছে না। পরিহাস করছেন না তো?

—পরিহাস করব আবু জাকারিয়াকে? আমি? না-না—আপনি ভুল

করছেন।
—আমি ভেবেছিলাম, আবু সাহেব হয়তো সইদার মৃত্যুতে ভেঙে পড়বেন।
কফির কাপটা নামিয়ে মিসেস্ শেরমানি বললেন— হয়তো উনি সইদার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন।
—মানে?
—মানে, তিনি হয়তো জানতেন যে সইদার একদিন অপঘাতে মৃত্যু হবে।
আমি মিসেস্ শেরমানির দিকে তাকালাম। তাঁর কথার অর্থ পরিস্কার হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিলাম না। তাঁর কথাবার্তার মধ্যে একটা হেঁয়ালি, আচরণে একটা রহস্য অনুভব করছিলাম।
মিসেস্ শেরমানি বললেন—সইদার মৃত্যু কি করে হয়েছিল জানেন?
মাথা নাড়লাম।
তিনি বললেন—সইদার নামে একটা পার্সেল আসে। সইদা তখন বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আবু সাহেব সে পার্সেলটা তাকে দেন। তার খুব তাড়াতাড়ি ছিল। সে পার্সেলটা হাতে করে নিয়ে বেরিয়ে যায়। ছোট্ট পার্সেল—হাত-ব্যাগেই রাখে। একজনের সঙ্গে তার দেখা করার কথা ছিল। তার আসতে দেরি দেখে সইদা সেই পার্সেলটা খোলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা দারুণ শব্দ করে ফেটে যায়। সেই বোমার আঘাতেই সইদা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।
বলে উঠলাম—কি সাঙ্ঘাতিক! পার্সেলের মধ্যে বোমা?
—ঠিক তাই। ঠিক এই ধরনের আর একটা গল্প শুনুন। নাসের প্রেসিডেন্ট হলে পর ক্রুনার নামে এক জার্মানকে মিশরে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়ে আসেন। ক্রুনারের শত্রুর অভাব ছিল না। ক্রুনার সরকারী কাজে গেলেন দামাস্কাসে। সেখানে তাঁর নামে এল একটা ছোট্ট পার্সেল। কায়রো থেকে সরকারী দপ্তর পাঠিয়েছে। তিনি তাঁর ঘরে বসে তাঁর সহকারীকে সেই পার্সেলটা খুলতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ।

সহকারীটি সেইখানেই মারা গেল, ক্রুনারের একটা চোখ শুধু নষ্ট হয়ে গেল।

বললাম—এ যে দেখছি শিনবেটদের কাণ্ডকারখানার মত।

—শিনবেটদের কথা জানেন?

—হ্যাঁ, দু-একদিন আগেই আলির কাছে শুনেছি।

মিসেস্ শেরমানি বললেন—ঠিকই শুনেছেন। সইদাকে শিনবেটরাই ঠিক এইভাবে হত্যা করেছে।

—কিন্তু কেন?

মিসেস্ শেরমানি বলতে লাগলেন—বছর পনের আগে সায়রা বলে একটি মেয়ে ছিল। থাকত বাপ-মায়ের সঙ্গে ইজরায়েলে। ইহুদি রাজত্ব—আরবদের সেখানে যে কি অবস্থা তা বর্ণনা করা যায় না। তবু মুখ গুঁজে সমস্ত অপমান নির্যাতন সহ্য করে অত্যন্ত কায়-ক্লেশে তারা দিন গুজরান করত।

একদিন সামান্য কারণে ইহুদি-অধিবাসীরা আরব-অধিবাসীদের ওপর ক্ষেপে উঠল। ইহুদিরা চড়াও হল আরব-পল্লীতে। আরবদের বাড়িতে বাড়িতে তারা আগুন লাগাতে সুরু করল। আরবরা অসহায় দর্শকের মত রাস্তায় বেরিয়ে এসে দেখতে লাগল—কিভাবে একে একে তাদের ঘরদোর, পোশাক-আসাক, জিনিষ-পত্র—সব কিছু ভস্মীভূত হয়ে যাচ্ছে।

ইহুদিরা এল সায়রাদের বাড়িতে আগুন দিতে। সায়রার বাবা বাধা দিলেন—তাঁর বাড়িতে তিনি আগুন দিতে দেবেন না। এত বড় সাহস সামান্য এক আরবের? ইহুদিদের এক গুলিতে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। সায়রার মা-ও ছুটে এসেছিলেন স্বামীকে ধরতে। আর এক গুলিতে তিনিও স্বামীর বুকের ওপর লুটিয়ে পড়লেন। দয়া করে সায়রাকে তারা হত্যা করল না। সায়রাকে বাইরে বের করে এনে তারা মহাসমারোহে সেই বাড়িতে আগুন লাগাল।

সায়রার বয়স তখন বছর সাতেক। সে কাঁদল না। চোখের ওপর

দেখল সে তার বাপ-মায়ের মৃত্যু। চলে যাওয়ার সময় একজন দয়া পরবশ হয়ে সেই ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে সায়রাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেল। তার নিজের কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। সায়রাকে নিয়ে সে তেল আভিভে চলে গেল। সায়রার নতুন নাম হল ইয়েলিণ্ডা।

ইয়েলিণ্ডা বড় হতে লাগল ইহুদি আশ্রয়ে ঠিক ইহুদির মতই। তার নতুন ইহুদি পিতামাতা তাকে নিজের মেয়ের মতই ভালবাসতেন, কিন্তু ইয়েলিণ্ডা কোনদিন ভুলতে পারে নি সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে সায়রার সেদিনকার সেই বীভৎস স্মৃতি। আরব-পিতামাতার ঋণ শোধ করবার শপথ মনে মনে নিয়ে সে বড় হতে লাগল।

ইয়েলিণ্ডা বড় হয়ে সরকারী চাকরি পেল। তার পূর্ব-পরিচয় সেখানে কেউ জানে না। তার ইহুদি-পিতামাতা সে কথা সযত্নে গোপন রেখেছিল। ইয়েলিণ্ডা বেশ ভাল আরবী ভাষাও বলতে পারে দেখে শিনবেট তাকে তাদের দলে নিল। ইয়েলিণ্ডাকে আরবী মেয়ে সাজিয়ে তারা তাদের কাজ হাসিল করতে পারবে।

ইয়েলিণ্ডাও এই কাজ পেয়ে যেন বেঁচে গেল। ধীরে ধীরে সে দলের প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠল। যে-কোন বিপজ্জনক কাজের ঝুঁকি সে নিতে প্রস্তুত।

এ বছরের এপ্রিল মাসে সিরিয়াতে ইহুদি আক্রমণের সময় হঠাৎ সিরিয়া জানতে পেরে যায় ইহুদি সৈন্যদের গুপ্তঘাঁটির ঠিকানা এবং তারা হঠাৎ আক্রমণ করে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়। সিনবেটের টনক নড়ল। ইতিপূর্বে আরো কয়েকটি গোপন সংবাদ জানাজানি হয়ে গেছে। এবারের ব্যাপারটা খুব মারাত্মক। গোপন তদন্ত করতে করতে তাদের সন্দেহ পড়ল ইয়েলিণ্ডার ওপর। ইয়েলিণ্ডা তখন শিনবেটের কাজের জন্য আছে বেইরুতে। নাম নিয়েছে সইদা। একটি কোম্পানিতে রিসেপসনিষ্টের কাজ করে। থাকে আবু জাকারিয়ার কাছে।

শিনবেটের অন্যান্য লোক নজর রাখল সইদার ওপর।

হঠাৎ একদিন নাসের ঘোষণা করলেন যে ইজরায়েল ব্যাপকভাবে

সিরিয়া ও ইরাক আক্রমণ করার দিন স্থির করেছে সতেরই মে।

ইজরায়েল সরকার চমকে উঠল। শিনবেট হাত কামড়াতে লাগল। এ সংবাদ নাসের জানলেন কেমন করে? কোথা থেকে এ খবর বের হল? এখন তাদের সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হতে বসেছে।

খোঁজ, খোঁজ। শিনবেটের আঙুল গিয়ে পড়ল আবার সইদার ওপর।

মিসেস্ শেরমানি চুপ করলেন।

একটু পরে বললেন—তারপরের খবর তো আপনার জানা আছে।

অবাক হয়ে শুনছিলাম তাঁর কথা। জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি এত কথা জানলেন কি করে?

তিনি উত্তর দিলেন—সইদা যে আমার স্কুলের ছাত্রী ছিল। ওর মুখ থেকেই শুনেছি।

আমরা দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম।

হঠাৎ মিসেস্ শেরমানি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার কি দুপুরবেলায় বিশেষ কোন কাজ আছে?

চমকে উঠে বললাম—না।

—তবে চলুন না আমার বাড়ি। দুপুরবেলায় আজ আমার ওখানেই খাওয়াদাওয়া করবেন। তাছাড়া আপনার সঙ্গে আমার ভয়ঙ্কর দরকারী কিছু কথা আছে।

মনে হল, একবার আপত্তি জানাই; কিন্তু কেন যেন কিছু বলতে পারলাম না। মিসেস্ শেরমানিকে যতই দেখতে লাগলাম ততই আশ্চর্য হচ্ছিলাম। আরো কত আশ্চর্য হতে পারি—তা দেখবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

বললাম—বেশ, চলুন।

তরল কণ্ঠে হেসে উঠলেন তিনি—চলুন, কিন্তু যদি আপনার স্ত্রী জানতে পারেন যে আপনি আমার পাল্লায় পড়েছেন?

হেসে বললাম—সে ভয় নেই। আমি বিয়েই করি নি।

—সত্যি?

—সত্যি।

মিসেস্ শেরমানি একেবারে প্রায় গা ঘেঁষে বসলেন। বললেন—কেন? না-না, বলতেই হবে। লাভ? রোম্যান্স?

বললাম—দূর—ও সব কিছু নয়।

নিশ্চই লাভ, ব্যর্থ প্রেম—বললেন তিনি।—আপনার চোখ মুখ দেখেই আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি। আমাকে কেউ কোন কথা লুকোতে পারে না। তবে এখনও আপনার চান্স আছে, এখনো আপনার বেশ রোমান্টিক চেহারা। বয়স তার কত হবে? পঁয়তাল্লিশ?

চমকে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—কি করে বুঝলেন?

হাত গুনে—বললেন তিনি।—আপনি তো আমার বয়স বলেছেন 'হার্ডলি থার্টি'। নয় কি? হাউ সিলি? এবার উঠুন।

চলুন।—বলে উঠে দাঁড়ালাম।

যেতে যেতে বললাম—বাড়িতে গিয়ে কিন্তু আপনার বাঙলা গান শুনব।

ভ্রূভঙ্গী করে হেসে বললেন—বেশ। কিন্তু খুব রোমান্টিক গান। গান শুনে আমাকে প্রোপোজ্ করেও বসতে পারেন। আই ডণ্ট মাইণ্ড, রাদার উড এ্যাক্সেপ্ট।

বেইরুতের অভিজাত পল্লীতে মিসেস্ শেরমানির বাড়ি।

ট্যাক্সি থেকে নামলাম তাঁর বাড়ির সামনে। একেবারে আমার হাত ধরে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে দোতলার ছোট্ট ফ্ল্যাটে।

সামনেই বসবার ঘর।

বললেন—নির্ভয়ে বসুন। বাড়িতে কেউ নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার স্বামী?

হেসে বললেন—এতদিন তো ছিলেন না, আমার কপাল-গুণে আজ হয়তো এসেও পড়তে পারেন।

—কিছু মনে করবেন না ?

আপনি কিছু মনে না করলে তিনি কিছু মনে করবেন না—বলেই মিসেস্ শেরমানি প্রজাপতির মত হঠাৎ যেন উড়ে ভেতরকার দরজার দিকে চলে গেলেন। সেখান থেকেই বললেন—আপনি বসে বসে ততক্ষণ মন স্থির করুন, প্রোপোজ করবেন কি না। আমি আপনার জন্য কিছু খাবার আর কফি নিয়ে এখনিই আসছি।

আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

সুন্দর সাজান ঘরটি! ফিনিশিং স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের ঘর অবশ্য রুচিমাফিক সাজানো থাকারই কথা, অবাক হবার কিছু নেই। সোফায় বসে চারদিক তাকিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল ম্যাণ্টেলপিসের ওপরে রাখা বাঁধানো একটি ফটোর ওপর। এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার যুক্ত ফটো। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু মনে মনে আঁচ করে নিতে পারলাম—মিষ্টার এবং মিসেস্ শেরমানির বিবাহের পরের একত্র ফটো।

মনে হওয়া মাত্রই মন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। মিঃ শেরমানিকে দেখার একটা উদগ্র বাসনা মনে জেগে উঠল। মিসেস্ শেরমানি ফিরে আসার পর ফটো দেখতে গেলে তাঁর চটুল পরিহাসে প্রাণ রাখা দায় হয়ে পড়বে। আর সত্য কথা বলতে গেলে সে সময়টুকু অপেক্ষা করার মত ধৈর্যও আমার আর ছিল না।

উঠে দাঁড়ালাম। একটুও শব্দ না করে ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম ম্যাণ্টেলপিসটার দিকে। ফটোর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে এক ঝলক বিদ্যুৎ নেমে গেল। মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল।

এ ফটো আমার চেনা—অত্যন্ত পরিচিত। আমার আর নাজমার এক সঙ্গে তোলা ফটো। জেরুজালেমে। ১৯৫৫ সালে। প্রায় বাইশ বছর আগে।

এ ফটো এখানে এল কি করে? তবে কি নাজমাই এই মিসেস্

শেরমানি ?

সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগল। ফটোটা আমার ছুটো হাতের মধ্যেই রয়ে গেল। চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা, অস্পষ্ট, অন্ধকার······

বাইশ বছর আগেকার এক আশ্চর্য রাত অবগুণ্ঠন খুলে আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল।······

৯

ছোট্ট ক্যামেরাটা হাতে আর পিঠে ক্যামেরা-ব্যাগে দু রোল ফিল্মের কাট-পিস নিয়ে জেরুজালেমের বাইরের দেয়াল ধরে সন্তর্পনে এগিয়ে চললাম।

সারা দিনের প্রখর দাহনের পর রাত বেশ ঠাণ্ডা। এখন অবশ্য রাত আর নেই; আকাশে তারার চোখগুলো নিবে এসেছে—শেষরাতের আবছা অন্ধকার জেরুজালেমের হৃদয় জড়িয়ে।

একটু তাড়াতাড়িই পা চালালাম।

মাউন্ট অব অলিভসের ওপর থেকে নির্জন মরু-সমুদ্রের মাঝে ঘুমন্ত দ্বীপ জেরুজালেমের আকাশে সূর্যোদয় এক রোমাঞ্চকর বিস্ময়। কাল আমার আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, তাই আজ এত সতর্কতা। সূর্যোদয়ের আগেই মাউন্ট অব অলিভসের চূড়ায় ওঠা চাই, ক্যামেরার পজিশন ঠিক করে একেবারে তৈরি হয়ে থাকা চাই—যাতে সূর্যোদয়ের প্রতিটি রঙিন মুহূর্ত ক্যামেরায় ধরে রাখতে পারি।

সমস্ত জেরুজালেম নিদ্রামগ্ন।

অন্ধকার পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। এ পথ দিয়ে সহজে কেউ যায় না, কিন্তু এই পথটা দিয়েই তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। কালই আমি এ পথ আবিস্কার করেছি।

পুতিগন্ধময় কেড্রোন নালাটি তাড়াতাড়ি অতিক্রম করে পাহাড়ে চড়তে লাগলাম। কাঁটাগাছের ডাল, হঠাৎ মাথা-জাগানো পাথরের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে পাহাড়ে উঠছি। ভার্জিন মেরির স্মৃতিস্তম্ভ ছাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছুলাম মাউন্ট অব অলিভসের চূড়ায়। কাল ছবি তুলতে পারি নি ঠিকই, কিন্তু ছবি তোলার জায়গা ঠিক করে রেখে গিয়েছিলাম। কোনাকুনি বসানো বুক-সমান উঁচু দুটো পাথর —তারই আড়াল থেকে দেখা যায় দূর মোয়াবের ধূসর পাহাড়, নীচের

কেড্রোন উপত্যকা, আর ওপরে নির্বাধ ইস্পাত-ধূসর আকাশ।

হঠাৎ সমস্ত আকাশে এক স্বপ্নময় রঙিন আলোড়ন। রঙের সমুদ্র যেন উত্তাল তরঙ্গে দিগন্তে ভেঙে পড়ছে, ঢেউ-এর ফেনাগুলো এক একটি আশ্চর্য রঙের পাপড়ি আকাশের এক এক কোনে মেলে ধরছে। ধূমকেতুর পুচ্ছের মত রঙের আঁচড় দিগন্ত থেকে আকাশের কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত কে যেন তুলি দিয়ে এঁকে যাচ্ছে। সুদূর জর্ডনের নিঃঝুম পাহাড়ের বুক চিরে রঙের উষ্ণ প্রস্রবণ ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে।

কয়েক মুহূর্ত। তারপর আলো যেন শত্রুঞ্জয়ী অশ্বারোহীর মত দ্রুতবেগে ছুটে আসতে লাগল। প্রথমেই আলো এসে লাগল জেরুজালেমের উচ্চ মিনারগুলিতে—প্রাচীর-বেষ্টনী অন্ধকার। তারপর সমগ্র কেড্রোন উপত্যকা আলোয় ঝলমল করে উঠল।

ওপর থেকে সমস্ত জেরুজালেমের প্রভাত-ছবি তোলার জন্য ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে 'ফলো থ্রু' করতে করতে ক্যামেরা নীচু করে আস্তে আস্তে ঘুরছি, হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল। একটি অস্পষ্ট নারীমূর্তি পাহাড় ভেঙে ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসছে—অতি সন্তর্পনে। আমি যে এখানে আছি, কিংবা কেউ যে এখন এখানে থাকতে পারে -- সে যেন একথা একেবারে কল্পনাই করতে পারে নি। তবু তার চলা দেখে মনে হয় যেন সে একটু উদ্বিগ্ন, অতর্কিত বা অভাবনীয় কোন ঘটনা বা আক্রমণের প্রত্যাশায় শঙ্কিত।

ব্যাপারটা আমার কাছে এমনই অস্বাভাবিক, এমনই কল্পনাতীত যে আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতেই লাগলাম শুধু। ক্যামেরার ফিল্ম 'রান আউট' হয়ে যাওয়ায় আমার সম্বিত ফিরল। ক্যামেরা বন্ধ করে ছবি-তোলা ফিল্ম বাক্সের মধ্যে বন্ধ করে ব্যাগে রেখে আমি পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম।

মেয়েটি ততক্ষণে একটা পাথরের ওপর বসে কেড্রোন উপত্যকায় ইতস্ততঃ ছড়ানো ইহুদিদের পুরাতন স্মৃতিস্তম্ভগুলোর দিকে তাকিয়ে বসেছিল। তাকে কিছু না বলে চুপিসারে ফিরে যাওয়ার জন্য পথ

ধরেছি, হঠাৎ একটা পাথরে ঠোক্কর লাগল। সেই শব্দে মেয়েটি চমকে উঠল। একটা অস্ফুট আর্তনাদ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

লজ্জিত এবং অপ্রস্তুত হয়ে আমিও ফিরে তাকালাম।

মেয়েটি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওখান থেকেই ভীত-বিস্ময়ে সে অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম—অত্যন্ত দুঃখিত।

সে চারদিক একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখে আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে এল। হাসবার চেষ্টাও করল একটু, কিন্তু তার চোখ ও মুখের ওপর সুস্পষ্ট শঙ্কার ছাপে সহজেই প্রতারিত হল সেই হাসি।

প্রশ্ন করল—এখানে—এত সকালে—আপনি—ক্—কি করছিলেন?

সুস্পষ্ট ইংরাজি। কিংগ্‌স্‌ ইংলিশ। আমার মতন বাঙালী-ইংরাজি নয়।

এতক্ষণে ভাল করে দৃষ্টি পড়ল মেয়েটির ওপর। বছর উনিশ-কুড়ির ইংরেজ যুবতী। অপূর্ব সুন্দরী—চোখ, মুখ, নাক, ঠোঁট, সমস্ত শরীর যেন এক নিপুণ ভাস্করের ধন্য-সৃষ্টি। তার কালো ঘন চুলের ওপর সূর্যের নরম রোদ এক অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত জ্যোতি সৃষ্টি করেছে।

উত্তর দিলাম—আমারও ঠিক একই প্রশ্ন। আপনি—

অধৈর্যের মত বাধা দিয়ে চাপা গর্জন করে উঠল মেয়েটি—হাউ ডেয়ার ইউ—

কিন্তু পরক্ষণেই সে আমার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল, মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। তার এই অযথা উষ্মায় লজ্জিত হ'লও বোধ হয়।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল—ওঃ, আপনি! দ্যাট সিনেমা বয়। আপনি ইণ্ডিয়ান, না?—এখানে ছবি তুলতে এসেছেন। আপনাকে দু-একবার আমি দেখেছি। কিন্তু আপনি এত সকালে এখানে—

উত্তর দিলাম—সূর্যোদয়ের ছবি তুলতে। অপূর্ব দৃশ্য—

চুপ করে রইল সে। একটু পরে বলল—পথে কারো সঙ্গে দেখা হয় নি?

উত্তর দিলাম—ঠিক দেখা হয়েছে বলব না। পাহাড়ের নীচে দু-একটা উট-চালক বসে বসে ঘুমোচ্ছিল। একবার ঘুম-চোখ তুলে আমাকে হয়তো দেখেছে—ঠিক বলতে পারছি না।

মেয়েটি একটু চিন্তিত ভাবেই বলল—যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু আপনি এখানে নতুন এসেছেন। এখানকার হালচাল কিছুই জানেন না। সাবধানে চলাফেরা করবেন—যেখানে লোকজন বেশি সেই দিকেই থাকবেন। এখানে যখন তখন বিপদ আপদ ঘটতে পারে।

বললাম—ভয় দেখাচ্ছেন ?

ভয় ?—মেয়েটি চটে উঠল, বলল—ভয় আমি দেখাই না। যা সত্য, তাই বলছি। জেরুজালেমের অবস্থা কি তা কি খবরের কাগজে দেখেন নি ? একদিকে আরব, আর এক দিকে ইহুদি—মাঝখানে ব্রিটিশ। এই তিন দল নিয়ে চলছে গুপ্ত লড়াই। সমস্ত নগরীটা এক অনঙ্কিত সীমানা দিয়ে দুই ভাগ হয়ে গেছে—এক ভাগ ইহুদিদের, অন্য ভাগ আরবদের। দুই জাত তাদের সীমানার বাইরে যেতে সাহস করে না। নিজেদের সীমানার মধ্যেও তারা সব সময় নিরাপদ নয়। দুদলেরই অন্তর্ঘাতী দল গোপনে বিপরীত দলের লোকদের হত্যা করছে। ভয় দেখিয়ে সমস্ত জেরুজালেম হস্তগত করার ইচ্ছা। আর বিপদ হয়েছে ব্রিটিশের। প্যালেষ্টাইনের শাসনের ভার তাদের ওপর। দুদলেরই ধারণা ব্রিটিশ সৈন্য এবং পুলিশ থাকার জন্যই তারা অপর দলকে নিঃশেষ করে প্যালেষ্টাইন অধিকার করতে পারছে না। আর তিন বছর পরে ব্রিটিশ প্যালেষ্টাইন ছেড়ে চলে গেলে কি ব্যাপার যে হতে পারে কল্পনাও করা যায় না।

আমি হেসে বললাম— যদি কিছু মনে না করেন, মিস্—

মিস্ টার্নার—জুড়ে দিল মেয়েটি,—আমার নাম নর্মা টার্নার।

আমার নাম ইন্দ্রজিৎ সেন—বললাম আমি।—হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। আপনি যে আমাকে সাবধানে চলাফেরা করতে বলছিলেন, নিজে সে উপদেশ মেনে চলেন না কেন ? আপনি ব্রিটিশ, সুতরাং আপনার

কথামত এই দেশে আমার চেয়ে আপনার ভয়ই বেশি। কারণটা এই যে ইহুদি আর আরব যাদের সীমানাতেই যাবেন, সাধারণ শত্রু হিসেবে দুদলের হাতেই লাঞ্ছিত হতে হবে আপনাকে। আমি ভারতীয় —আমাকে কেউ কিছু না বলতেও পারে।

নর্মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল—আপনার কথা একদিক দিয়ে ঠিক, কিন্তু আমাকে এরা আজ পর্যন্ত কিছু বলে নি। কারণ, আমি ব্রিটিশ হতে পারি কিন্তু এদের কোন ব্যাপারে আমি ঠিক জড়িত নই। বেড়াতে এসেছি, কয়দিন বাদে চলে যাব। তাছাড়া, আমি যে ক্লাবে থাকি—পারপ্‌ল্‌ মোয়াব ক্লাব, তার সেক্রেটারি মিঃ বেলসন এই ক্লাবের খাতিরে অভিজাত ইহুদি, আরব ও ব্রিটিশ সম্প্রদায়েরই খুব প্রিয়। তিনি আমাকে নিজে সঙ্গে নিয়ে সমস্ত জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছেন—সুতরাং অনেকেই আমাকে চেনে। সেইজন্য আমাকে কেউ কিছু বলে নি এবং বোধহয় বলবেও না। আর তা ছাড়া মেয়েদের একটু খাতির তো এখনও আছে।

রোদ ক্রমেই চড়া হয়ে উঠছিল।

নর্মা বলল—এবার ফেরা যাক। যদিও এই দেয়াল-ঘেরা শহরের মধ্যে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে না। বাইবেল-বর্ণিত শহর এই জেরুজালেম, কিন্তু শহরের মধ্যে গেলেই প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, দম বন্ধ হয়ে আসে। তখনই আমি বুঝতে পারি, কেন যিশু জেরুজালেম থেকে বেরিয়ে এই মাউন্ট অব অলিভসে এসে প্রার্থনা করতে বসেছিলেন।

দুজনে নামতে লাগলাম। বাতাসে জলপাই গাছের ডালগুলো কেঁপে শিরশির করে এক শব্দের তান তুলেছে, আমাদের দুজনের চুল উড়ে মুখের ওপর পড়ছে, পায়ের শব্দে চমকিয়ে গাঙ-ফড়িংগুলো লাফিয়ে পালাচ্ছে।

নর্মা আমাকে জিজ্ঞাসা করল—কয়দিন এখানে থাকবেন?

বললাম—বেশিদিন থাকব না। এখানে দেখছি একটু সকালের দিকে ছাড়া ছবি তোলা যায় না। যা চড়া রোদ—। তারপর আশেপাশে

প্যালেষ্টাইনের কিছু ছবি তুলব। একটু সাইট-সিয়িং—তারপর চলে যাব।

অর্থাৎ আরো একমাস দেড়মাস—তাই না?—বলল নর্মা।

ওরে বাবা, না-না,—বলে উঠলাম,—অত পয়সা আমার কোথায়? প্রতিদিন পয়সা গুনে চলতে হচ্ছে আমার।

হেসে উঠল নর্মা, বলল—কি বাজে কথা বলছেন! সিনেমা কোম্পানির পয়সা নেই কি? হলিউডের এক একটা ছবিতে শুনেছি কোটি কোটি ডলার খরচ করে। 'লষ্ট হরাইজন' ছবিতে বরফ দিয়ে তারা একটা নকল মেরু-ই তৈরি করে শুটিং করল।

উত্তর দিলাম—আমাদেরও হলিউডের মত পয়সা থাকলে আমি এখানে একা এসে উঠতাম না। প্রোডিউসার, প্রোডাকসন ম্যানেজার, ডাইরেক্টর, ক্যামেরাম্যান, আর্ট ডাইরেক্টর, হিরো, হিরোইন, মেক-আপম্যান, সকলের সহকারী নিয়ে অন্তত ত্রিশ চল্লিশজন এসে উঠতাম এখানে। আমার মত কেউ একটা ছোট্ট 'হাট' ভাড়া করে যত্রতত্র খেয়ে বেড়াত না। সকলেই এসে উঠত 'কিং ডেভিড হোটেলে', নিদেন পক্ষে আপনার 'পারপ্‌ল্‌ মোয়াব' ক্লাবে। যত না শুটিং করতাম, তার চেয়ে বেশি ঘুরে বেড়াতাম।

নর্মা খিল খিল করে হেসে উঠল, বলল—এখনই বা কম ঘুরে বেড়াচ্ছেন কি? কিন্তু দেখলেন কি কি?

বললাম—এখন পর্যন্ত কিছুই দেখি নি। বিস্মৃত-প্রায় ইতিহাসের দেশ—বিবলিক্যাল ল্যাণ্ড। অথচ এর সম্বন্ধে জানি না কিছুই। আজই একটা কথা জানলাম আপনার কাছ থেকে যে এই মাউণ্ট অব অলিভসে ক্রাইষ্ট প্রার্থনা করেছিলেন।

তখনও দূর থেকে কেড্রোন উপত্যকা দেখা যাচ্ছিল, আর দেখা যাচ্ছিল ইহুদিদের পুরাতন সমাধিস্থান। এদিক ওদিক ছড়ানো স্মৃতি-স্তম্ভের সাদা সাদা পাথরগুলো যেন মড়ার খুলির মত ছড়িয়ে আছে। মেয়েটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—ওই দেখুন 'ডোম অব দি রক',

মুসলমান সম্প্রদায়ের বিখ্যাত মসজিদ, প্রধান তীর্থস্থান। আর ওই যে দূরে একটা দরজার মত দেখছেন, বন্ধ—ওইটাই 'গোল্ডেন গেট'। এ সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে—সত্য মিথ্যা জানি না—আমাকে মিঃ বেলসন বলেছেন। আরব আর ইহুদি—দুই সম্প্রদায়েরই বিশ্বাস যে আত্মার পুনরুত্থানের দিন ঈশ্বর এইখানে বসে তাঁর শেষ বিচার করবেন। সেই আত্মারা যেন সেদিন জোর করে ওই ধর্মস্থান অধিকার না করতে পারে, সেইজন্যই ওই দরজা বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে দেখবার কি আছে?

নর্মা বলল—আছে অনেক কিছুই, অর্থাৎ সবই দেখবার জিনিষ—যারা দেখতে জানে এবং দেখতে চায়। কিন্তু টুরিস্টদের জন্য আছে ওয়েলিং ওয়াল, ডোম অব দি রক, চার্চ অব দি হোলি সেফালকার, সলোমনের কোয়ারি, হেজাকিয়ার টানেল, ভিয়া দোলোরোসা, ডেড সী, সী অব গ্যালিলি—যা দেখবেন সবই দেখবার।

এতক্ষণে নীচে নেমে এসেছিলাম।

অনেক উট রাস্তা দিয়ে সার বেঁধে চলেছে, জর্ডন থেকে দামাস্কাস গেটের দিকে।

আমরা নীচে নামামাত্র দুজন উটচালক এগিয়ে এল, বিড়বিড় করে কি যেন বলল নর্মাকে।

নর্মা হাত নেড়ে বলল—ঠিক আছে, দরকার নেই।

তারা ক্রূর দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে আর একবার নর্মার দিকে তাকাতে লাগল। এবারে একটু ভয়ই করতে লাগল। নর্মার সাবধান বাণীর কথা মনে পড়ল। একেবারে মিথ্যা সে বলে নি। এতদিন লক্ষ্য করি নি তাদের, কিন্তু এবার মনে হল, একটু সাবধানে থাকাই ভাল। হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়েছিলাম দামাস্কাস গেটের কাছে।

সারা শহর জেগে উঠতে সুরু করেছে। উটে চড়ে, গাধায় চাপিয়ে জিনিষপত্র নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামবাসীরা শহরে বিক্রি করতে আসতে

সুরু করেছে। গেটের সামনে বাস, ট্যাক্সি এসে জমায়েত হয়েছে। চীৎকার, গোলমাল—চায়ের দোকান ঘিরে গল্পগুজব। ভিখিরির দল চীৎকার করে ভিক্ষা চাইছে। এক বিশ্রী অস্বস্তিকর পরিবেশ।

নর্মা জিজ্ঞাসা করল—এখন বাড়ি ফিরবেন তো?

বললাম—ওয়েলিং ওয়াল দেখে যাব ভাবছিলাম।

নর্মা একটু ভাবল, তারপর বলল—এখন না দেখলেই ভাল করতেন। আর আজ দেয়াল ছাড়া কিছুই দেখতে পারবেন না। চলুন যাই—কিন্তু ওটা দেখেই ফিরতে হবে। একটা গাইড নিলে ভাল হয়।

সার্ট-প্যান্ট-পরা একজন মধ্যবয়সী লোক আমাদের দেখে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল।

নর্মা তাকে দেখেই ডাকল—হাফিজ!

হাফিজ সেলাম করে এসে দাঁড়াল।

নর্মা বলল—এ আমার পরিচিত গাইড। চল, আমাদের তাড়াতাড়ি ওয়েলিং ওয়াল দেখিয়ে আনবে।

রাস্তা ধরে তুজনে হাঁটতে লাগলাম। একটু এগিয়ে যাচ্ছিল হাফিজ। তুজনের মুখেই কথা নেই। নর্মা সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে যাচ্ছে, মনে মনে সে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন—তার অভিব্যক্তিহীন কঠিন মুখ এবং হরিণী-চোখের চঞ্চলতাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান। নর্মার এই অনাবশ্যক সাবধানতাই আমার মনে একটু ভয় এনে দিয়েছিল।

আজব নগর এই জেরুজালেম। বড় রাস্তাগুলো সোজা এক গেট থেকে আর এক গেট পর্যন্ত চলে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু অন্য রাস্তাগুলো সরু, আঁকাবাঁকা, সাপের মত পাক দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে—কোথাও বা একটা দেয়ালে গিয়ে শেষ হয়েছে, কোথাও বা ঘুরতে ঘুরতে আবার তার আগের মুখের কাছেই ফিরে এসেছে। এক গোলক ধাঁধার মত—জানাশোনা লোক সঙ্গে ছাড়া এই রাস্তায় হাঁটলে সে আর বাড়ি ফিরে আসার পথ খুঁজে পাবে না। কোন কোন রাস্তা একেবারে যেন মাটির নীচে চলে গেছে—কি অন্ধকার, কি নোঙরা

সেই রাস্তাগুলো।

পথের দুধারে সাজানো দোকানপাট। দোকানদারেরা একেবারে তাদের নাকের কাছে তাদের জিনিষপত্র তুলে ধরে কেনার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। প্রতিবারই হাফিজ সেই অবস্থা থেকে আমাদের রক্ষা করে।

ঘুরতে ঘুরতে একটা সরু আঁকাবাঁকা রাস্তার কাছে এসে নর্মা দাঁড়াল। নীল রঙের একটা প্লেটে লেখা—ভিয়া দোলোরোসা। কোনে একটা পাথরের ওপর ক্যামেরা আর ব্যাগ নামিয়ে রেখে দাঁড়ালাম।

রাস্তাটা দেখিয়ে নর্মা বলল—এই রাস্তার দিকে তাকালেই আমরা দু'হাজার বছর অতীত কালে ফিরে যাব। জানেন, এই রাস্তা দিয়েই নাকি যিশু নিজের ক্রশ কাঁধে করে তাঁর বধ্যভূমিতে গিয়েছিলেন। যেখানে যেখানে তিনি দম নৈবার জন্য একটু থেমেছিলেন, সেইখানে গড়ে উঠেছে এক একটি গির্জা। কেউ বিশ্বাস করে এ কথা, কেউ করে না। যাবেন না কি ?

হঠাৎ হাফিজের চীৎকার শোনা গেল। হাফিজ লাফিয়ে উঠে রাস্তার অপর দিকে যাবার জন্য চেষ্টা করল। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। কি মনে করে নর্মা আমাকে জড়িয়ে ধরে ভিয়া দোলোরোসার মধ্যে গড়িয়ে পড়ল। আর সেই সঙ্গে এক প্রচণ্ড শব্দ, এক তীব্র করুণ আর্তনাদ—বিস্ফোরণ, ভাঙা পাথরের টুকরোর বৃষ্টিধারা। ধূলো—ধোঁয়া—অন্ধকার—আমার মুখে রক্তের স্বাদ···

কতক্ষণ এই অর্ধচৈতন্যে কেটেছে জানি না—মনে হল এক যুগ হবে। জ্ঞান ফিরল আমার কপালের ওপর নরম শীতল হাতের স্পর্শে। চোখ মেলে তাকালাম। আমার বুকের ওপর শুয়ে রয়েছে নর্মা, আমি তাকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রেখেছি। আর নর্মা আমার চটচটে কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলাম। সেই অচৈতন্যের ভাব, কপালের বেদনা এক মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। হাত সরিয়ে নিলাম আমি। যৌবন-ধন্যা নর্মা

আমার বুকের ওপর ! আর আমি তাকে জড়িয়ে ধরে আছি !– সমস্ত শরীরের রক্ত-চাঞ্চল্য বেড়ে উঠল এক মুহূর্তেই।

নর্মাও উঠে বসল। বলল—আপনার কপাল কেটে রক্ত পড়ছে। একটা পাথরের টুকরো লেগে এই অবস্থা – ক্ষত খুব গভীর হয় নি। আমার বিশেষ কিছু হয় নি, যা কিছু হয়েছে তা আমার পোশাকের। বেচারা হাফিজ একেবারে শেষ হয়ে গেছে।

আমারও প্যান্ট সার্টের অবস্থা শোচনীয়। পা-ও ছড়ে গিয়েছে। হঠাৎ মনে পড়ল আমার ক্যামেরার কথা। তাকালাম সেই পাথরটার দিকে। ক্যামেরা আর ব্যাগ ঠিকই আছে, কোন ক্ষতি হয় নি।

নর্মা কেমন এক অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলল—যাক, তবু ভাল। নয়তো আপনার এখানে আসা, এত খরচ—সব বৃথাই হত।

নর্মার দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছিল না। ব্লাউসের একটা দিক একেবারে ছিঁড়ে গেছে। নর্মা নিজেকে ঢাকার যতই চেষ্টা করুক না কেন, সেই ছেঁড়া ব্লাউসের ফাঁক দিয়ে তার তুরন্ত যৌবনের পরিস্ফুট চিহ্ন আবৃত রাখতে পারছিল না। অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলেও আমার দৃষ্টি বারবার ফিরে আসছিল তার দিকে এবং তার দিকে মানেই—

আমার এই অভদ্র দৃষ্টিকে সংযত রাখতে আমি পারছিলাম না। তার দিকে তাকিয়ে কথা না বলেও থাকতে পারছিলাম না। সুতরাং উঠে দাঁড়ালাম। ক্যামেরার ব্যাগ খুলে ক্যামেরা ঢাকবার মোটা কালো কাপড়টা বের করে এনে নর্মার গায়ে ছুঁড়ে দিলাম।

নর্মা কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। এবারে সহজ হতে পারলাম আমি।

বললাম—এত বড় বিস্ফোরণ, অথচ একটা লোকও এল না। কি ব্যাপার ?

নর্মা উত্তর দিল—কে আসবে ? সকলেরই প্রাণের ভয় আছে। আর তাছাড়া পুলিশের টানাটানির ভয় আছে। যারা বোমা মেরেছে, তারা তো এতক্ষণে হাওয়া—যারা কাছে থাকবে পুলিশ তাদেরই ধরবে।

বললাম—হাফিজ বেচারা—

নর্মা কিছু বলল না।

একটু চুপ করে থেকে বললাম—এবার বাড়ি ফেরার চেষ্টা করলে হত না?

নর্মা উত্তর দিল—হেঁটে ফিরতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। পায়ে চোট লেগেছে। আপনারও কম চোট লাগেনি। তাছাড়া জামা-কাপড়ের অবস্থাও খুব ভাল নয়। লোকে দেখলে দুয়ো দেবে। পুলিশ এখনি এসে পড়বে, তাদেরই গাড়িতে ফেরা যাবে।

এবারে প্রশ্ন করলাম—কিন্তু কে এই বোমা ছুঁড়ল এবং কেন?

নর্মা উত্তর দিল—সেইটাই বুঝতে পারছি না। এটা আরব-পল্লী। আরবেরাও আমাকে ইংরেজ এবং আপনাকে ইংরেজের বন্ধু ভেবে বোমা মারতে পারে—কিন্তু হাফিজকে দেখা সত্ত্বেও তাদের পক্ষে বোমা মারা সম্ভব বলে আমার মনে হয় না। বাকি রইল ইহুদিরা।

বললাম—আরব পল্লীতে এসে তারা বোমা মারবে?

আপত্তি কিসের?—উত্তর দিল নর্মা।—তাদের ওপর সহজে সন্দেহ হবে না, এই তো সবচেয়ে ভাল। কিন্তু ইহুদিদের লক্ষ্য কে? আমি, না হাফিজ?

আমিও তো হতে পারি—বললাম।

নর্মা মাথা নাড়ল, বলল—না। আপনি না।

একটুক্ষণ পরেই ভারী জুতোর শব্দ শোনা গেল। কয়েকজন লোক যেন খুব জোরে ছুটে আসছে এদিকে। একটা অজানা আতঙ্কে দুজনেই শিউরে উঠলাম। রাস্তার একধারে একটা বড় পাথরের আড়ালে দুজনে ঘেঁষাঘেঁষি করে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। দুজনেরই নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

সেই শব্দ রাস্তার মোড়ে এসে থেমে গেল। তাদের গলা শোনা গেল। হাফিজের মৃতদেহ তারা খুঁজে পেয়েছে। নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করতে লাগল তারা।

নর্মা ফিসফিস করে বলল—পুলিশ।

তারপর সে আমার হাত ধরে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

পুলিশদের মধ্যে একজন আমাদের দেখে চমকে উঠল। চীৎকার করে বলল– কে? আপনারা ওখানে কি করছেন?

সঙ্গে সঙ্গে আর তিনজন পুলিশ এগিয়ে এল, তাদেব হাতে উদ্যত রিভলভার।

আমরা এগিয়ে গেলাম।

এতক্ষণে তারা যেন চিনতে পারল। সকলেই আশ্চর্য হয়ে তাকাল আমাদের দিকে। আস্তে আস্তে একসঙ্গে তারা বলে উঠল—মাই গড! মিস্ টার্নার?

নর্মা হাসবার চেষ্টা করল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল—ইনি মিঃ সেন।

এবারে যেন তারা আমাকেও চিনতে পারল। বলল—ও, দ্যাট সিনেমা ম্যান?

আমার তখন কথা বলার মত অবস্থা ছিল না। মুখে শুধু একটু হাসি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করলাম।

নর্মা ঘটনাটা আগাগোড়া বলে যেতে লাগল। বোধহয় পুলিশদের আমার ওপর ধারণাটা খুব উঁচু করার জন্য তার গল্পের মধ্যে আমাকে এক মস্ত বড় হিরো করে দিল। বোমা পড়তে আমিই নাকি প্রথম দেখি এবং বিপদের আশঙ্কা দেখে আমিই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে শুয়ে পড়ি, যাতে বোমার আঘাত নর্মার গায়ে না লেগে আমার ওপর দিয়েই যায় ইত্যাদি।

একজন আমার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে ফেলল—লাকি চ্যাপ!

কান লাল হয়ে উঠল। লাকি চ্যাপ কেন?—বোমার আঘাত থেকে বেঁচে যাওয়ার জন্য, না নর্মাকে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য?

নর্মার ঠোঁটে একটু দুষ্টু হাসি খেলে গেল। চকিতে একবার আমার

মুখের অবস্থা দেখে নিল।

এবার যাওয়ার পালা। হাসপাতাল ঘুরে যেতে হবে। আমরা হেঁটে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। পুলিশের গাড়ি বড় রাস্তায় আছে, সেখান থেকে মিনিট দশেকের হাঁটা-পথ। দুইজন হাফিজের মৃতদেহের কাছে পাহারা রইল, আরো অনুসন্ধান প্রয়োজন। সেই 'লাকি চ্যাপ' বলা ছোকরা-পুলিশ এবার গায়ের জোরে লাকি হল। নর্মার বারবার আপত্তি সত্ত্বেও সে নর্মাকে পাঁজাকোলা করে দুই হাতে বুকের কাছে তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল। নর্মা যত জানাতে লাগল যে তার আঘাত কিছুই লাগে নি, সে হেঁটে যেতে পারবে বরং সেনের আঘাত লেগেছে, সেই 'লাকি' পুলিশ তাকে ছাড়তে চাইল না। বলল—না-না—আপনি বুঝতে পারছেন না, আপনার শরীরেও বেশ চোট লেগেছে। হেঁটে যেতে পারবেন না।

আমি আর একটি পুলিশের কাঁধে ভর দিয়ে ওদের পিছু পিছু হাঁটতে লাগলাম। আমার সঙ্গী সেই পুলিশটা আমার দিকে তাকিয়ে একবার হাসল, তারপর ইঙ্গিত করে অপর পুলিশের কবলে নর্মার অবস্থা দেখাল। আমারও হাসি পেল।

পুলিশটা বলল—আমার নাম লেনার্ড। তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুশি হলাম। ওই কার্কপ্যাট্রিক একটা পাগল। এ রকম এক আধটা ম্যাড ক্যাপ না থাকলে আমাদের এই চাকরি নরকবাসের মত হয়ে উঠত।

একটু পরে আবার বলল—মিস টার্নারও এক পাগল। বয়স আর কত—খুব বেশি হলে কুড়ি হবে। প্যালেস্টাইনে একলা এসেছে এখানকার জীবন নিয়ে গল্প লিখবে, ছবি আঁকবে। ওর বাবা-মা কি ভেবে ওকে একলা ছেড়ে দিলেন বুঝি না। একে ব্রিটিশ মেয়ে—এদেশে একা—ন্যাচারালি পুলিশের রেসপনসিবিলিটি এসে গেছে। পার্পল্ মোয়াব ক্লাবে হাই র‍্যাংকিং ব্রিটিশ অফিসাররা থাকেন—ওইখানেই ওঁর থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। আর ওই ক্লাবের সেক্রেটারি বেলসন খুব

করিৎকর্মা লোক—ও মিস টার্নারের ওপর কড়া দৃষ্টি রেখেছে।
তারপর একটু হেসে বলল – সেটা কিন্তু ভেরি ব্যাড ফর ইউ এ্যাণ্ড কার্কপ্যাট্রিক।
আমি হাসতে পারলাম না। আমাকে নিয়ে অযথা ঠাট্টা-পরিহাস আমার ভাল লাগে না। কিন্তু লেনার্ড হো হো করে হেসে উঠল।
পুলিশের গাড়ির কাছে এসে পড়েছিলাম। আমাদের এই অবস্থা দেখে একটু দূরে আরবদের একটা ছোটখাটো ভিড় জমে গেল। পুলিশের গাড়িতে উপবিষ্ট দু'চারজন পুলিশও অবাক হয়ে চেয়ে রইল।
একজন বড়গোছের পুলিশ অফিসারকে হাত জোড়া বলে বুট ঠুকে কুর্নিশ জানিয়ে কার্কপ্যাট্রিক বলল—বম্ব এক্সপ্লোজান, স্যার। মিস্ টার্নার ইজ সিরিয়াসলি ইনজিয়র্ড।
সে নর্মাকে মাটিতে নামিয়ে দিল। সেই বড়গোছের অফিসার আমাদের পুলিশের গাড়িতে তুলে দিয়ে ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন– রাশ টু হসপিটাল।
পরে সকলকে ডেকে বললেন—লেট'স্ গো।
এবার কার্কপ্যাট্রিক এগিয়ে এল আমার দিকে, হাত বাড়িয়ে বলল—সেন, যদি তুমি প্রমিস্ কর যে আমার সঙ্গে ডুয়েল লড়বে না, তবে আমরা ফ্রেণ্ডস্ হতে পারি।
আমাকে একটা কথা বলতে না দিয়েই আমার হাত ধরে এক ঝাঁকানি দিয়ে সে চলে গেল। সমস্ত পুলিশ তখন মার্চ করে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের গাড়িও যেন হাওয়ায় উড়ে চলল।

হাসপাতাল থেকে অল্পক্ষণের মধ্যেই ছাড়া পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার কপালে একটা ছোট্ট সেলাই করতে হয়েছিল। তারপর ব্যাণ্ডেজ করে ওষুধ নিয়ে ছাড়া পেলাম। নর্মার কোথাও কেটে যায় নি, কিন্তু পড়ে যাওয়ার জন্য গা-হাত-পা সামান্য ছড়ে গিয়েছিল এবং সর্বাঙ্গে ছিল দারুণ বেদনা।

আমাকে আমার বাসায় নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নর্মাকে নিয়ে চলে গেল। এ রকম উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে আমি আর জীবনে পড়ি নি। দেহ ও মনের ওপর দিয়ে দারুণ এক ঝড় যেন বয়ে গেছে। মাথায় যন্ত্রণা, সর্বাঙ্গে বেদনা—গায়ে জ্বর। বিছানায় শুয়ে পড়ে রইলাম দুদিন।

অবশ্য সেই চারটি পুলিশ—লেনার্ড, কার্কপ্যাট্রিক, মিলস আর ডিগবি —আমার সঙ্গে দু-তিনবার দেখা করে গেছে। মনে হচ্ছে, কার্কপ্যাট্রিক আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে।

একবার সে আমাকে বলল—দেখ সেন, তুমি এখানে একটা ছবি তোল না কেন? আমি হিরো, আর মিস্ টার্নার হিরোইন। এই লেনার্ড, মিলস, ডিগবি, বেলসন—এরা সকলে মিস্ টার্নারকে নিয়ে পালিয়ে যেতে আসবে, আর আমি মিস্ টার্নারকে বুকের ওপর রেখে এক হাত দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরে আর এক হাত দিয়ে এই সব ভিলেইনদের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছি। বল, নাইস্ প্লট না?

সকলে হেসে উঠল। আমারও বাধ্য হয়ে হাসিতে যোগ দিতে হয়। এদের কাছেই শুনলাম, নর্মাও দুদিন বিছানায় শুয়েছিল। এখন ভাল হয়েছে।

হঠাৎ সকালবেলায় আমার ঘরের সামনে একটা বড় গাড়ি এসে থামল। তারপর গটগট করে আসা জুতোর শব্দ।

ঘরের মধ্যে ঢুকলেন বছর ত্রিশের এক ভদ্রলোক এবং পিছনে নর্মা। নর্মা-ই পরিচয় করিয়ে দিল—মিঃ বেলসন আর মিঃ সেন।

করমর্দনের পালা শেষ হলে পর বেলসন একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। আমি নিজেকে বিপন্ন করে মিস্ টার্নারকে বাঁচানোর জন্য যা করেছি, তার জন্য তিনি আমাকে প্রচুর ধন্যবাদ এবং প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছেন। এর আগেই আসা উচিত ছিল, কিন্তু মিস্ টার্নার ছিলেন খুব অসুস্থ এবং মিস্ টার্নারের দায়-দায়িত্ব তাঁরই ওপরে বলে ওখানেই তিনি আটকা পড়েছিলেন। তা ছাড়া এত বড় ক্লাবটাও তাঁরই

দেখতে হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

একটু পরেই উঠলেন। পরদিন দুপুরে ক্লাবে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

আমিও বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই গেলাম থানায়। সেখানে ছিল মিলস।

সে আমাকে দেখে খুব খুশি হয়ে উঠল। এক কাপ চা খাইয়ে দিল। যাবার সময় বলল—একটা দুঃসংবাদ শুনেছ, সেন! শহরে খুব গুজব মিস্ টার্নারের সঙ্গে মিঃ বেলসনের বিয়ে!

বললাম—না, শুনি নি। তবে আজ আর একটু আগেই ওঁরা দুজনে এসেছিলেন আমার ঘরে। মিঃ বেলসন কাল আমাকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছেন।

সেখান থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

নর্মার সঙ্গে বেলসনের বিয়ে! মাত্র কয়দিন আগেই নর্মার সঙ্গে আলাপ, সেই একদিনই কয়েক ঘণ্টা মাত্র একত্র থাকা আর গল্পগুজব —অথচ এই সংবাদটা আমার মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। নর্মার যে কারুর সঙ্গে বিয়ে হবে বা হতে পারে—একথা বিশ্বাসই যেন হয় না। এই কয়দিন একা শুয়ে শুয়ে কি আমি শুধু নর্মাকেই চিন্তা করেছি? সমস্ত মন জুড়ে কি নর্মা-ই রাজত্ব করেছে?

মনে হল, এ বিয়ে যদি বন্ধ করতে পারতাম তবে—

কিন্তু কি করেই বা তা সম্ভব? আর নর্মা-ই বা শুনবে কেন? দুজনেই ব্রিটিশ-সন্তান, সমশ্রেণীর—সেখানে আমার সামান্য অনুপ্রবেশের কথা চিন্তা করাই বাতুলতা। কিন্তু মন থেকে কিছুতে মুছে ফেলতে পারলাম না নর্মার কথা।

বিষণ্ণ মনে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সতর্ক হয়ে চলা আমার উচিত। একবার বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি, কিন্তু পরের বার অত সৌভাগ্য-বান না-ও হতে পারি। কিন্তু নিজের জন্য আর এতটুকু ভয়

নেই। মনে হল, আসুক না খুব বড় এক বিপদ—বেঁচে থাকলে নর্মা নিশ্চয়ই কাছে এসে বসবে, সেদিনের মত কপালে হাত বুলিয়ে দেবে—আর মারা গেলে, একটু কষ্ট তার নিশ্চয়ই হবে।

পাগলের মত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালাম।

কখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে খেয়াল নেই। আমি জেরিকো রোডের ওপর একটা ছোট্ট পাহাড়ের চূড়ায় বসেছিলাম আর ভাবছিলাম নর্মার কথা। যখন হুঁস হল তখন রাত গভীর হয়ে গেছে। টর্চ নিয়ে আসি নি, এই অন্ধকারে নীচে নামা অসম্ভব—পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙে যাবে। অথচ রাত বেশ ঠাণ্ডা—এইখানে বসে থাকলে ঠাণ্ডায় একেবারে জমে যাব। কি করা যায় বুঝতে না পেরে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে একটা ছোট্ট গুহার মত দেখলাম। গা ছমছম করছিল, তবু হাতড়ে হাতড়ে তারই মধ্যে ঢুকে বসে রইলাম।

রাত আর কাটে না। নিজের বোকামির কথাই শুধু মনে হতে লাগল। এ কি আমি পাগলামি করতে বসেছি? নর্মার জন্য আমার মন খারাপ করার কি প্রয়োজন? নর্মাকে পোষবার মত ক্ষমতাই বা আমার কোথায়?—কিন্তু মন তো মানে না। অসম্ভবকেই পাওয়ার বাসনা নিয়ে মানুষ।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধ রাতে গাড়ির শব্দ শুনতে পেলাম। ভয়ও হল, আশাও হল। এই গাড়ি ধরতে পারলে হয়তো জেরুজালেমে ফিরে যেতে পারব। কপালে যা আছে থাক ভেবে আস্তে আস্তে পাহাড় ভেঙে নীচে নামতে লাগলাম। দু-একবার পড়ে যেতে যেতে কোন রকমে টাল সামলিয়ে নিয়েছি। প্রায় নীচে নেমে এসেছি, এমন সময় দেখলাম চারটে গরুর গাড়ি ধীর মন্থর গতিতে চলেছে। গাড়িতে খড় আর খড়, গাড়ি ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। গাড়ির পাশে পাশে হেঁটে চলেছে মাথা মুড়ি দেওয়া লোক।

ডাকব কি ডাকব না ভাবছি, এমন সময় সামান্য অসতর্কতায় একটা ছোট্ট পাথর পায়ের ধাক্কায় পাহাড় দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে

সেই পাহারাদাররা মুখের ঢাকা খুলে বন্দুক তুলে পাহাড়ের দিকে তাকাল।

ভয়ে পঙ্গু হয়ে আমি অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তারা বন্দুক উঁচিয়ে চারপাশ ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগল। তারপর কিছুই দেখতে না পেয়ে আবার চলতে স্বরু করল।

ঠিক সেই মুহূর্তে দেখলাম একটা ত্রিপলের ছেঁড়া জায়গা দিয়ে যা বেরিয়ে আছে, তা একটা মেশিন গান।

কতক্ষণ সেইভাবে সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম খেয়াল নেই। এইটুকু শুধু মনে আছে, সেখান থেকে নড়তে আমার সাহস হয় নি। অন্ধকার একটু পরিষ্কার হলে আমি আস্তে আস্তে নীচে নেমে এলাম। তখন আর হাঁটবার চলবার শক্তি নেই। রাস্তার ধারেই বসে পড়লাম।

একদল লোক উট নিয়ে যাচ্ছিল। আমাকে ওইভাবে দেখে তাদের মধ্যে কলরব জেগে উঠল। হু'একজনের হাতে ছোরাও যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল, কিন্তু তখন আমি দেহে মনে এত বেশি শ্রান্ত যে একবার চোখ তুলে তাকানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারলাম না।

হঠাৎ সেই উটচালকদের মধ্যে একজন আমার দিকে তাকিয়ে অন্য সকলকে কি যেন বলতে লাগল। এবার সকলেই উৎসুক দৃষ্টিতে আমাকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। মনে হল, এ যাত্রা হয়তো আমি বেঁচে গেলাম। এরা হয়তো আমাকে চিনতে পেরেছে যে আমি ইহুদিও নই, আরবও নই, কিংবা ইংরেজও নই—ফিল্ম তোলবার জন্য এখানে এসেছি। একজন ভারতীয়—প্যালেষ্টাইনের সঙ্গে আমার কোনও সংস্রব নেই।

একজন আমাকে তুই হাত দিয়ে ধরে তুলে উটের ওপর বসিয়ে দিল। আবার উটের মিছিল ঠুনঠুন করে এগিয়ে চলল। তারা এসে থামল একটা মাঠের মধ্যে গাছতলায়। একজন ছুটে কোথায় চলে গেল। আমি গাছে হেলান দিয়ে বসে রইলাম—কিছু ভাবতেও পারছিলাম না। ততক্ষণে সকাল হয়ে এসেছে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে সেই আরবটি ছুটতে ছুটতে ফিরে এল, নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করতে লাগল।

একজন তারপর এগিয়ে এসে আমাকে সোজা দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাদের ভাষায় কি যেন বলল; বুঝতেও পারলাম না তার কথা। তারপর আমাকে এক হাত দিয়ে ধরে হাঁটতে সুরু করল। এবার বুঝতে পারলাম, সে আমার ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

আমার বাসার কাছাকাছি এসে সে আমাকে রেখে দৌড়ে আবার চলে গেল।

এবার শরীরে যেন জোর ফিরে পেলাম। আস্তে আস্তে আমার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নর্মা।

অবাক হয়ে গেলাম। নর্মা!—এত সকালে!

আমার দিকে তাকিয়ে নর্মা বোধহয় আরও বেশি অবাক হয়ে গিয়েছিল। হাঁ করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর একেবারে ছুটে এসে আমাকে ধরল—কোথায় ছিলেন আপনি কাল থেকে? আমি নিজে পাঁচ ছয়বার আপনাকে খুঁজতে এসেছি। পুলিশে খবর দিয়েছি। সারা রাত চোখে আমার ঘুম নেই।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। তারপর আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে ঘরের ভেতর ঢুকলাম। নর্মাও পিছন পিছন এল।

জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছিল? কোথায় ছিলেন?

আর থাকতে পারলাম না। বলে ফেললাম—আপনার নাকি বেলসনের সঙ্গে বিয়ে? তাই—

চোখ বড় বড় করে থমকে তাকিয়ে রইল নর্মা কিছুক্ষণ। তারপর তার ঠোঁটের কোনে একটু একটু করে হাসি ফুটে উঠতে লাগল।

আস্তে বলল—কি বোকা ছেলে!

আমি আর মনকে বেঁধে রাখতে পারলাম না। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললাম। নর্মা এগিয়ে এসে আমার মুখটা তার বুকের মধ্যে চেপে

ধরে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

আস্তে আস্তে বলল—সেন! সেন! চুপ কর—চুপ কর। কেঁদ না। কাঁদলে আমি চলে যাব—চলে যাব বলছি—

চোখ মুছে তাকালাম। নর্মার চোখেও জল।

নর্মা বলল—তুমি বড় ছেলেমানুষ, সেন। এত মন খারাপ করতে হয়! তুমি বড় অসুস্থ—এখন চুপচাপ শুয়ে থাক। দুপুর বেলায় ঠিক সময়ে লাঞ্চে এস।

চলে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—আর একটা কথা। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে কাল কোথায় গিয়েছিলে—সত্যি কথা বলো না যেন! বলবে যে, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলে—তাই ফিরতে পার নি।

বললাম—আমার যে অনেক কথা বলার আছে।

নর্মা বলল—আমারও আছে। আজ দুপুরে সব শুনব।

নর্মা দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

বেলসনের আতিথ্যের ত্রুটি ছিল না। সারা ক্লাব আমাকে নিজে ঘুরিয়ে নিয়ে দেখালেন। সকলের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। সকলেই সেই বোমার ব্যাপারে আমাকে ধন্যবাদ জানালেন, আমার ছবির কতদূর অনুসন্ধান করলেন।

খাওয়া দাওয়ার প্রচুর ব্যবস্থা। নর্মা সেজেছেও খুব সুন্দর। বেলসন তো নর্মার এত সাজগোজ দেখে আনন্দে ডগমগ।

বেলসনই আমাকে বললেন—আপনাকে একটা সুখবর দিই। আমি মিস্ টার্নারকে প্রপোজ করেছি এবং তিনি এ্যাক্সেপ্ট করেছেন।

দুজনকেই অভিনন্দন জানালাম।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে পর নর্মা বেলসনকে বলল—আমি আর সেন একটু বাইরে যাচ্ছি। দুজনে বসে বসে গল্প করব, অর্থাৎ আমি আমার বইয়ের খবর সংগ্রহ করব সেনের কাছ থেকে।

ক্লাব থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেলাম কিং ডেভিড হোটেলে। সেখানে ছুটো ঠাণ্ডাই নিয়ে বসে গল্প করতে লাগলাম। কথায় কথায় বললাম রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা।

চমকে উঠল নর্মা। বলল—অস্ত্রশস্ত্র! ঠিক দেখেছ?

বললাম—ঠিক।

—কোথায় নিয়ে গেল জান?

—না, তা দেখি নি।

নর্মা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল—নিশ্চয়ই ইহুদিরা আনছে। অন্তর্ঘাতী কাজ আরো জোরদার করতে চায়। এর খোঁজ নিতেই হবে।

হঠাৎ আমাকে নর্মা বলল—জান সেন, আমি বেলসনকে এ্যাকসেপ্ট করি নি। ও-ই এই কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি শুধু বলেছি—একটু ভাববার সময় চাই। বেলসন লোক বড় ভাল, কিন্তু আমার মোটেই পছন্দ নয়। আমার পছন্দ—বেশ বোকা বোকা একটি ছেলে।

আমার দিকে তাকিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল। আমার ভয়ঙ্কর রাগ হল। উঠে দাঁড়ালাম।

নর্মাও উঠে দাঁড়াল।

বলল—বেশ। বিশ্বাস হল না তো! এখন চল।

ছুজনে বেরিয়ে ঘুরতে লাগলাম। ছেলে মানুষের মত নর্মার উচ্ছলতা। একটা ফটোগ্রাফিক ষ্টুডিও দেখে বলে উঠল—ফটো তুলবে?

আমার মতামত শোনার অপেক্ষা না রেখেই সে জোর করে আমাকে টেনে নিয়ে গেল ষ্টুডিওতে। আমাদের ছুজনের এক সঙ্গে ফটো তোলা হল।

বাইরে বেরিয়ে এসে বলল—কেমন? আর পালাতে পারবে?

এবারে একটা পার্কে গিয়ে বসলাম গা ঘেঁষে। আমার হাত নিয়ে সে খেলা করতে লাগল।

হঠাৎ বলল—সেন, তুমি বাঙলা গান জান? আমাকে একটা শিখিয়ে

দেবে ? লক্ষ্মীটি—

একেবারে বুকের ওপর এসে পড়ল সে। হঠাৎ চারদিক তাকিয়ে আমার ঠোঁটের ওপর সে ঠোঁট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সর্বাঙ্গ অপূর্ব শিহরণে জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।

ছুজনে চুপচাপ বসে রইলাম অনেকক্ষণ।

হঠাৎ নর্মা বলল—গান শোনালে না ?

তার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে পরিষ্কার করে বার বার গাইলাম একটি গানের একটি লাইন—সেদিন ছুজনে ছুলেছিনু বনে ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা—

নর্মা প্রথমে শুধু গুনগুন করে স্থর তুলতে লাগল, তারপর ভাঙা ভাঙা বাঙলায় গানের কলি—

সেই ফটোর দিকে তাকিয়ে আছি।

বাইশ বছর আগেকার সেই স্মৃতি চোখের সামনে আবার জেগে উঠেছে।

নর্মা আমার বুকে মাথা রেখে আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভাঙা ভাঙা বাঙলায় গান শিখছে···

সেই গান শুনতে পেলাম।

প্রথমে গুন গুন করে, তারপর একটু জোরে—সেই একই রকম ভাঙা বাঙলায়। দূর থেকে কাছে এল, একেবারে আমার পাশে। চমকিয়ে তাকালাম।

মিসেস্ শেরমানি।

খাবারের ট্রে-টা টেবিলে নামিয়ে রেখে মিসেস্ শেরমানি এগিয়ে এলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন—কি দেখছিলেন, মিঃ সেন ?

তাকালাম তাঁর দিকে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। তারপর ছুটে গিয়ে

বুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলাম—নাজমা ! ওঃ নাজমা !

বুকে মাথা রেখে কেঁদে ফেলল নাজমা। বলল—ওঃ সেন ! ইন্দ্র—তুমি কেন এর আগে আমাকে চিনতে পার নি ? আমি তো তোমাকে প্রথমে দেখেই চিনতে পেরেছি।

—তুমি কেন আগে পরিচয় দাও নি ?

—দেখছিলাম, তুমি আমাকে চিনতে পার কি না। ভেবেছিলাম—তুমি চিনতে না পারলে আর কাঙালের মত পরিচয় দেব না। তুমি তোমার দেওয়া আঙটিও চিনতে পারলে না, ইন্দ্র !

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নাজমা বলল—এবার বস। একটু খেয়ে নাও। আজ সারা দুপুর, সারা রাত্রি ধরে আমরা এই বাইশ বছরের গল্প করব।

দুজনে পাশাপাশি একেবারে গা ঘেঁষে বসে কফি খেলাম। খাওয়া শেষ হলে পরেও সেইভাবেই বসে রইলাম অনেকক্ষণ।

হঠাৎ উঠে পড়ে নাজমা বলল—ইন্দ্র, আমি দুপুরের খাওয়ার বন্দোবস্ত করি। তুমি বসে বসে আমার কথা ভাব।

নাজমা চলে গেল। ভাবতে গেলাম নাজমার কথা, কিন্তু পারলাম না। মন শুধু ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল জেরুজালেম, প্যালেষ্টাইনের পথে পথে। সামনের সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল···

জেগে উঠল প্যালেষ্টাইনের নতুন নাম।

ইজরায়েল।

ইজরায়েল।

হিব্রুদের জাতীয় বাসভূমি।

হিব্রু জাতির প্রথম আবির্ভাব আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে। মোজেসের নেতৃত্বে তারা তখন এক হয়ে ফারাও-র রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে মিশর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাসভূমির প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সঙ্কল্পে।

তারপর জোসুয়া রক্তনদী প্রবাহিত করে তাদের হাতে তুলে দিলেন একটি স্বতন্ত্র দেশ—প্যালেষ্টাইন।

কিন্তু আজ পর্যন্ত স্বতন্ত্র ইহুদি-রাষ্ট্র পূর্ণত্ব অর্জন করতে পারে নি।

৭১ খৃষ্টাব্দ। রোম সম্রাট টাইটাস জেরুজালেম অধিকার করে হিব্রুদের ধর্ম-মন্দির ধ্বংস করে দিলেন। বিজয়ী সৈন্য নিয়ে ভীত-বিহ্বল ইহুদিদের তাড়িয়ে দিয়ে যখন তিনি এই ধর্মনগরী ত্যাগ করলেন, তখন এই আদি ধর্ম মন্দিরের অস্তিত্বের স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল শুধু মন্দিরের সীমানার একদিকের একটা প্রাচীর।

দি ওয়েইলিং ওয়াল।

এরই বুকে মাথা কুটে কুটে ভক্তপ্রাণ ইহুদিরা যুগ যুগ ধরে ক্রন্দন করেছে অতীতের ঐতিহ্যপূর্ণ গৌরবময় যুগের কথা স্মরণ করে। আজও শেষ হয়নি তীর্থকামী ইহুদিসন্তানদের সেই ক্রন্দন।

জেরুজালেম ধ্বংস করে টাইটাস চলে গেলেন। দলে দলে ইহুদিরাও প্রাণভয়ে দেশত্যাগ করল। বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠির মাঝে এই ক্ষুদ্র দেশে শান্তি এবং স্বস্তি কোনদিনই আসতে পারে না। বারবার বিদেশী সম্রাট এসে অধিকার করেছেন এই দেশ, লুণ্ঠন করেছেন, নির্যাতন করেছেন।

অধিকাংশ ইহুদিই তাদের বাসভূমি ত্যাগ করে দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। রইল সামান্য সংখ্যক দরিদ্র ইহুদি, যাদের বিদেশে যাওয়ার সম্বল নেই।

ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যেই এই ইহুদির দল তাদের আশ্রয় খুঁজে নিল। গৃহছাড়া উদ্বাস্তুর দল কায়ক্লেশে দিন কাটাতে সুরু করল। সংযম, নিষ্ঠা, পরিশ্রম এবং প্রখর ব্যবসাবুদ্ধির জোরে তারা দিন দিন উন্নতি করতে লাগল। দেশের অধিকাংশ অর্থের মালিক হল এই ইহুদি সম্প্রদায়।

কিন্তু ইহুদিরা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল তাদের ভাগ্য। তাদের ভাগ্যে নেই শান্তি, নেই স্বস্তি। তাদের এই উন্নতিতে দেশের কোন লোকই প্রীত ছিল না। তাদের এত অর্থবান দেখে দেশের লোকেরা হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণ।

এই কারণে খৃষ্টান-ইউরোপ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল ইহুদি সমাজের ওপর। ইন্ধন জোগালেন খৃষ্টান ধর্মযাজকেরা। তাঁরা বললেন, এই ইহুদি সমাজই যিশুকে ঈশ্বর-পুত্র বলে স্বীকার করে নি এবং এই ইহুদিদের জন্যই যিশু ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে দেহত্যাগ করেন।

ফলে খৃষ্টান সমাজের ঘৃণার এবং নির্যাতনের পাত্র হল তারা।

মুসলমানদের হাত থেকে ধর্মনগরী পুনরধিকারের জন্য যতবারই খৃষ্টান-ইউরোপ ক্রুসেডে গিয়েছে, তার প্রথম বলি হয়েছে এই ইহুদি সম্প্রদায়।

বরং আরবদের অধীনে এই ইহুদিরা সুখে ছিল। আরব-রাষ্ট্রে প্রতিটি অমুসলমান যদিও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, কিন্তু তাদের ওপর কোনদিন নির্মম অত্যাচার বা উৎখাত করবার চেষ্টা হয় নি। বরং ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে আরব সম্রাটের অধীনে গুণবান ইহুদি সম্প্রদায়ের অনেকেই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হয়তো আরবদের অবচেতন মনে এই কথাই উদিত হত যে আরব এবং ইহুদি একই সেমেটিক জাতি সম্ভূত। কিন্তু ইউরোপীয়দের ইহুদি-ঘৃণা বিজাতি-বিদ্বেষ প্রসূত।

মধ্য-ইউরোপ তাই এই ইহুদিদের নিজেদের মধ্যে আপন করে নেয় নি। তারা ইহুদিদের রেখেছিল খৃষ্টান সম্প্রদায়ের থেকে দূরে স্বতন্ত্র পল্লীতে অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে। এই অন্ধকার পুতিগন্ধময় পল্লীর নাম ছিল ঘেটো।

শান্তির আশায়, ভদ্রভাবে জীবনযাপনের স্বপ্নে আবার একদল ইহুদি মধ্য-ইউরোপ ত্যাগ করে গেল উত্তরে—পোল্যাণ্ড আর রাশিয়ায়। পোল্যাণ্ড তাদের ওপর বসাল ইহুদি কর, স্বতন্ত্র পোশাক পরতে তাদের বাধ্য করল, বাস করতে দিল সেই ঘেটোতেই।

কুসংস্কারপূর্ণ ছিল মধ্যযুগীয় ইউরোপ।

মহামারী, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়—যা কিছুই হোক্ না কেন, সমস্ত দোষ পড়ত এই ইহুদি সম্প্রদায়ের ওপর। মধ্য-ইউরোপে একবার প্লেগ দেখা দিল মহামারীরূপে। রটনা হল অপবিত্র ইহুদিরাই দেশে এই প্লেগ এনেছে। অমনি সুরু হল সারা ইউরোপব্যাপী ইহুদি নিধন। এক পোল্যাণ্ডেই এক বছরে পাঁচ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করা হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী বিপ্লব জয়যুক্ত হল। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার নিশান তুলল ফরাসীরা। দেশের লোকের মধ্যে থাকবে না আর বিভেদ, সব ভাই ভাই এক ঠাঁই। সুতরাং ফরাসীরা ইহুদিদের বুকে তুলে নিল, নিজেদের সমাজে হল তাদের স্থান। এই প্রথম ইহুদিরা ইউরোপে পেল সম্মান, পেল ভালবাসা। এর প্রতিদান দিতে তারা কার্পণ্য করল না। ফ্রান্সের সর্বাত্মক উন্নতির জন্য ইহুদি-সমাজ বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ ও শক্তি দিয়ে প্রাণপাত করল। একটি দেশ থেকে দূর হয়ে গেল ইহুদি-বিদ্বেষ। ফরাসী বিপ্লবের হাওয়া লাগল ইউরোপের অন্যান্য দেশেও। ধীরে ধীরে ইহুদি বিদ্বেষ কমে এল; কিন্তু কারণে অকারণে ইহুদিরা মাঝে মাঝে নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেত না।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার জার এই ইহুদিদের একদিনের জন্য শান্তি

দেন নি। তাঁর স্বেচ্ছাচারী শাসনের এরাই ছিল প্রধান বলি। রুশ জনসাধারণ জারের স্বৈরাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেই জার দেশবাসীর মধ্যে ইহুদি-বিদ্বেষ প্রবেশ করিয়ে দিতেন। জারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত আক্রোশ ফেটে পড়ত ইহুদিদের ওপর।

অষ্ট্রিয়া নিবাসী এক ইহুদি থিওদোর হারৎসল তাঁর জ্ঞাতি ভাইদের নির্যাতনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। প্যারিসে থাকার সময় তিনি জার্মান গুপ্তচর হিসেবে ধৃত ইহুদি আলফ্রেড ড্রেফিউইসের বিচারের নামে প্রহসন দেখেছিলেন। সমগ্র বিশ্বে ছড়ানো এই নির্যাতিত ইহুদি সমাজের বেদনায় তাঁর মন কেঁদে উঠল। বিশ্বের দরবারে এই নিপীড়িত ইহুদিদের জীবন-সমস্যা তুলে ধরা, মনুষ্য-সমাজে তাদের ভদ্রভাবে বাঁচার দাবী জানানো এবং সর্বোপরি ইহুদিদের জন্য এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করে তিনি এক আন্দোলন গড়ে তুললেন, যার নাম জিয়ন আন্দোলন বা জিয়নিষ্ট মুভমেণ্ট। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে ইহুদি মহাসম্মেলন আহ্বান করলেন এবং সেই সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করলেন যে ইহুদিদের আদি বাসভূমি প্যালেষ্টাইনে ইহুদিদের জন্য একটি জাতীয় বাসভূমি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এই দাবী ধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একদল ইহুদি ইউরোপ ত্যাগ করে। প্রত্যাবর্তন করল প্যালেষ্টাইনে। সেখানকার ধনী ও দরিদ্র আরববাসীরা তাদের সাদরে গ্রহণ করল। ধনী আরব ভূস্বামীরা তাদের কাছে অনুর্বর জমি বিক্রি করে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু ইহুদিরা নিশ্চেষ্ট নয়। কিছুদিনের মধ্যেই পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ে তারা তাদের শ্রী ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হল, তাদের ঐশ্বর্য সেখানকার ধনী আরববাসীদের ঐশ্বর্যকেও শতগুণে ছাপিয়ে গেল। সুতরাং মানসিক বিরোধ দেখা দিল ধনী ইহুদি ও দরিদ্র আরব —এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে।

প্যালেষ্টাইনের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জনই ছিল

আরব। এদের মধ্যে আবার অধিকাংশ ছিল বাইবেল-কথিত ক্যানানাইটদের বংশধর। এই ক্যানানাইটদেরই হিব্রুরা প্যালেষ্টাইন থেকে জোর করে উৎখাত করে দেশ দখল করে। ক্যানানাইটরা তখন চলে যায় নিকটবর্তী ফিনিসীয় ও ফিলিষ্টাইন রাজত্বে। তারাই কাল-ক্রমে আরবজাতিতে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু যে ইহুদিরা অতীতে এই প্যালেষ্টাইন ত্যাগ করে পালিয়েছিল, তাদের বংশধরেরা কিন্তু এখন আর প্যালেষ্টাইনে প্রত্যাবর্তন করল না। যারা ফিরে এল তারা হয়েছে জুডা-ধর্মে দীক্ষিত ইউরোপীয়দের বংশধর, যাদের আদি বাসভূমি কোনকালেই ছিল না প্যালেষ্টাইন, কিংবা তাদের দেহে নির্ভেজাল সেমেটিক রক্ত প্রবাহিত নয়। প্যালে-ষ্টাইন এদের স্বদেশভূমি কোনকালে ছিল না, তাই এখন দলে দলে বিদেশী ইহুদিদের প্যালেষ্টাইন আগমনে এবং প্যালেষ্টাইনকে নিজেদের দেশ বলে দাবী করায় এদেশের আরব অধিবাসীরা অসন্তুষ্ট ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল।

এই প্যালেষ্টাইনে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ইহুদি-রাষ্ট্র গঠনের জন্য বিশ্বের ইহুদিকুলের জিয়নিষ্ট আন্দোলন তখন খুব জোরদার হয়ে উঠেছে। এই আন্দোলন প্রাধান্য লাভ করেছিল সে যুগের সব চেয়ে দুই শক্তিশালী দেশে—ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায়। এই দুই দেশেই ইহুদি-সমাজ ব্যবসা, বিজ্ঞান, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তারা সরকারী কর্তৃপক্ষের ওপর যেমন চাপ দিতে লাগল, সেইরকম প্রচুর অর্থব্যয়ে প্যালেষ্টাইনে স্বাধীন ইহুদি-রাষ্ট্রের জন্য জনমত গঠন করতে লাগল।

এই জিয়নিষ্ট আন্দোলন ব্রিটেনে সর্বদলের সহানুভূতি লাভ করল। উদারপন্থীদল মনে করল যে এরকম একটা রাষ্ট্র গঠিত হলে ইহুদি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হবে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার মনে মনে ভাবল যে আরব-রাজ্যের মাঝখানে প্যালেষ্টাইনে একটা ইউরোপীয় ইহুদি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলে সম্ভাবিত আরব-ঐক্যে ফাটল ধরানো যাবে

এবং আরব ঐক্যের বিরুদ্ধে একটি শক্ত সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করা যাবে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা মনে করল যে এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

এই আন্দোলনে এবার যোগ দিলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর চেইম ওয়াইজারমান। রাশিয়ান ইহুদি তিনি, স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এসেছেন ব্রিটেনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাসায়নিক গবেষণা এবং আবিষ্কারে যুদ্ধ জয়-প্রচেষ্টাকে তিনি প্রভূত সাহায্য করছেন। তিনি এই জিয়নিষ্ট আন্দোলনের কর্ণধার হয়ে ব্যক্তিগত আবেদন জানালেন লয়েড জর্জ ও লর্ড ব্যালফারের কাছে। ডক্টর ওয়াইজারমানকে নিরাশ করতে পারে ব্রিটিশ সরকার এই যুদ্ধকালীন সঙ্কটে?

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার এই সুযোগের অপব্যবহার করতে চাইল না। তারা দেখল যে জিয়নিষ্ট আন্দোলনের দাবী অনুযায়ী প্যালেষ্টাইনে স্বতন্ত্র ইহুদি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিলে ইউরোপীয় ইহুদি সমাজ জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্রিটেনকে অকুণ্ঠ সাহায্য করবে। আমেরিকার ঐশ্বর্যশালী ইহুদি সমাজ ও ব্রিটেনকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করতে কার্পণ্য করবে না।

সুতরাং অতি সহজেই লয়েড জর্জ, লর্ড ব্যালফার, উইনষ্টন চার্চিল প্রভৃতি ব্রিটিশ রাজনীতিকরা জিয়নিষ্ট আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন জানালেন। আমেরিকায় ইহুদি সমাজের ভোট ও বিপুল অর্থ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ওলটপালট করতে পারে। সুতরাং তাদের চাপে প্রেসিডেন্ট উড্র উইলসনও এই আন্দোলনে তাঁর সহানুভূতি জানালেন।

এই সব স্বার্থতুষ্ট রাজনীতিকরা প্রথমে চিন্তা করলেন নিজেদের স্বার্থের কথা, তারপর ইহুদিদের। একবারও তাঁরা মনে করলেন না প্যালেষ্টাইনের অধিবাসী আরবদের কথা। শতকরা পঁচানব্বই জন আরব-অধ্যুষিত প্যালেষ্টাইনে ইহুদিদের বাসস্থান করে দিতে হলে আরবদের ওখান থেকে সরাতেই হবে। কিন্তু তারা তাদের এতদিনের

বাসভূমি ছেড়ে কোথায় আশ্রয় খুঁজতে যাবে?

কিংবা হয়ত এই সব গর্বান্ধ রাজনীতিকরা মনে করেছিলেন যে, ইউরোপীয় ইহুদিরা মানুষ হিসেবে আরবদের চেয়ে অনেক উচ্চশ্রেণীর, তাদের জীবনের মূল্য অনেক বেশি, সুতরাং ইউরোপীয় ইহুদিদের স্বার্থে হতভাগ্য আরবদের বলি দেওয়া যেতে পারে।

প্যালেষ্টাইনে ইহুদি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা শুনে জর্জ এণ্টোনিয়াস মন্তব্য করেছিলেন: 'অন্যের দেশে বিদেশী আর এক জাতির বাসভূমি প্রতিষ্ঠা করা একমাত্র সম্ভব—হয় দেশবাসীকে উৎখাত করে, নয়তো একেবারে সমূলে বিনাশ করে।'

এই নিদারুণ সত্য জানত মিত্রশক্তির প্রত্যেকেই। জানতেন লয়েড জর্জ, জানতেন ব্যালফার, জানতেন উইলসন, জানতেন চার্চিল আর দক্ষিণ আফ্রিকার কলঙ্ক-চূড়ামণি জেনারেল স্মাটস। জানত পৃথিবীর সকলেই—জানত ইহুদিরা, আর প্যালেষ্টাইনের আরব অধিবাসীরা।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের কূটনীতি নিজেদের স্বার্থ ছাড়া তার হলুদ চোখে আর কিছুই দেখতে পায় না। আরব-সহানুভূতি লাভের জন্য এবং তুর্কির বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহের জন্য একদিকে ব্রিটিশ মক্কার শেরিফ হুসেনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হল যে সমগ্র আরব-রাষ্ট্রকে তারা স্বাধীনতা দেবে, অপর দিকে বিশ্ব-ইহুদি সমাজের সহানুভূতিলাভ এবং সাম্রাজ্য-বাদের কূটচক্র চিরস্থায়ী করার জন্য ব্রিটিশ সরকার একটি ঘোষণা করলেন, যে ঘোষণা ব্যালফার ঘোষণা (Balfour Declaration) নামে ইতিহাসে কলঙ্কিত হয়ে আছে। এই ব্যালফার ঘোষণা ব্রিটিশ আরবদের কাছে সযত্নে গোপন করে রাখল।

এই ব্যালফার ঘোষণায় বলা হল: "His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate this objective, it

being clearly understood that nothing shall be done to prejudice the civil and religious rights of other non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country."

ব্রিটিশ সরকারের বদান্যতা, অন্য জাতির স্বীয় অধিকার রক্ষার জন্য তার প্রচেষ্টা দেখে স্তম্ভিত না হয়ে উপায় নেই। যে প্যালেষ্টাইনের অধিবাসীদের শতকরা পঁচানব্বই জনই আরব, তারা ব্রিটিশ কূটনীতির খেলায় এই ঘোষণা অনুযায়ী হল non-Jews, যেন non-Jews অর্থাৎ আরবরা প্যালেষ্টাইনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং যেন অধিবাসীদের শতকরা পাঁচ ভাগ হয়েও ইহুদিরা সেখানকার সংখ্যা-গুরু সম্প্রদায়। যারা প্রকৃত খবর রাখে না, এবং তাদের সংখ্যাই পৃথিবীতে অনেক বেশি,—তাদের সহজে প্রতারিত করার জন্যই এই চাল।

ব্রিটিশ সরকার এই ঘোষণা স্বাক্ষরিত করেও কিন্তু আরবদের একথা জানাতে সাহস পাচ্ছিল না। এই ঘোষণার কথা রাশিয়ার বলশেভিকরা প্রথমে সকলকে জানায়। ব্রিটিশ সরকার প্রথমে অস্বীকার করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সম্পূর্ণ ঘোষণাটি বিজ্ঞাপিত করে।

বিশ্ব-আরব জাতি স্তম্ভিত হয়ে গেল। ব্রিটিশের এই দু-মুখো সাপের খেলা তারা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি। ব্রিটিশ সরকারের কাছে আরববাসীরা জানতে চাইল এই ঘোষণার গূঢ় অর্থ, কিন্তু ব্রিটেন তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। হুসেন স্যার হেনরি ম্যাকমোহনের সঙ্গে তাঁর চুক্তির কথা তুললেন, তাতে পরিষ্কার ভাবে তিনি স্বীকার করেছেন যে, যে দেশগুলোতে আরবরা সংখ্যাগুরু সেই দেশগুলিকেই স্বাধীনতা দিতে ব্রিটিশ সরকার স্বীকৃত। কিন্তু ম্যাক-মোহন জানালেন, তিনি চিঠিতে কোথাও প্যালেষ্টাইনের কথাই উল্লেখ

করেন নি, বরং তিনি বরাবরই ভেবে এসেছিলেন যে আরবরা প্যালেষ্টাইন বাদ দিয়েই অন্যান্য আরব রাজ্যের স্বাধীনতা চেয়েছিল এবং তিনি কোনদিনই প্যালেষ্টাইনকে আরব রাজ্য বলে মনে করেন নি।

একদিকে প্রচণ্ড আরব বিক্ষোভ, অপর দিকে শান্তি সম্মেলন কর্তৃক ব্রিটেনকে প্যালেষ্টাইন রক্ষণাবেক্ষণের কর্তৃত্ব দান। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্র উইলসন মনে করলেন যে প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকার এবং আমেরিকার ইহুদি সমাজ তাঁকে প্রকৃত তথ্য জানায় নি। তিনি চাইলেন একটা কমিশন বসিয়ে প্যালেষ্টাইনের অধিবাসী-দের মতামত জানতে। এই কমিশনে আমেরিকার সঙ্গে যোগ দিতে তিনি ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে আহ্বান করলেন। প্রকৃত তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ব্রিটেন যোগদান করতে একেবারে অস্বীকার করল; আর ফ্রান্সও প্রতিনিধি পাঠাল না, কারণ তবে সিরিয়া লেবাননের অধিকার তাদের হস্তচ্যুত হয়ে যেতে পারে।

উইলসন এই দুই রাষ্ট্রের অসহযোগিতা সত্ত্বেও একটি কমিশন গঠন করলেন ডঃ হেনরি কিং এবং চার্লস্ ক্রেন নামে দুইজন আমেরিকানকে নিয়ে। কমিশন দীর্ঘ দিন ধরে প্যালেষ্টাইনে কাটালেন, যত সম্ভব লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন, সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন।

শেষ পর্যন্ত এই কমিশন জানালেন যে, যে আরব অধিবাসীরা প্যালেষ্টাইনে অত্যন্ত সংখ্যাগুরু তারা ব্রিটেনকে চায় না তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিতে। ইহুদি নেতাদের সঙ্গে আলোচনার কথা উল্লেখ করে বললেন যে, ইহুদি নেতারা ব্যালফার ঘোষণায় আরব জাতিদের যে অধিকার সংরক্ষিত করা হয়েছে, সে অধিকার দিতে তারা অনিচ্ছুক। তারা প্যালেষ্টাইনকে সম্পূর্ণরূপে ইহুদি-রাষ্ট্র করতে চায়—আরব অধিবাসীদের ভূমি-সম্পত্তির জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত। আর এ কথাও স্বীকার করলেন যে, প্যালেষ্টাইনে আরব জাতির মধ্যে ইহুদি-বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল এবং তা হাল্কাভাবে গ্রহণ

করা কোনমতেই উচিত নয়। এমন কি ব্রিটিশ সামরিক অফিসাররা পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে বন্দুকের গুঁতো ছাড়া প্যালেষ্টাইনে ইহুদি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা কখনো সম্ভব নয়।

সবশেষে এই কমিশন এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেনঃ "Decision requiring armies to carry out are sometimes necessary, but they are surely not gratuitously to be taken in the interests of injustice."

ব্রিটেন এই সব কথাই মনে মনে জানত এবং সেইজন্যই তাদের এই কমিশনে অসহযোগিতা। সুতরাং ব্রিটিশ প্রভাবান্বিত শান্তি সম্মেলন যে কিং-ক্রেন কমিশনের কোন কথাই মেনে নেবে না—এ কথা সকলেই জানত। শান্তি সম্মেলন ব্রিটেনকেই প্যালেষ্টাইনের ওপর ম্যাণ্ডেট দিল এবং ব্যালফার ঘোষণাকে স্বীকার করে নিল।

প্যালেষ্টাইনের আরব অধিবাসীরা শঙ্কিত হয়ে উঠল। প্যালেষ্টাইনের ওপর ব্রিটেনের ম্যাণ্ডেট রাখার এই আগ্রহের কারণ তারা সহজেই অনুমান করতে পারল। এক দিকে তারা তাদের পশুশক্তি দিয়ে আরব অধিবাসীকে ঠেকিয়ে রাখবে, অন্য দিক দিয়ে তাদের উদার হস্ত দেশ-বিদেশ থেকে ইহুদিদের এনে প্যালেষ্টাইনে বসতি স্থাপন করতে দেবে যতদিন না এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যাগুরুতে পরিণত হয়। অর্থাৎ ব্রিটিশের এই চালবাজির প্রকৃত রূপ হল আরবদের বন্দুক দেখিয়ে আবদ্ধ রাখা এবং ইহুদিদের হাতে অস্ত্র দিয়ে আরব উৎখাতে সাহায্য করা।

সুতরাং আরব-ইহুদি সংঘর্ষ এখন আর ধর্মের নামে লড়াই নয়। ব্রিটিশ-পুষ্ট সম্পূর্ণ এক বিদেশী জাতির কলুষ আক্রমণের বিরুদ্ধে প্যালেষ্টাই-নের অধিবাসীদের মাতৃভূমির স্বাধীনতারক্ষার জন্য সংগ্রাম।

ব্রিটেন এগিয়ে এল ইহুদিদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রাখতে। আরবদের তারা কোনঠাসা করে ইহুদি অনুপ্রবেশ করতে দিল। ফলে আরবদের সঙ্গে বাধল ব্রিটিশের সংঘর্ষ। আরবদের মরণ-পণ সংগ্রামে

ব্রিটিশরা হটে গেল। ব্রিটিশ সরকার আরব বিক্ষোভকে চাপা দেওয়ার জন্য আবার একটি রাজনৈতিক চাল চালল। তারা প্যালেষ্টাইনে হেক্রাফট্ মিশন পাঠাল। উদ্দেশ্য—প্যালেষ্টাইনের সমস্যা কি তা জানা এবং তার সমাধান করা। যেন প্যালেষ্টাইনের সমস্যা ব্রিটিশ সরকার জানে না। ব্রিটিশ সরকার হাঁফ ফেলবার জন্য শুধু একটু সময় চেয়েছিল। তাই হল। হেক্রাফট্ মিশন প্যালেষ্টাইনে এল এবং চলেও গেল, কোন সমাধানের সূত্র খুঁজে পাওয়া গেল না। ইহুদিরা জানাল যে যেমন ইংল্যাণ্ড ইংরেজদের মাতৃভূমি, সেইরকম প্যালেষ্টাইন ইহুদিদের মাতৃভূমি—তার চেয়ে এতটুকু কম কিছু মেনে নিতে তারা সম্মত নয়।

১৯২২ সনে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সচিব ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে এক বিবৃতিতে জানালেন যে, প্যালেষ্টাইন থেকে আরব অধিবাসীদের উৎখাত করা কিংবা তাদের দাবিয়ে রাখা ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছা নয়। এমন কি ব্রিটিশ সরকার সমগ্র প্যালেষ্টাইনকে ইহুদিদের বাসভূমি বলে কখনো ঘোষণা করে নি, প্যালেষ্টাইনের মধ্যে ইহুদিদের বাসভূমি দিতে তারা ইচ্ছুক। কিন্তু এটুকু জানাতেও ভুললেন না যে ব্যালফার ঘোষণা অনুযায়ী ইহুদিরা প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করছে তাদের ন্যায্য অধিকারে এবং প্যালেষ্টাইনের অর্থনৈতিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত ইহুদিদের প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করতে দিতে ব্রিটিশ সরকার সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

কিন্তু কার্যত তা হল না। প্রতিদিন দলে দলে ইহুদি প্যালেষ্টাইনে এসে উপস্থিত হতে লাগল। ইহুদি আগমন নিয়ন্ত্রণের জন্য আরব অধিবাসীরা ব্রিটিশের কাছে আবেদন করল; কিন্তু ব্রিটেন রইল চুপ করে। প্যালেষ্টাইনকে ইহুদি সংখ্যাগুরু রাজ্য করার প্রত্যক্ষ সংযোগে অধৈর্য আরবদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধল ব্রিটিশের।

ভয় পেয়ে ১৯৩০ সনে ব্রিটেনের শ্রমিক দলের প্রধান মন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড একটি ঘোষণা জারি করে জানালেন যে প্যালেষ্টাইনে

ইহুদি বাসভূমি প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ-স্বীকৃতি 'অ-ইহুদিদের' প্রদত্ত আশ্বাসের ওপর অগ্রাধিকার দাবী করতে পারে না। কিন্তু জিয়ন আন্দোলনের নেতারা এই বিবৃতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে ব্রিটিশ সরকারের ওপর এমন চাপ দিলেন যে ব্রিটিশ সরকার এই ঘোষণা প্রায় অস্বীকার করে একটি শ্বেত পত্র প্রকাশ করল।

ইহুদিদের মনোরঞ্জনের জন্য এই শ্বেত পত্র প্রকাশ এবং আরবদের দাবী অস্বীকার করায় আরব-বিক্ষোভ উগ্র আকারে ছড়িয়ে পড়ল। ব্রিটিশ সরকার আবার আর একটা কমিশন পাঠাল। এই কমিশন সব দিক বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, আরব ও ইহুদি জাতীয়তাবাদ এমন পরস্পর বিরোধী যে এই দুটির সমন্বয় কোন রকমেই সম্ভব নয় এবং অভিমত জানাল যে আরব ও ইহুদি বিরোধের মীমাংসা সম্ভব নয়; অতএব প্যালেষ্টাইনকে দুই অংশে ভাগ করে এক অংশে একটি ইহুদি-রাজ্য গঠন করা উচিত।

কমিশনের এই সুপারিশ যেন আরব অধিবাসীদের মধ্যে বোমাবর্ষণ করল। ব্যালফার ঘোষণার সম্বন্ধে তাদের এতদিনকার শঙ্কা এবার সত্য হয়ে দাঁড়াল—এতদিনকার প্রস্তাবিত ইহুদি-বাসভূমি এখন ইহুদি-রাষ্ট্র হতে চলেছে!

আরবরা সমগ্র প্যালেষ্টাইনে সর্বাত্মক হরতাল ঘোষণা করল। দুই মাস ধরে চলল এই হরতাল। সেই সঙ্গে আরব সন্ত্রাসবাদীরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অগ্রসর হল। আরব অধিবাসীদের দমন করতে ব্রিটিশ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে এল। চলল ব্রিটিশের আরবদের ওপর নির্যাতন এবং মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসবাদীদের পাল্টা প্রতিহিংসামূলক আক্রমণ। ব্রিটেন তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও এবং ইহুদিদের সমস্ত সাহায্য পেয়েও আরব-জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করতে সক্ষম হল না।

প্যালেষ্টাইনে ইহুদি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী আরও ব্যাপক হল ১৯৩৩ সনে জার্মানিতে হিটলারের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হতাশ্বাস জার্মান জাতিকে তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের ভেতর থেকে পুনরুজ্জীবিত ও নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য হিটলার চালালেন নানারকম প্রচার। তার মধ্যে সবচেয়ে অমানুষিক হল মধ্যযুগীয় এ্যান্টি-সেমেটিজম্। জার্মান দার্শনিক নিৎসে তখন প্রচার করছেন জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠতা। জার্মান আর্য জাতি, ইহুদিরা অনার্য—সেমেটিক, সুতরাং জার্মান-ইহুদিরা জার্মান জাতির কলঙ্কস্বরূপ। বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, দর্শনে, জার্মানির জাতীয় জীবনে ইহুদিদের প্রতিষ্ঠা খুব উঁচুতে, তাঁদের সমবেত দানে জার্মানি সর্ববিষয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলে স্বীকৃত ; কিন্তু হিটলার দেশের প্রকৃত দুঃখ-দুর্দশার দিক থেকে লোকচক্ষু দূরে নিবদ্ধ করার জন্য সমগ্র দেশের মধ্যে এক ঘৃণ্য ইহুদি-বিদ্বেষ প্রচারে মত্ত হলেন।

জার্মান সরকার ও হিটলার যুবসম্প্রদায় জার্মানিতে ইহুদি নির্যাতনের তাণ্ডবলীলা স্বরু করল। সমস্ত ইহুদি মন্দির ধ্বংস হল, ইহুদিদের কাজকর্ম, ব্যবসাবাণিজ্য নিষিদ্ধ হল এবং তাদের চিহ্নিত করার জন্য জামার হাতায় এক বিশেষ ব্যাণ্ড পরতে বাধ্য করা হল। তাদের ওপর ধার্য হল ইহুদি কর। আর্য-জার্মানদের সঙ্গে তাদের সব রকম মেলামেশা বন্ধ হল।

এই অত্যাচারে ভীত ইহুদিরা জার্মানি ছেড়ে পালাতে স্বরু করল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা কিছু কিছু ইহুদিকে আশ্রয় দিল, কিন্তু তাদের দেশে জায়গা থাকলেও বেশি ইহুদিকে আশ্রয় দিয়ে বিপদে পড়তে চায় না। সুতরাং বাকী সব ইহুদিদের তারা প্যালেষ্টাইনে যেতে উৎসাহিত করল।

প্রতিদিন হাজার হাজার ইহুদি এসে উপস্থিত হতে লাগল প্যালেষ্টাইনে। ব্রিটিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল, আরব অভিযোগ অগ্রাহ্য করল। বিক্ষুব্ধ আরবরা আবার হরতাল করল এবং ইহুদিদের অনুপ্রবেশে বাধা দেওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করল। আরব-ইহুদি সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল।

ব্রিটেন ব্যাপক আরব-বিক্ষোভে ভীত হয়ে পড়েছিল। তারা চাইল ইহুদি আগমন নিয়ন্ত্রিত করতে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত দেশের ইহুদিরা চীৎকার করে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল। প্যালেষ্টাইনে আগমনেচ্ছু ইহুদিরা ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ মানতে প্রস্তুত নয়। নাই বা হল প্যালেষ্টাইনের ভূমি বর্তমানে তাদের, হলই বা তার অধিকারীরা আরব, কিন্তু দুই হাজার বৎসর পূর্বে তো এই দেশ ছিল ইহুদিদের !

তাদের হৃদয় তখন স্পন্দিত হচ্ছে তাদের ধর্মগ্রন্থের অমর বাণীতে :

'জমি বিক্রয় হয় না চিরকালের জন্য, কারণ জমি আমার।

তোমরা প্রবাসী আগন্তুক মাত্র।'

বিশ্বের ধনী ইহুদি সমাজ বুঝতে পারল যে, সংখ্যাগুরু আরবদের কাছ থেকে যদি দেশ ছাড়িয়ে নিতে হয় তবে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধিও যেমন করতে হবে, ঠিক সেইরকম তাদের অনেক বেশি শক্তিশালীও করে তুলতে হবে। তারা জাহাজ বোঝাই করে আধুনিক অস্ত্রে-শস্ত্রে শিক্ষিত ইহুদি পাঠাতে লাগল প্যালেষ্টাইনে, গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে লাগল। সশস্ত্র ইহুদিরা রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে জয়ী ইহুদি-নেতা ম্যাককাবিয়াসের নামানুসারে 'ম্যাককাবি সমিতি' নামে এক সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী দল গঠন করে আরবদের ওপর হানা দিতে সুরু করল। আরববাসীদের মনে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করল তারা। এমন কি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর শিবির পর্যন্ত আক্রমণ করে তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জমা করতে সুরু করল।

১৯৩৯ সনে বাধল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

ব্রিটেন এই সময় আরব-বিরোধ চাইল না। সুতরাং সুকৌশলে তারা প্যালেষ্টাইন-বিভাগ ধামা চাপা দিল। প্যালেষ্টাইনের সমস্যা সমাধানের জন্য তারা এবার একটা গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করল। ইহুদি নেতারা, প্যালেষ্টাইনের এবং অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের আরব নেতারাও

যোগ দিলেন সেই বৈঠকে ; কিন্তু ফলপ্রসূ হল না সেই বৈঠক। ব্রিটেন তখন একতরফা রায় দিয়ে এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করল এবং জানাল যে তারা দশ বছরের মধ্যে প্যালেষ্টাইনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেবে এবং আরব ও ইহুদিদের যুক্ত পরিচালনায় চালিত হবে দেশের শাসন ব্যবস্থা। এই দশ বছরের মধ্যে মাত্র দেড় লক্ষ ইহুদিই প্যালেষ্টাইনে প্রবেশাধিকার লাভ করবে এবং আরবদের জন্য সংরক্ষিত ভূমি ইহুদিদের কাছে বিক্রয় করা চলবে না।

এই শ্বেতপত্র অস্বীকার করল আরব এবং ইহুদি উভয় সম্প্রদায়ই। তবু আরবরা মনে করল যে যদি ব্রিটিশ সত্য সত্যই ইহুদি অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, তবে এই প্রস্তাবটি মন্দের ভাল। কিন্তু ইহুদিরা দেখল যে এই শ্বেতপত্র অনুযায়ী তাদের এতদিনকার স্বপ্ন স্বাধীন স্বতন্ত্র ইহুদি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ভেঙে যাচ্ছে। সুতরাং তারা গায়ের জোরে ইহুদি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হতে লাগল।

এদিকে হিটলারের আদেশে জার্মানির সমস্ত ইহুদিকে বন্দীশিবিরে আবদ্ধ করে তাদের নিধন পর্ব সুরু হল। ষাট লক্ষ ইহুদি জার্মান বিদ্বেষে এই সময়ে নিশ্চিহ্ন হয়। জার্মান অধিকৃত কোন দেশেই তারা ইহুদিদের থাকতে দেয় নি। ইহুদিরা প্রাণভয়ে সব সময়েই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল।

ইহুদিদের ওপর জার্মানদের এই নিষ্ঠুর নির্যাতনের কথা শুনল প্যালেষ্টাইনের ইহুদিরা। এতদিন তারা ব্রিটিশকে তাদের শত্রু মনে করেছিল, কিন্তু এখন তাদের মনে হল জার্মানরা আরও বড় শত্রু। এই জার্মানিকে যুদ্ধে পরাজিত করার জন্য তারা ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মেলায়। এবং দলে দলে ব্রিটিশ বাহিনীতে যোগ দেয়।

মনে মনে অবশ্য অন্য এক উদ্দেশ্য ছিল তাদের।

ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য এই যুদ্ধ তাদের প্রস্তুতি-পর্ব। সামরিক শিক্ষা তাদের প্রয়োজন, আধুনিক সবরকম অস্ত্রশস্ত্রে শিক্ষিত হওয়া তাদের প্রয়োজন, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করা তাদের প্রয়োজন। কারণ তারা

জানত যে এই যুদ্ধ শেষ হলে আবার:যখন প্যালেষ্টাইনে ইহুদি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা উঠবে, তখন সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া তারা তা অর্জন করতে পারবে না। স্বাধীন ইহুদি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেও আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে তাদের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। সেইজন্যই আরবদের চেয়ে উন্নততর রণকৌশল শিক্ষার জন্য তারা আগ্রহী হয়ে উঠল।

তারা নিজেরাই এক ইহুদি-বাহিনী গঠন করে ব্রিটিশের পক্ষে যোগ দিল। ব্রিটিশ তাদের দিল সমরসম্ভার, শেখাল রণনীতি। আর এদিকে তারা গোপনে প্যালেষ্টাইনে আধুনিক অস্ত্রের ঘাঁটি তৈরি করে বিভিন্ন অস্ত্র এনে জমা করতে লাগল। প্যালেষ্টাইনে তারা তৈরি করল দেশরক্ষা-বাহিনী, নিরাপত্তা সমিতি প্রভৃতি। এই অঞ্চলের যাবতীয় ব্রিটিশ অস্ত্র-শস্ত্রের অধিকাংশই তাদের গোপন ঘাঁটিতে পাচার হল।

আরবরা এইখানে ভুল করেছিল।

তারা নিশ্চিন্ত ছিল এই ভেবে যে প্যালেষ্টাইন বিভাগ হবে না। তারা ব্রিটিশের প্রতি বিদ্বেষে ব্রিটিশের পক্ষে যোগ দিল না। ইহুদিরা যে সশস্ত্র সংগ্রাম করে প্যালেষ্টাইন দখল করতে চাইবে—তা তারা কল্পনা করতে পারে নি। বুঝতে পারলে তারাও সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হত; কিন্তু তারা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও নিস্পৃহ হয়ে রইল।

এতদিন জিয়নিষ্ট আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল ব্রিটেন, কারণ প্যালেষ্টাইনের সঙ্গে ব্রিটেনই ছিল প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং এতদিন দুই বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনই ছিল পুরোধা। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধে আমেরিকা জড়িয়ে পড়ামাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলও সরে ব্রিটেন থেকে চলে এল আমেরিকায়।

ব্রিটেনের চেয়েও আমেরিকায় ইহুদিদের শক্তি অনেক বেশি। ইহুদিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল এবং কোন প্রেসিডেন্ট বা সেনেটরই ইহুদি-সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হয়ে নির্বাচনে জয়ের আশা করতে পারেন না—যদি না তিনি অদ্বিতীয় পুরুষ হন। ধনী ইহুদি-সম্প্রদায়ের বিকৃত প্রচারের ফলে আমেরিকার জনসাধারণের এই

বিশ্বাস দাঁড়াল যে নির্যাতিত ইহুদিদের প্যালেষ্টাইনে বাসভূমি দিতে অস্বীকার করে আরবরা এক অমানবিক কাজ করছে।

সত্য ঘটনা কিন্তু জানত আমেরিকার পররাষ্ট্রদপ্তর, আর জানতেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যদিও মনেপ্রাণে ছিলেন ইহুদি আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল কিন্তু তিনি ইহুদিদের স্বার্থের জন্য আরবদের স্বার্থ বলি দেওয়ায় বিন্দুমাত্র উৎসাহী ছিলেন না। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কাছে জিয়নিষ্ট আন্দোলনের নেতারা কোনদিন অন্যায় সমর্থন লাভ করে নি। বারবার তিনি মধ্যপ্রাচ্যের আরব-নেতাদের এই কথাই জানিয়ে এসেছেন যে আরব এবং ইহুদিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করে প্যালেষ্টাইনের বর্তমান অবস্থার কোনরকম পরিবর্তন করা হবে না। ১৯৪৫ সনে সৌদি আরবের রাজা ইবন সৌদ যখন আমেরিকায় গিয়েছিলেন, তখন রুজভেল্ট তাঁকে এই আশ্বাসই দিয়েছিলেন যে প্যালেষ্টাইনের ব্যাপারে আরবদের বিরুদ্ধে কোন ভূমিকাই তিনি গ্রহণ করবেন না এবং আরবদের বিরুদ্ধে ইহুদিদের কোনরকম সাহায্য করবেন না।

মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণের পর প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে আরবজাতির মনোভাব তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন এবং ১৯৪৫ সনে ৩রা মার্চ তিনি বলেছিলেন—"A Jewish State in Palestine can be established and maintained only by military force."

এমন কি মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বেও ৫ই এপ্রিল তিনি ইবন সৌদকে এক ব্যক্তিগত পত্রে প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে তাঁর প্রদত্ত আশ্বাস পুনর্সমর্থন করেন।

কিন্তু হঠাৎ রুজভেল্টের মৃত্যু হল, ভাইস-প্রেসিডেন্ট ট্রুমান হলেন প্রেসিডেন্ট। এবার আরবদের আশাভরসা সমূলে বিনষ্ট হল।

আমেরিকার শাসন-ক্ষমতায় ট্রুমান আসার আগে তিনি এক আমেরিকান ইহুদিকে অংশীদার নিয়ে ব্যবসা করতেন। তখন থেকেই

তিনি পুরোপুরি জিয়নিষ্ট আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। সেনেটর হিসেবেই তিনি যত শীঘ্র সম্ভব ইহুদিদের বাসভূমি গঠনের জন্য একটি প্রস্তাব আমেরিকার সেনেটে আনেন।

আমেরিকার ইহুদি সমাজ ট্রুমান প্রেসিডেন্ট হওয়াতে খুব খুশি হল। এবার তাদের দাবী জোর করে পেশ করার জন্য আমেরিকার জিয়নিষ্ট এমারজেন্সি কাউন্সিল বিশ্ব-ইহুদি সংস্থার প্রেসিডেন্ট ডক্টর চেইম ওয়াইজারমানকে আমেরিকায় আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ডক্টর ওয়াইজারমান এলেন আমেরিকায়।

ডক্টর ওয়াইজারমানের আমেরিকায় উপস্থিতিতে আমেরিকার পররাষ্ট্র দপ্তর প্রমাদ গুনে প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে রুজভেল্টের চিঠিপত্রাদি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রকে তাঁর প্রদত্ত বিভিন্ন আশ্বাস উল্লেখ করে ট্রুমানকে স্পষ্ট জানিয়ে দিল যেন ডক্টর ওয়াইজারমানকে এ বিষয়ে কোনরকম আশ্বাস না দেওয়া হয়, কারণ তাতে আমেরিকার অনুসৃত নীতি বিঘ্নিত হবে। কিন্তু সব জেনে শুনে ট্রুমান ওয়াইজারমানের সঙ্গে দেখা করে প্যালেষ্টাইনে ইহুদি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর সমর্থন জ্ঞাপন করলেন।

ডক্টর ওয়াইজারমানের :হঠাৎ আমেরিকায় উপস্থিতিতে শঙ্কিত হয়ে মিশরের প্রধান মন্ত্রী ট্রুমানকে চিঠি লিখে জানালেন যে, তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না কেন মাত্র দশ লক্ষ আরব অধ্যুষিত প্যালেষ্টাইনের মত ছোট এক জায়গায় বাইরের থেকে পাঁচ লক্ষ ইহুদি আমদানি করে সেখানে আরবদের ঘাড়ে বলপূর্বক চাপানোর চেষ্টা চলছে।

তিনি ট্রুমানকে সব শেষে জানালেন ঃ "Now, the guests at the Arab's table are declaring that in any case they are going to bring in large numbers of their kinsmen, take over all of his lands and rule to suit themselves. It is this programme of setting up a Jewish State in which the Arabs will be either reduced to the inferior

status of a minority or else have to leave their homes that arouses their firm determination to resist at all cost."

ট্রুম্যান যে ডক্টর ওয়াইজারমানকে তাঁর সমর্থন জানিয়েছেন, সেকথা উল্লেখ না করে মিশরের প্রধান মন্ত্রীকে উত্তরে আবার আশ্বস্ত করলেন

কিন্তু মনে মনে তিনি স্থির করেই ফেলেছিলেন প্যালেষ্টাইনে ইহুদি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। তাঁর স্মৃতিকথায় তার অনুরণন শোনা যায়। তিনি লিখেছেন ঃ

"It was my belief that world peace would, in the long run, be best served by a solution that would accord justice to the needs and the wants of the Jewish people who had so long been persecuted. ········it was important that some encouragement be given to the Jews.······'

পটসড্যাম সম্মেলনের প্রাক্কালে তিনি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিলকে চিঠি লিখে জানালেন যে প্যালেষ্টাইনে ইহুদি অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণে আমেরিকার জনসাধারণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। সুতরাং,

"I venture to express to you the hope that the British Government may find it possible without delay to lift the restrictions of the white paper on Jewish immigration into Palestine."

কিন্তু ব্রিটেনে যুদ্ধোত্তর নির্বাচনে লেবার পার্টি জয়লাভ করায় প্রধান মন্ত্রী হলেন ক্লেমেণ্ট এটলি। আরবরা শঙ্কিত হয়ে উঠল। একদিকে ট্রুম্যান, অপর দিকে এটলি—তুই সরকারি দলেরই জিয়ন আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি সকলেরই জানা। চার্চিল নিজে জিয়নিষ্ট আন্দোলনের সমর্থক হলেও তাঁর কনজারভেটিভ পার্টি জিয়নিষ্ট আন্দোলনকে কখনো

পুরোপুরি সমর্থন করে নি। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার মাত্র কয় মাস আগেই লেবার পার্টি প্যালেষ্টাইনে ইহুদিদের অনিয়ন্ত্রিত প্রবেশাধিকার সমর্থন করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সেই প্রস্তাবে এক নিষ্ঠুর ফুট নোট যোগ করে : "the Arabs should be encouraged to move out as the Jews moved in."

কিন্তু কার্যতঃ এটলির শ্রমিক সরকার আরবদের সঙ্গে শত্রুতা করতে চাইলেন না। তাঁরা চার্চিল সরকারের অনুসৃত নীতিই মেনে নিয়ে চললেন ; কিন্তু আমেরিকায় ইহুদিদের চাপে ট্রুমান আর স্থির থাকতে পারছিলেন না। তাঁর পররাষ্ট্র দপ্তর তাঁকে আরবদের অসন্তুষ্টিজনক কোন পন্থা গ্রহণ করতে বার বার নিষেধ করা সত্বেও তিনি স্বেচ্ছায় প্যালেষ্টাইনে অনিয়ন্ত্রিত ইহুদি অনুপ্রবেশের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। এই নিয়ে একাধিকবার তিনি এটলির সঙ্গে পত্রালাপ করেন।

বাধ্য হয়ে ব্রিটেনকে একটি ইঙ্গ-মার্কিন যুক্ত অনুসন্ধান কমিটি গঠন করতে হল।

এই সংবাদ পেয়ে আমেরিকার জিয়নিষ্ট এমারজেন্সি কাউন্সিলের যুক্ত সভাপতি স্টিফেন এস. ওয়াইজ ট্রুমানকে একটি আবেদন জানালেন যে যেন অবিলম্বে প্যালেষ্টাইনে এক লক্ষ ইহুদিকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়।

ট্রুমানও এই কথায় সায় দিলেন।

এদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ইঙ্গ আমেরিকান কমিটিও এই রায় দিলেন —অবিলম্বে এক লক্ষ ইহুদিকে প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হোক।

আরব রাষ্ট্রসমূহ আমেরিকার কাছে প্রতিবাদ জানাল : যে দেশে ইহুদি ছিল শতকরা পাঁচজন, এখন সেখানে ইঙ্গ-আমেরিকার কূটচক্রে আরব ও ইহুদির অনুপাত ২ : ১-এ এসে দাঁড়িয়েছে। আবার কেন এক লক্ষ ইহুদিকে প্যালেষ্টাইনে আসার অনুমতি দান? জোর করে আরব-বাসীদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করা ছাড়া আর এর অর্থ কিছুই

হতে পারে না।

ব্রিটেন ব্যাপারটা ভেবে দেখবার জন্য সময় নিল।

এবার ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী আর্নেষ্ট বেভিন একটি অত্যন্ত বড় সত্যকথা উত্থাপন করে ট্রুমানের গূঢ় অভিসন্ধি ফাঁস করে দিলেন।

১২ই জুন এক বক্তৃতায় আর্নেষ্ট বেভিন বললেন—ইহুদিদের প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করতে দেওয়ায় আমেরিকার এত উৎসাহ এই জন্য যেন তারা আমেরিকায় প্রবেশ না করতে পারে।

ভয়ঙ্কর চটে গেলেন ট্রুমান, কিন্তু কথাটা এত বড় সত্য যে প্রতিবাদ করতেও পারলেন না।

ইতিমধ্যে প্রতিদিন হাজার হাজার ইহুদি প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করতে সুরু করেছে। এখন আমেরিকা তাদের সহায়। যুদ্ধের পর ব্রিটেন দ্বিতীয় শ্রেণীর সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আরবদের ভয় দেখিয়ে প্যালেষ্টাইন ত্যাগ করানো এবং ব্রিটিশকে নিজেদের ক্ষমতা দেখানোর জন্য খুন, জখম এবং নানারকম অন্তর্ঘাতী কাজে লিপ্ত হল ইহুদিরা। ১৬ই জুন জর্ডন সীমান্তে আটটি পুল বিধ্বস্ত হল, হায়ফায় দুটি বিরাট বিস্ফোরণে শহরের প্রচুর ক্ষতি হল। পরদিন হায়ফায় ব্রিটিশ সৈন্যদলের সঙ্গে ইহুদিদের প্রচণ্ড লড়াই হল। রেললাইন তুলে ফেলল তারা। ব্রিটিশ অফিসার গুম, আরব পল্লীতে আগুন, আরব অধিবাসী হত্যা, চলন্ত মোটর গাড়ি থেকে ষ্টেনগানের গুলিতে লোক হতাহত। বোমার আঘাতে কিং ডেভিড হোটেলের একটা দিক ভেঙে চুরমার। এমন কি ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষকে চুরি করার ষড়যন্ত্রও আবিষ্কৃত হল।

গঠিত হল একাধিক কমিটি, কমিশন ইত্যাদি, কিন্তু কোন ফল হল না। ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ তারিখে ব্রিটেন স্থির করল ব্যাপারটা তারা রাষ্ট্রসঙ্ঘে উপস্থাপিত করবে।

স্পষ্টবক্তা ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী আর্নেষ্ট বেভিন পার্লামেণ্টে জানালেন যে সমস্ত গণ্ডগোলের মূলে রয়েছে আমেরিকান ইহুদি-সমাজ এবং এই প্যালেষ্টাইন সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব হত যদি না ট্রুমান এক লক্ষ

ইহুদিকে প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করানোর জন্য জোর করতেন।

২রা এপ্রিল, ১৯৪৭।

ব্রিটেন রাষ্ট্রসঙ্ঘকে অনুরোধ করল প্যালেষ্টাইন সমস্যার সমাধান করতে।

১৫ই মে রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্থির করল যে প্যালেষ্টাইনকে দুই অংশে ভাগ করা হবে, জেরুজালেমের কর্তৃত্ব নেবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং প্যালেষ্টাইনের ওপর থেকে ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট তুলে নেওয়া হবে।

ইহুদিরা এই নির্দেশে উল্লসিত হয়ে উঠল, কিন্তু আরবরা প্যালেষ্টাইন বিভাগ মেনে নিতে সম্মত হল না।

প্যালেষ্টাইন বিভাগের পরিকল্পনাতেও কূট-চাতুরীর চরম ধৃষ্টতা দেখা গেল। সংখ্যালঘু এবং ইঙ্গ-আমেরিকান পোষ্য আক্রমণকারী ইহুদিদের দেওয়া হল প্যালেষ্টাইনের উর্বর অঞ্চল, সমুদ্রকূল এবং বিভক্ত প্যালেষ্টাইনের বড় অংশ এবং সংখ্যাগুরু ও আদি বাসিন্দা আরবদের দেওয়া হল অনুর্বর পার্বত্য অঞ্চল এবং বিভক্ত প্যালেষ্টাইনের ক্ষুদ্র অংশ। প্রস্তাবিত ইহুদি অঞ্চলের মধ্যে তখনও পাঁচ লক্ষ আরবের বাস—সেই অঞ্চল কি করে ইহুদিদের অধিকারে যায় তার সদুত্তর আমেরিকা-প্রভাবিত রাষ্ট্রসঙ্ঘ দিতে পারে নি।

২৯শে নভেম্বর, ১৯৪৭।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্যালেষ্টাইন বিভাগের প্রস্তাব অনুমোদিত হল। সেই সঙ্গে ব্রিটেন স্থির করল যে ১৫ই মে, ১৯৪৮ তারিখে তারা প্যালেষ্টাইন ছেড়ে চলে আসবে। সেইদিনই প্যালেষ্টাইনের ওপর তাদের ম্যাণ্ডেট শেষ।

১৪ই মে, ১৯৪৮। অপরাহ্ন।

ব্রিটেনের ম্যাণ্ডেট প্যালেষ্টাইনের ওপর তখনো শেষ হয় নি। রাত বারোটায় শেষ হবে।

ইহুদিরা প্যালেষ্টাইনে তাদের নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র ইজরায়েল-এর প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করল। রাষ্ট্রপতি—ডক্টর চেইম ওয়াইজারমান, প্রধান মন্ত্রী—বেন গুরিয়ন।

সঙ্গে সঙ্গে এই নবজাত ইহুদি ইজরায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিলেন ট্রুমান। বিস্মৃত হলেন কূটনৈতিক ভব্যতা, ভুলে গেলেন তখনো প্যালেষ্টাইনের ওপর ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট শেষ হয় নি, প্যালেষ্টাইন তখনো ব্রিটিশের রক্ষণাধীন। ইহুদি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ তাঁর এতই বেশি।

এবার আরব লীগ ইহুদি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতরণ করার কথা ঘোষণা করল। কিন্তু প্রধান অসুবিধা হয়েছে,—এই রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যে অবিশ্বাস, সন্দেহ, ঈর্ষা ও কলহ এত বেশি যে এদের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কোন কাজ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এই রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধের জন্য পূর্ব-প্রস্তুতি ছিল না। সঙ্ঘবদ্ধ এক সামরিক পরিকল্পনাও তারা রচনা করতে পারে নি।

তার ওপর লেবানন, সৌদি আরব ও ইয়েমেনের সৈন্য বলতে কিছু নেই। জর্ডনের সৈন্যসংখ্যা সবচেয়ে কম, যদিও ব্রিটিশ জেনারেল গ্লাব (গ্লাব পাশা)-এর সুশিক্ষায় এই জর্ডনবাহিনী সবচেয়ে রণপটু—কিন্তু জর্ডন বাহিনীর ব্রিটিশ অফিসারেরা ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ এই যুদ্ধে যোগদান করতে অস্বীকৃত হল।

আরব রাষ্ট্রগুলি ইজরায়েল প্রতিষ্ঠায় বাধা দেবার জন্য সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিল প্যালেষ্টাইনে যেতে। যুদ্ধে যোগ দিল মিশর, ইরাক, সিরিয়া ও ব্রিটিশ অফিসার বর্জিত জর্ডন। এত অসুবিধা সত্ত্বেও উন্নততর রণ-কৌশল এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ইজরায়েল বাহিনী আরব বাহিনীদের সঙ্গে প্রথম দফায় এঁটে উঠতে পারল না কিছুতেই। সর্বত্রই প্রবল পরাজয়, আর পশ্চাদপসরণ।

জর্ডনের আরব লিজিয়ন তাদের রণ-নৈপুণ্যে সকলকে বিস্মিত করে দিল। প্রবল সংগ্রামের পর ইজরায়েলিদের হাত থেকে তারা জেরু-

জালেম ছিনিয়ে নিল। এইবার তাড়া করল ইজরায়েলের রাজধানী তেল আভিভের দিকে। তেল আভিভ-জেরুজালেম পথ জর্ডনের আরব লিজিয়ন অধিকার করল।

মিশর বাহিনী তেল আভিভের কুড়ি মাইলের মধ্যে এসে কামান দাগতে সুরু করেছে। একদিকে জর্ডনের কামান, অপর দিকে মিশরের —রাজধানী যায় যায়।

সিরিয়ার বাহিনীকে ইজরায়েল কোন রকমে রুখতে সক্ষম হল। ইরাক-বাহিনীও বেশিদূর প্রবেশ করতে পারে নি।

কিন্তু মিশর ও জর্ডনের সম্মিলিত চাপ, বিশেষ করে জর্ডনের আরব লিজিয়নকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না ইজরায়েল।

ট্রুমানের সুখস্বপ্ন ভেঙে গেল। কল্পনাই করতে পারেন নি যে আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইজরায়েলিরা এভাবে ঘায়েল হবে। তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ইহুদি-রাষ্ট্র ইজরায়েল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মুখে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের জরুরি অধিবেশন তলব করলেন তিনি। আমেরিকার কাঁদুনিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ নির্দেশ দিল—যুদ্ধ বন্ধ কর।

আরব রাষ্ট্রসমূহ জয়ের মুখে যুদ্ধ বিরতিতে আপত্তি জানাল। এবারে আমেরিকা সাহায্য চাইল বিশ্বের প্রধান প্রধান শক্তির কাছে। সকলে মিলে আরব রাষ্ট্রের ওপর চাপ দিল।

অনিচ্ছায় যুদ্ধ বিরতি হল ১১ই জুন, ১৯৪৮। স্থির হল যে, অন্তর্বর্তী-কালীন সময়ে কেউ আর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে না, অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করবে না এবং বিদেশী কোন রাষ্ট্রই যুদ্ধমান কোন দেশকেই অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে না।

এই চুক্তির প্রতিটি শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালিত হল আরব রাষ্ট্রদের ক্ষেত্রে; কিন্তু প্যালেষ্টাইনে এল ইউরোপীয় দেশ থেকে বিভিন্ন সমর সম্ভার। সম্পূর্ণ এক বিমানবাহিনীও এসে উপস্থিত হল।

হঠাৎ ইজরায়েল যুদ্ধ ঘোষণা করল। তাদের বিমানবাহিনী যথেচ্ছ বোমাবর্ষণ করতে লাগল। আরব রাষ্ট্রেরা এতদিন কোন দেশ থেকে

গোলাবারুদ পায় নি, তারা এবারে আর নতুন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইজরায়েলিদের সঙ্গে পারল না। আরব রাষ্ট্রসমূহ ইজরায়েলিদের এই আক্রমণের সংবাদ জানাল রাষ্ট্রসঙ্ঘে, কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘ এখন নীরব দর্শক। এখন ইউরোপীয় শক্তি জয়লাভ করছে—তাদের কিছু বলার নেই।

আরব বাহিনী পরাজিত হল। কিন্তু আরব লিজিয়ন বীরত্বের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছিল। পুরাতন জেরুজালেম হাজার বোমা বর্ষণেও তারা ছেড়ে চলে আসে নি। প্যালেষ্টাইনের কিছু অংশ তারা তখনও নিজেদের অধিকারে রেখেছিল।

এবার রাষ্ট্রসঙ্ঘ আবার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল ১৮ই জুলাই।

ইজরায়েল তাদের দখলিকৃত ভূমি ছাড়তে সম্মত হল না। রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্যালেষ্টাইন বিভাগের সময় তাদের যে সীমানা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল তারা সেই সীমানার বাইরে অধিকৃত সমস্ত অঞ্চল নিয়ে তাদের ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠন করল। আরবদের জন্য ছেড়ে দিল জর্ডন বাহিনী অধিকৃত প্যালেষ্টাইনের সামান্য এক ভগ্নাংশ মাত্র।

তারপর স্বুরু করল নতুন ইজরায়েলের মধ্যে আরব অধিবাসীদের ওপর নির্যাতন—ঠিক যেভাবে তারা হিটলারের জার্মানিতে নির্যাতিত হয়েছিল। আরববাসীরা প্রাণভয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে লাগল। জর্ডনের রাজা আবদাল্লা তাদের আশ্রয় দিলেন জেরুজালেমের সন্নিহিত জর্ডন রাজ্যে। কিন্তু ইজরায়েল আপত্তি জানাল। ওখানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন চলবে না।

কারণ ?

কারণ জর্ডনের ওই অঞ্চলটুকুর ওপর ইজরায়েলের লোভ।

এবার রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল পাঠালেন কাউণ্ট ফোক বার্নাদোতকে আরব ও ইজরায়েলিদের মধ্যে বিরোধ সালিশীর জন্য। কাউণ্ট বার্নাদোত ছিলেন সুইডেনের রাজার ভাইপো। তিনি তাঁর সহকারী হিসেবে নিলেন আমেরিকান নিগ্রো-নেতা র‍্যালফ বুঞ্চেকে। এঁরা দুজনে ছুটে বেড়ালেন সমগ্র প্যালেষ্টাইনে—যেখানে তখনো

একটু না একটু যুদ্ধ বেধেই আছে। অনেকবারই তাঁরা মৃত্যুর হাত থেকে আশ্চর্যভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন।

কাউন্ট বার্নাদোত এসে সব দেখে শুনে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অভিযোগ জানালেন রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে। ইজরায়েলকে আদেশ দিলেন তখনই তাদের এক তরফা যুদ্ধ বন্ধ করতে, তাদের সীমানা সরিয়ে নিয়ে আসতে এবং আরবদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করতে।

ইজরায়েলিরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল কাউন্ট বার্নাদোতের ওপর। আমেরিকা ও ব্রিটেন যাদের সহায় তাদের কাজের সমালোচনা করতে আসে সামান্য এক সুয়েডিশ—হোন না তিনি সুইডেনের রাজার ভাইপো, হোন না তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্বাচিত মধ্যস্থ। ইজরায়েলিরা তাঁকে আর বুঞ্চেকে হত্যা করা স্থির করল।

এ খবর পেলেন তিনি। কিন্তু তিনি দমলেন না। সন্ত্রাসবাদীদের তিনি ভয় করতেন না, ভয় করতেন সরকারী ষড়যন্ত্রকে। ইজরায়েলে সরকার আর সন্ত্রাসবাদী এই ব্যাপারে এক হল।

তিনি স্থির করলেন যে গ্রীসের রোডস্ দ্বীপে আরব ও ইজরায়েলিদের প্রতিনিধি নিয়ে এই সমস্যার সমাধান করবেন। এই নিরপেক্ষ দেশে রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্যালেষ্টাইন সমস্যার জন্য প্রধান কার্যালয় স্থাপন করল। এই প্রতিনিধি দলকে রোডস দ্বীপে আনবার জন্য তিনি জেরুজালেমে যাওয়া স্থির করলেন। প্রথমে র‍্যালফ বুঞ্চেকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন ভেবেছিলেন, তারপর কি ভেবে বুঞ্চেকে সঙ্গে যেতে নিষেধ করলেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর কাউন্ট বার্নাদোত এসে পৌঁছুলেন জেরুজালেমে। এক কালো রঙের ফরাসী অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তাঁর গাড়ির পিছনের আসনে বসে ইজরায়েলি প্রতিনিধিদের আগমনের প্রতীক্ষা করছেন, এমন সময় তীব্র গতিতে একটি খোলা মোটরগাড়ি ছুটে এল। তার মধ্যে পাঁচটি ইজরায়েলি যুবক স্টেনগান হাতে দাঁড়িয়ে। চকিতের মধ্যে কয়েক শত গুলি ছুটে গেল স্টেনগান থেকে

বার্নাদোতের গাড়ির দিকে। ফরাসী অফিসারটি সেইখানে মারা গেলেন। গুরুতর আহত কাউন্ট বার্নাদোতকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। সেখানে নিয়ে যেতে না যেতেই তিনি মারা গেলেন।

এই আততায়ীরা ছিল ইজরায়েলি সরকার-পুষ্ট 'স্টার্ন গ্যাঙ্গ'-এর লোক। রাষ্ট্রসঙ্ঘ দাবী জানাল যে হত্যাকারীদের ধরে শাস্তি বিধান করতে হবে।

ইজরায়েলি প্রধান মন্ত্রী বেন গুরিয়ন এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং রাষ্ট্রপুঞ্জকে আশ্বাস দিলেন যে হত্যাকারীদের ধরে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।

হত্যাকারীরা ধরা পড়ল। কিন্তু তাদের বিচারালয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় তারা সশস্ত্র পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করে নাকি পালিয়ে যায়, ইজরায়েলি পুলিশ তাদের আর ধরতে পারে না।

সত্য সেলুকস, কি বিচিত্র এই ইজরায়েল!

১১

এখানের কাজ আমার শেষ।

আজ আর একটু আগেই আমি ইরাকের চিত্রশিল্পের প্রতিনিধি মিঃ রসিদের সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট সই করেছি। অন্যান্য কণ্ট্রাক্ট আগেই সই হয়ে গিয়েছিল। আজ সই হল সব শেষ কণ্ট্রাক্ট। এবার দেশের দিকে পাড়ি।

কিন্তু দেশে যাব কি? প্লেনে করে যাওয়ার উপায় নেই। এদেশে এখন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। সমস্ত দেশে এখন জ্বর-জ্বর ভাব। এক দুর্দান্ত উত্তেজনায় দেশ কাঁপছে। সমস্ত আরব রাজ্যেই এই ঘোর।

কেউ কেউ ইতিমধ্যে জোর গুজব ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে—ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গিয়েছে। কিন্তু একথা বোধহয় সত্যি নয়।

ইতিমধ্যে নাজমার একটা টেলিফোন এসেছিল। আমাকে বারবার নিষেধ করে দিয়েছে এখন দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে। আজ সে আসবে এখানে। আমার সঙ্গে তার অনেক কথা আছে।

কথার কি আর শেষ আছে—বিশেষতঃ আমাদের? এই সুদীর্ঘ বাইশ বছর পরে মাত্র একদিনে কতটুকু কথা বলতে পেরেছি? তার পরের চারদিনেই বা নাজমার সঙ্গে কতটুকু দেখা হয়েছে! বন্ধুবান্ধবেরাই তো ঘিরে বসে সারাক্ষণ।

সত্যিই মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা এখন অত্যন্ত গুরুতর। যুদ্ধ না বেঁধে থাকলেও যে-কোন মুহূর্তে যুদ্ধ বাঁধা অস্বাভাবিক নয়। হয়তো এখনই কোথাও যুদ্ধ বেঁধে গিয়েছে।

পর পর ঘটনাগুলো মনে মনে সাজানোর চেষ্টা করলাম। এ এক খেলা—একা একা তাস নিয়ে পেশেন্স খেলার মত। নাজমা কখন আসবে জানি না। ততক্ষণ মনে মনে পেশেন্স খেলে চলি।

২৯শে মে।

দশ বছর পর এই প্রথম মিশর ও ইজরায়েলে সম্মুখ সশস্ত্র সংঘর্ষ। গাজা অঞ্চলে মুখোমুখি দাঁড়ানো মিশর ও ইজরায়েল বাহিনী সামান্য ছুতোয় পরস্পরের প্রতি গুলিবর্ষণ করে। মিশর জানায়—এই পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ইজরায়েল। তাদের সৈন্যবাহিনী গাজার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেই এই অনর্থ বাঁধায়।

মিশর প্রত্যুত্তর দেয়ঃ মিশরের মর্টার আর মেশিনগানের মুখে ইজরায়েলি সৈন্যেরা সরে যায়। নহাল ওজ কিব্বৎজের আকাশ আগুনে লাল হয়ে ওঠে।

৩০শে মে।

এতদিন পর জর্ডন ও মিশরের ভুল বোঝাবুঝির পালা শেষ হল। অনেক আলাপ-আলোচনার পর ইজরায়েলের রণংদেহি মূর্তি দেখে আজ কুবে প্রাসাদে আরব যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নাসের এবং জর্ডনের রাজা হুসেন এক নিরাপত্তা চুক্তিতে স্বাক্ষর দিলেন।

৩১শে মে।

সুয়েজখালে জাহাজ চলাচল আজ থেকে বন্ধ। ইজরায়েলের আক্রমণে ব্রিটেন ও আমেরিকা ইজরায়েলকে জাহাজ-বোঝাই করে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করছে এবং ইজরায়েলের জন্য বিমানছত্রের ব্যবস্থা করছে বলে মিশরের সামরিক কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

একটি মার্কিন বিমানবাহী জাহাজকে বাধা দেওয়া হয়, শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ফলে তাকে সুয়েজ খাল দিয়ে যেতে দেওয়া হয়।

রুশ নৌবাহিনীর ছয়টি হাল্কা রণতরী কৃষ্ণ সাগর থেকে দারদানালেস ও বসফরাস প্রণালীর ভেতর দিয়ে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করে। এর মধ্যে আছে চারটে টর্পেডো বোট। এই প্রণালী তুর্কির অধীনে এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী এই প্রণালীর ভেতর দিয়ে যুদ্ধজাহাজের চলাচলের অনুমতি তুর্কি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিতে হয়। তুর্কি

কর্তৃপক্ষ দশটি সোভিয়েট রণতরীকে এই প্রণালী দিয়ে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে। সুতরাং আশা করা যায় যে আরো চারটে রণতরীও শীঘ্রই ভূমধ্যসাগরে এসে পড়বে।

আমেরিকার ষষ্ঠ নৌবাহিনী এই এলাকায় যেভাবে ঘাঁটি গেড়ে ইজরায়েলের যুদ্ধ-আকাঙ্খাকে উত্তেজিত করছে, তারই পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সোভিয়েট রণতরীর এখানে আগমন।

মস্কো বেতার একটি সাবধান বাণী ঘোষণা করে জানায়; আমেরিকা যদি পশ্চিম এশিয়ায় আক্রমণ চালায় তবে রাশিয়া বাধা দেবে।

ফ্রান্স রাষ্ট্রসঙ্ঘে ব্রিটেন-আমেরিকা-রাশিয়া-ফ্রান্স বৃহৎ শক্তি-চতুষ্টয়ের যে বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাব করেছিল, রাশিয়া সেই বৈঠকে যোগদান করতে অস্বীকার করেছে।

ইরাকী সৈন্যরা সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য বাগদাদ থেকে রওনা হয়েছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট নিয়ে আলোচনা কোন ফলপ্রসূ হয় নি। মিশর স্পষ্ট জানিয়েছে যে আকাবা উপসাগরে ইজরায়েলি জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দিয়ে মিশর তার সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগই শুধু করেছে। আমেরিকার প্রতিনিধি মিশরকে আকাবা উপসাগরের অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান এবং অন্যান্য রাষ্ট্রদের এই বিষয়ে সংযত হওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু আরব-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা আমেরিকার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ইজরায়েলের হিংসাত্মক ও আগ্রাসী মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন। নাইজেরিয়া, ডেনমার্ক ও কুয়োমিণ্টাং-এর প্রতিনিধিরাও আমেরিকাকে সমর্থন করে নি।

১লা জুন।

ওয়াশিংটন থেকে এজেন্সে ফ্রাঁসে প্রেসের সংবাদে প্রকাশঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলি পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবা এবানকে এই আশ্বাস দিয়েছে

যে আমেরিকা ইজরায়েলকে শুধুমাত্র তাদের ষষ্ঠ নৌবাহিনীর থেকেই বিমানছত্রের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে, কারণ বর্তমানে তাদের ভিয়েৎনাম থেকে কোনরকম সৈন্য অপসারণ করা সম্ভব নয়।

৩রা জুন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন ছুটে এসেছেন ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে পরামর্শ করতে। তাঁরা চার ঘণ্টা ধরে আলাপ করেন। এই আলোচনার পর উইলসন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন: আকাবা উপসাগরের অবরোধ মুক্ত করতে না পারলে পশ্চিম এশিয়ায় শুধু স্থানীয় যুদ্ধ নয়, আরও বেশ বড় রকমের যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে।

ফ্রান্স পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে জোর করে আকাবা অবরোধ মুক্ত করার প্রস্তাবে ফ্রান্সের সম্মতি নেই।

আজ নিরাপত্তা পরিষদে ইজরায়েলের প্রতিনিধি ঘোষণা করেন যে তিরান প্রণালী ও আকাবা উপসাগর অবরুদ্ধ করে আরবরা আক্রমণাত্মক পথ গ্রহণ করেছেন। এই অবরোধ সম্বন্ধে ইজরায়েলের মনোভাব সুস্পষ্ট; আকাবা উপসাগর দিয়ে ইজরায়েলি জাহাজের অবাধ যাতায়াতের অধিকার ছাড়া আর কিছুই তাদের গ্রহণযোগ্য নয়।

আরো তিনটি সোভিয়েট ডেষ্ট্রয়ার বসফরাস প্রণালী অতিক্রম করে ভূমধ্যসাগরে এসে পেঁৗছোয়।

আজ ৪ঠা জুন।

পুরাতন জেরুজালেম নগরী, জর্ডন নদী বরাবর জর্ডনরাজ্য ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী পার্বত্য অঞ্চল দখল করে একটি রাজ্য গড়ে তোলার লোভে উন্মাদ ইজরায়েল তার কূটচক্রী পাশ্চাত্য শক্তি আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাহায্যে মধ্যপ্রাচ্যে যে সঙ্কট কয়মাস ধরে গড়ে

তুলেছে, আজ তার এমন অবস্থা যে সামান্য অজুহাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাওয়া অসম্ভব নয়।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ-থান্টের রাষ্ট্রসঙ্ঘ সৈন্যবাহিনী অপসারণ করার আদেশই এই সঙ্কটের কারণ বলে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ তাঁর ওপর দোষারোপ করছে। কি কি কারণে মিশর-ইজরায়েল সীমান্ত থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জ জরুরী-বাহিনী প্রত্যাহার করে আনা হয় রাষ্ট্রসঙ্ঘ সে সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই বিবৃতির কারণ দেখিয়ে বিবৃতিতে জানানো হয়, "এই ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী উভয়ক্ষেত্রের কোন কোন মহলে ব্যাপক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে মনে হয়।" এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে আমেরিকা ও ব্রিটেন —সমস্ত অপরাধ রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং আরব রাষ্ট্রগুলির ঘাড়ে চাপিয়ে প্রকৃত অপরাধী ইজরায়েলকে অসহায় নিরপরাধ এক দর্শকের ভূমিকায় রাখার হীন প্রচেষ্টা। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই বিবৃতি আমেরিকা ও ব্রিটেনের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি, কারণ তবে প্রকৃত অপরাধী চিহ্নিত হয়ে পড়বে।

এদিকে আকাবা উপসাগরের অবরোধ ভাঙার জন্য আমেরিকা ও ব্রিটেনের সমস্ত চেষ্টা আপাতত ব্যর্থ হয়েছে। আমেরিকার ষষ্ঠ নৌবাহিনী আরব রাষ্ট্রগুলিকে ভীতি-প্রদর্শনের জন্য ভূমধ্যসাগরের পূর্বসীমানায় টহল দিচ্ছে। ব্রিটেনও পিছিয়ে নেই। ব্রিটেনও হঠাৎ এডেনে বারোটি যুদ্ধজাহাজ এনে উপস্থিত করেছে। এর মধ্যে আছে একটি বিমানবাহী জাহাজ। রাশিয়া নিয়ে এসেছে তার নয়টি যুদ্ধ-জাহাজ।

এই সঙ্কটকে ঘনীভূত করার উদ্দেশ্যে একটি জাহাজ কোন দেশের পতাকা না তুলে চুপিচুপি তিরান প্রণালী অতিক্রম করার চেষ্টা করে কিন্তু মিশর বাধা দিলে সেটি দ্রুত ছুটে পালিয়ে যায়। নিরপেক্ষ দলের অভিমত এই যে, এই জাহাজটি আমেরিকার—তিরান প্রণালী কি রকম সুরক্ষিত তাই দেখার উদ্দেশ্যেই ওই জাহাজের সেটি

পরিদর্শন সফর।

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন এই সম্বন্ধে আমেরিকা ও ক্যানাডায় আলাপ-আলোচনা করে ফিরেছেন—সমস্যার সমাধানের কোন সূত্র আবিষ্কৃত হয় নি।

প্রেসিডেণ্ট নাসের আজ ঘোষণা করেছেন: পৃথিবীর নৌশক্তিগুলি যদি আকাবা সম্পর্কে কোন ঘোষণা করেন, তবে আমরা তা মেনে নেব না—বরং এইটুকুই ধরে নেব যে তা যুদ্ধের ভূমিকা এবং সেইভাবেই আমরা অগ্রসর হব। তিনি আরো বলেছেন: ইজরায়েলের সঙ্গে সহাবস্থান আরবরাষ্ট্রগুলি কোনদিনই মেনে নেবে না। আমরা এক বছর বা দশ বছরও অপেক্ষা করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য এক—আরব-অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

নাজমা এসে পড়ল।

বলল—ইন্দ্র, আজ আমার বসবার বেশি সময় নেই। তোমাকে শুধু একটা কথা বলব বলে এসেছি। তোমাকে তো সেদিনই বলেছি যে আমি জেরুজালেমে বেশি দিন থাকতে পারি নি। ইহুদি সন্ত্রাসবাদী হাগানা আর ম্যাককাবি দল তুটোর কয়েকটি ষড়যন্ত্র ফাঁস এবং ষড়যন্ত্রের নেতা য়োসেফ বেলোক্লিফের মুখোশ খুলে দেওয়ার পর তাদের দৃষ্টি পড়ল আমার ওপর। হয়তো আমি আড়ালে থেকেই তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে পারতাম—যে রকম এর আগে করেছি তুমি আসার আগেই—কিন্তু তুমি এসে পড়ার পরই আমি চিহ্নিত হয়ে গেলাম। কি ছেলেমানুষ ছিলাম তুজনে—এত বিপদ, তবুও তুজনে একসঙ্গে না ঘুরে বেড়ালে, না গল্প করতে পারলে চলত না।

একটু থেমে আবার বলতে লাগল—তারপর ইজরায়েল পত্তন হল, এবার স্বাধীন রাষ্ট্র ইজরায়েল—তার হাগানা, ম্যাককাবি আর শিনবেট দল নিয়ে আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি

নতুন জেরুজালেম থেকে পালিয়ে অনেক দিনই পুরাতন জেরুজালেমে এসে উঠেছি। সেখানেও তারা হানা দিতে সুরু করল। একদিন জর্ডন রাজ্যের সীমান্তে সেখ আহম্মদ গ্রামে ইজরায়েলি দলের সঙ্গে আমাদের দলের ভীষণ সংঘর্ষ হল। আমাদের দলের একটি মেয়ে মারা গেল সেই লড়াইয়ে। বোমার আঘাতে তার মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমার পোশাক তাকে পরিয়ে আমি পালাই। হাগানা দলের ধারণা হল, আমি মারা গেছি। তারা আমার নাম তাদের খাতা থেকে কেটে দিল।

চলে এলাম নিজের দেশে। মিশরে। কিছুদিন রইলাম চুপচাপ করে। ভেবেছিলাম, এ সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাব তোমার কাছে কিন্তু মিশরেও শিনবেট দলের কার্যকলাপ বেড়ে উঠল। রক্তে আবার অনুভব করলাম বিগত দিনের উত্তেজনা। এদের সঙ্গে আমার লড়াই এখনও শেষ হয় নি। আবার সংগ্রহ করতে লাগলাম লোকজন, সমস্ত আরবদেশ ঘুরে আবার গঠন করলাম একটি দল। আবার সুরু হল ইজরায়েলের শয়তানির বিরুদ্ধে আমার বে-সরকারী লড়াই।

প্রথমে ঘাঁটি পাতলাম বাগদাদে। সেখান থেকে চলে এলাম দামাস্কাস। কিন্তু কার্যকলাপ চলল জর্ডন, মিশর, প্যালেষ্টাইন ও জেরুজালেম ঘিরে। সমস্ত সংবাদ এসে সংগৃহীত হত বেইরুতে। আমি থাকতাম আড়ালে। ইরাকে ছিলাম এক আমেরিকান মহিলা হিসাবে। সিরিয়ায় এলাম মিসেস্ শেরমানি হয়ে, এক সিরিয়াবাসীর আমেরিকান স্ত্রী। হঠাৎ শিনবেটের তৎপরতায় বেইরুতে আমার দলের কয়েকজন মারা গেল এবং নিরুদ্দেশও হল। বাধ্য হয়ে আমায় এখানে আসতে হল। ইতিমধ্যে সইদা এসে জুটেছে আমার দলে। তার কাছ থেকে কিছু কিছু খবর পাই। তার কিছুদিন ধরেই ধারণা হয়েছিল যে শিনবেটের দল তার ওপর লক্ষ্য রাখছে, কিন্তু সে নিজে শিনবেটের লোক হয়েও জানত না এখানে শিনবেটের নেতা কে?

হঠাৎ আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল—

সইদাকে কে হত্যা করেছিল জান ?

বললাম—না।

হেসে বলল—তোমার আবু সাহেব। আবু জাকারিয়া।

প্রায় চীৎকার করে উঠলাম—না-না—! এ কি বলছ ?

নাজমা বলল—ঠিকই বলছি ইন্দ্র। যে পার্শেল সইদার নামে এসেছিল—তা সত্যিই ডাকে এসেছিল কি না জানা নেই—সেটা আবু সইদাকে দেয়। যখনই হোক সইদা সেটা খুলবেই, এবং যা হবার তা হবেই। ওই কফি হাউসের এক বয় আমাকে জানিয়েছে—সে আমার দলেরই লোক—সইদা ওখানেই পার্শেল খুলে দেখতে চায়, কিন্তু আবু তাকে প্রায় জোর করে কফি হাউসের বাইরে নিয়ে যায়। সইদার মৃত্যু-সংবাদ যখন শুনলাম তখন সম্পূর্ণ ঘটনা না জেনে আমি তাই আবুকে দেখতে চাই নি। আমি আবুর ওপর লক্ষ্য রাখার জন্যই একজনকে কফি হাউসে বয় হিসেবে রেখেছিলাম। তার কাছ থেকে সব ঘটনা শুনে তাই পরদিন তোমাকে নিয়ে গেলাম কফি হাউসে। তুমি বোকা—তুমি আমাকেই চিনতে পার নি, চিনবে আবুকে ? আবুও আমাদের চিনতে পেরেছিল বলে মনে হল না। তাইতো তার সামনে আমি জানিয়ে দিলাম যে তুমি ১৯৪৫ সালে ছিলে জেরুজালেমে। আমি তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। তার চোখে শঙ্কিত দৃষ্টি। বুঝে উঠতে পারছে না, তুমি তাকে চিনতে পেরেছ কি না। কিন্তু তোমার বোকা চোখ দেখে ও স্পষ্ট বুঝতে পারল যে তুমি তাকে চিনে উঠতে পার নি। তাই একটু নিশ্চিন্ত হয়েই জানাল যে, ও কোনদিন জেরুজালেমে যায় নি।

—কিন্তু কে ওই আবু সাহেব ?—প্রশ্ন করলাম।

উঠে চলে যেতে যেতে বলল নাজমা—এখন চলি, আবার আসব।

জিজ্ঞাসা করলাম—বললে না, কে এই আবু জাকারিয়া ?

নাজমা উত্তর দিল—আবু জাকারিয়া হয়েছে য়োসেফ বেলোক্লিফ।

১২

নাজমার কথা মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল, একটা নিদারুণ অস্বস্তির মত মনকে ঘিরে:ধরল। কিছুতেই কথাটা ভুলতে পারছিলাম না।

আবু জাকারিয়া হয়েছে য়োসেফ বেলোক্লিফ! এই নিরীহ, শান্ত, বৃদ্ধ কফি হাউসের মালিক আবু সাহেব? যাঁর বদান্যতায়, নিঃস্বার্থ উপকারে ও মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ ও নির্বিচার ভক্ত?

নাজমার কথা বলার ধরনই এই রকম। আজও বদলাল না। সব সময়েই চমকিয়ে দিতে চায়। নাজমাকে বোঝা দায়।

নর্মাকেও বুঝতে পারি নি।

রহস্যময়ী যুবতী।

নর্মার হৃদয় জয় করে পরদিন যখন সকাল বেলায় বিজয়ী বীরের মত হাজির হলাম নর্মার ক্লাবে, সে তখন বেলসনের অফিস ঘরে বসে গল্প করছে। আমাকে দেখেই তার মুখ ঝলমল করে উঠল।

একেবারে ছেলেমানুষের মত চীৎকার করে উঠে বেলসনকে বলল—জান, ডিক! সেন তোমার এক মস্ত ভক্ত হয়ে উঠেছে। সকাল হতে না হতেই তোমাকে দেখবার জন্য ছুটে এসেছে।

বেলসন উঠে এসে আমার সঙ্গে কর-মর্দন করে আমাকে একটা চেয়ারে বসতে দিয়ে বললেন—তাইতো দেখছি। আজ আর আপনি ছবি তুলতে গেলেন না?

জানালাম—এ দিককার সব কাজ শেষ। বাকী রয়েছে শুধু ডেড্ সীতে গিয়ে একবার ছবি তোলা। একা একা অতদূর যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। একটি সঙ্গী পাওয়ার আশায় আছি।

নর্মা বলে উঠল—সঙ্গীর অভাব কি? আপত্তি না হলে আমিই যেতে পারি।

বেলসন বাধা দিয়ে বললেন—না, না। ডেড্ সী যাওয়ার পথ খুব খারাপ। পাহাড়ী রাস্তা। ওই পাহাড়ে লুকিয়ে বসে থাকে আরবরা, কাউকে দেখলেই খুন জখম করে সব ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। ওখানে যাওয়া উচিত নয়।

বললাম—শুনেছি, চমৎকার দৃশ্য। একবার দেখলে বার বার দেখতে ইচ্ছা হয়।—

বেলসন অধৈর্যের মত বাধা দিয়ে বললেন—সব সত্যি, কিন্তু যদি কেউ প্রাণে বেঁচে থাকে। ডেড্ সী দেখতে সবচেয়ে ভাল হচ্ছে পূর্ণিমার রাত, কিন্তু তখন তো আর আপনার ছবি তোলা যাবে না। তা ছাড়া অনেক দূরের পথ। আগে লোকজন যেত, বিশেষ করে ইউরোপিয়ানরা। এখন প্রাণের ভয়ে কেউ যায় না। ডেড্ সী ইজ ডেড্ নাউ।

আমি চুপ করে বসে রইলাম।

বেলসন আবার বললেন—কাজ শেষ হয়ে গেলে আপনার তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যাওয়া উচিত। প্যালেষ্টাইনের অবস্থা এখন মোটেই ভাল নয়। আরব আর ইহুদি দু-দলই মারামারি করছে। মাঝ থেকে মরছে ইংরেজরা। এর জন্য দায়ী আরবরাই বেশি। শোনা যাচ্ছে যে আরবরা শীগ্‌গিরই সশস্ত্র বিদ্রোহ করবে।

সঙ্গে সঙ্গে নর্মা বলে উঠল—জান ডিক, তুমি ঠিক বলেছ। সেদিন রাতে যখন সেন পথ হারিয়ে ফেলেছিল তখন ও একদল লোককে লুকিয়ে গাড়ি বোঝাই করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেতে দেখে।

বেলসন চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন—এতদিন বলেন নি কেন? দিস্ মাষ্ট বি স্টপ্‌ড। পুলিশ করছে কি বুঝতে পারি না। আমি আজই কর্নেল হাণ্টারকে এ কথা জানাব।

উত্তেজিত হয়ে ঘরময় পায়চারি করতে করতে হঠাৎ আমার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—কোথায় দেখেছেন বলুন তো? আপনি ঠিক দেখেছেন যে ওগুলো অস্ত্র?

সেদিনকার সব কথা খুলে বললাম।

তিনি চেয়ারে বসে পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

হঠাৎ বললেন—কাউকে এ কথা না জানিয়ে একদিক দিয়ে ভালই করেছেন। যারা এই অস্ত্র গোপনে আমদানি করছে তারা এ কথা জানতে পারলে আপনাকে জ্যান্ত রাখবে না। আপনি কাউকে কিছু আর জানাবেন না—এমন কি পুলিশকেও না। আপনার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। তার চেয়ে বরং আমি পুলিশকে বলে এর ব্যবস্থা করব। আপনি জানেন কি ওরা কোথায় ওই অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে, কিংবা ওদের দেখতে কি রকম?

জানালাম—এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

তিনি বললেন—ঠিক আছে। আপনি বরং বিপদে পড়ার আগেই দেশে চলে যান। ডেড্ সী-র কথা এখন ভুলে যান। নিজে বাঁচলে বাপের নাম।

নর্মা বলে উঠল—সেন এখন যাবে কি? আমাদের এনগেজমেণ্টের পর ও যাবে।

আমি একেবারে চমকে উঠলাম। নর্মার এনগেজমেণ্ট! বেলসনের সঙ্গে? আর মাত্র গতকালই নর্মা আমাকে—

একটা আঙটি বের করে নর্মা আমাকে দেখিয়ে বলল—কেমন হয়েছে বল তো? বেলসন এই এনগেজমেণ্ট রিঙ কিনেছে।

আমার চোখের সামনে থেকে পৃথিবীটা তখন সরে যাচ্ছে। ঝাপসা অন্ধকার ছাড়া আর আমি চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

কোন রকমে বললাম—চমৎকার।

উঠে পড়লাম। কিন্তু ততক্ষণে কফি এসেছে। বাধ্য হয়ে আবার বসতে হল। কফি মুখে নিতে ইচ্ছা করছিল না। ছেলে-ধরা নর্মার মুখের দিকে তাকাতেও ইচ্ছা হচ্ছিল না। কফির কাপ মুখে তুলেই নামিয়ে রাখলাম।

নর্মা বলল—কি হল? খুব ভাল কফি। পারপল মোয়াব ক্লাবের

টার্কিশ কফি একটা স্পেশালিটি।

বেলসন সায় দিলেন—ট্রু। সেন বোধহয় কফিতে অভ্যস্ত নয়।

কোন রকমে কফি শেষ করে দুজনকে ধন্যবাদ আর অভিনন্দন জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আর এখানে থাকার কোন অর্থ হয় না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশের পথে পা বাড়ানোর চেষ্টা করা দরকার। ডেড্ সী-র ছবি তোলা দরকার। পথ যদি এত বিপদসঙ্কুল হয় তো পুলিশের সাহায্য নেওয়া ভাল। সেদিনের বোমার কৃপায় পুলিশ মহলে আলাপও হয়েছে, খাতিরও আছে।

থানার পথ ধরলাম, যদি ওদের সাহায্য পাই।

দলকে দলই হাজির ছিল থানায়—কার্কপ্যাট্রিক, লেনার্ড, মিলস আর ডিগবি।

কার্কপ্যাট্রিক আমাকে দেখেই চীৎকার করে উঠল—কি খবর সেন? কার নামে নালিশ? যদি মিঃ বেলসনকে গ্রেফতার করতে বল তো এখনি হাজতে পুরি, তারপর তোমার সঙ্গে আমার না হয় বোঝাপড়া হবে।

ডিগ্‌বি তার জায়গা থেকে উঠে এসে বলল—উঁহু, তা হবে না। নেক্সট্ চান্স ইজ মাইন।

কার্কপ্যাট্রিক উঠে দাঁড়িয়ে অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলে উঠল—দাও, ট্‌-উ ব্রুটাস।

সঙ্গে সঙ্গে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডিগবির ওপর। হাতাহাতি হল কিছুক্ষণ, তারপর ডিগবিকে বগলদাবা করে এনে সকলের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে বলল—আর কার হিম্মৎ আছে কার্কপ্যাট্রিকের গ্রাস কেড়ে নেয়? সেন, তুমি?

বিষন্ন হাসি হেসে বললাম—না ভাই, বেলসন। এনগেজমেণ্ট পাকা, এনগেজমেণ্ট রিং আজ এখনি দেখে এসেছি।

সকলে চুপ করে গেল।

লেনার্ড জিজ্ঞাসা করল—কিন্তু তুমি এখন কি মনে করে?

ডেড সী যাওয়ার কথা, তার বিপদ এবং পুলিশের সাহায্য—সবই বুঝিয়ে বললাম।

ডিগবি বলল—যদি যাবেই স্থির করে থাক তো আমাদের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কিন্তু না গেলেই ভাল করতে। পথ সত্যিই ভাল না। তা ছাড়া কি জান—উই আর এক্সপেক্টিং ট্রাবল এনি মোমেণ্ট।

কার্কপ্যাট্রিক বলল—আচ্ছা সেন, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। তুমি ঠিক এই সময়ে জেরুজালেমে এসেছ কেন?

অবাক হয়ে বললাম—কেন? ছবি তুলতে—

কার্কপ্যাট্রিক উত্তর দিল—হয়তো সত্যি। তোমাকে বন্ধুর মত দেখি বলেই এই কথাটা বলছি—সাবধানে থেক। এদেশের গোলমালে মাথা গলিও না।

আমি বলে উঠলাম—কিন্তু এ কথা উঠছে কেন?

মিলস বলল—আমাদের সংবাদ এই যে, বাইরে থেকে এদেশে কেউ এসেছে এখানে গোলমাল বাঁধাতে। সে লোকটি কে বা কোন্ দলের—বলতে পারছি না। কি গোলমাল বাঁধবে—তা-ও জানি না। সুতরাং নতুন লোকের ওপর আমরা দৃষ্টি রাখছি এবং তোমার ওপরও তাই আমাদের দৃষ্টি আছে।

আমি হেসে উঠলাম। বললাম—ভাল কথা। টেররিষ্ট লীডার!

লেনার্ড বলল—হাসির কথা নয়, সেন। তুমি সেদিন রাত্রে কোথায় ছিলে?

বললাম—বলেছি তো পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম।

ডিগবি বলল—অথচ আর একটু আগে আমাদের কাছে সংবাদ এসেছে যে তুমি কোন গুপ্তসমিতির সভায় ছিলে।

আমি চুপ করে গেলাম।

কার্কপ্যাট্রিক বলল—অবশ্য আমরা সে কথা বিশ্বাস করি না এবং করি নি। সেন, মুস্কিল হয়েছে কি জান? আমরা কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। এখানে লোক অত্যন্ত বেশি, অথচ আমরা এখানে সামান্য

কয়জন পুলিশ। আমাদের গুপ্তচর কিছু আছে, কিন্তু তাদের ওপরও বিশ্বাস রাখা যায় না। দেশের জন্য, জাতির জন্য তারা ধাপ্পা দিতে পারে। এ জায়গাটা হয়েছে তীর্থস্থান—ইহুদি এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই। দুই সম্প্রদায়ের লোকই প্রতিদিন আসছে। এদের মধ্যে কে সত্যকার তীর্থযাত্রী, কে সন্ত্রাসবাদী আমাদের ধরবার উপায় নেই। আমরা এখানে কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে বা বিপক্ষে নই। ব্রিটিশের ম্যাণ্ডেট যতদিন প্যালেষ্টাইনের ওপর আছে, আমরা চেষ্টা করব শান্তি বজায় রাখতে। এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের ওপর হামলা করবে, গুপ্ত হত্যা করবে—এটাই আমরা বন্ধ করতে চাই।

মিলস্ বলল—সম্প্রতি যা খবর পেয়েছি—খুব গোপন ব্যাপার এটা—তা হয়েছে ইহুদি সন্ত্রাসবাদী হাগানা দলের এক নেতা জেরুজালেমে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের চেষ্টা করছে। লোকটির চেহারা কিরকম আমরা জানি না, কি নামে কি ছদ্মবেশে এখানে আছে আমরা জানি না। সেই সঙ্গে এই সংবাদ পেয়েছি যে এখানে তিন চার জন নতুন লোক এসে উপস্থিত হয়েছে। এক নম্বর তুমি, দুই নম্বর হুবের বলে এক জার্মান ঐতিহাসিক, তিন নম্বর ফিরদোস গজনবী বলে এক তীর্থযাত্রী, যে এখানেই বসবাস করবে বলে স্থির করেছে মনে হয়। চার নম্বর বিল টিমোথি নামে এক ক্যানাডিয়ান সাংবাদিক।

লেনার্ড যোগ দিল—আর এদিকে জর্ডনের কাছে একটা আরব গোলমালের আশঙ্কাও শোনা যাচ্ছে।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম—আমি কি করতে পারি?

কার্কপ্যাট্রিক বলল—তুমি অনেক কিছু করতে পার। কোন গোলমালের মধ্যে না গেলেই আমাদের অনেক উপকার করা হবে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—উপদেশের জন্য ধন্যবাদ।

এমন সময় টেলিফোন ঝনঝন করে বেজে উঠল। মিলস্ টেলিফোনে কি যেন কথা বলল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল—সেন, তুমি

এখন যেতে পারবে না। স্পেশাল অর্ডার এসেছে, ইউ আর আণ্ডার এ্যারেষ্ট। সকলেই চমকে উঠল ভীষণভাবে, আমিও। মুহ্যমানের মত চেয়ারে বসে পড়লাম।

মিলস্ জিজ্ঞাসা করল—তোমার জামিন কেউ আছে? জামিন দিলে আপাতত ছেড়ে দিতে পারি।

কোন কথা বলতে ইচ্ছা করল না। চুপ করে রইলাম।

অন্য সকলে মিলস্‌কে চেপে ধরে ফিসফিস করে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগল। কি কথা তারা বলছিল বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু আমি যে তাদের লক্ষ্য একথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না। মিলসে্র একটা কথাই শুধু শুনতে পেলাম—'সুপিরিয়র অফিসার।'

হঠাৎ একটা ট্যাক্সি এসে থামল। পর মুহূর্তেই উপস্থিত হল নর্মা।

সকলে একই সঙ্গে চীৎকার করে উঠল—আসুন মিস্ টার্নার।

নর্মা আমাকে দেখে বলে উঠল—সেন, তুমি এখানে কি করতে এসেছ?

লেনার্ড বলল—ওকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

নর্মা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। বলল—গ্রেফতার! কেন?

লেনার্ড তাকাল মিলসে্র দিকে। আর সকলে মাথা নীচু করে বসে রইল।

মিলস্ আস্তে আস্তে উত্তর দিল—ষড়যন্ত্র করার জন্য।

ষড়যন্ত্র? কিসের? – সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল নর্মা।

বেলসনের বিয়ে ভাঙার ষড়যন্ত্র—গম্ভীরভাবে উত্তর দিল মিলস্।

এ্যাঁ—চমকে উঠল নর্মা।

আমিও তাকালাম তার দিকে। এতক্ষণে অপর তিন পুলিশ বন্ধুরও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল।

কার্কপ্যাট্রিক বলে উঠল—আমিও তবে সেনের দলে।

এই অবান্তর ছেলেমানুষী বন্ধ করার জন্যই লেনার্ড বলে উঠল—মিস্ টার্নার, এই সব পাগলদের কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না।

সেনের কাছে শুনলাম আপনাদের তুজনের—মানে মিঃ বেলসনের সঙ্গে আপনার এনগেজমেন্ট পাকা। আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

নর্মার মুখে হাসি ফুটে উঠল—ওঃ, সেন বুঝি এই খবর দিতে এখানে ছুটে এসেছিল। আমি ওকে ওর ঘরে খুঁজে ফিরে এলাম। সেন শুধু একটা কথা বলেনি, এনগেজমেণ্টের কথা হয়েছে ঠিকই—পাকা এখনো হয় নি।

মিলস্ বলল—সেন এসেছিল পুলিশের সাহায্য নিতে, ডেড্ সী দেখতে যাবে।

তাই নাকি ?—খুশিতে লাফিয়ে উঠল নর্মা।—আমিও ডেড্ সী দেখি নি। দেখার বড় ইচ্ছা। ডিক মানে মিঃ বেলসন বলছিলেন যে রাস্তাটা খুব খারাপ, কিন্তু পূর্ণিমা রাতের ডেড্ সী নাকি স্বপ্নের মত সুন্দর।

লেনার্ড বলল—সত্যিই তাই। কালই তো পূর্ণিমা—যদি দেখতে চান তো আমরা আপনাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

আমি আপত্তি জানালাম। নর্মার সঙ্গে ডেড্ সী দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা আর আমার ছিল না। কিন্তু নর্মার অনুনয়, কার্কপ্যাট্রিকের ভালবাসার রদ্দা, আর তিন পুলিশ বন্ধুর চীৎকারে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হল। পুলিশরা জানাল যে ডেড্ সী যাওয়ার কথা আমরা যেন কাউকে ঘুণাক্ষরে না জানাই, এমন কি বেলসনকেও না। বেলসন ক্লাবের সেক্রেটারি। সে জানতে পারলে বেফাঁসে কখন কাকে বলে ফেলবে, তাতে বিপদের সম্ভাবনা হতে পারে!

নর্মা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা, মিঃ বেলসন আপনাদের আজ সকালে টেলিফোন করেছিলেন কি ?

ডিগবি পাল্টা প্রশ্ন করল—কেন বলুন তো ?

না, এমনিই—একটু থতমত খেয়ে গেল নর্মা। বলল—কি বলেছিলেন তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

সকলে চুপ করে রইল, কোন উত্তর দিল না। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা।

নর্মা এবারে বলেই ফেলল—উনি কি আপনাকে জানিয়েছেন যে সেদিন রাতে সেন কতগুলো লোককে লুকিয়ে অস্ত্র নিয়ে আসতে দেখেছে?

না—সকলে সমস্বরে চীৎকার করে উঠল। তারপর সকলেই একসঙ্গে প্রশ্ন করল আমাকে—সত্যি, সেন? তুমি দেখেছ? কোথায়?

আবার সব কথা প্রথম থেকে বলতে হল।

লেনার্ড বলল—দেখলে সেন, আর একটু আগেই তোমাকে যা বলছিলাম—তুমিই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এবারে কোন খোঁজ পেলে তুমি নির্ভয়ে আমাদের জানিও। আর এদিকে আমরাও খোঁজ করছি।

একটু পরে বিদায় নিয়ে দুজনেই উঠে পড়লাম।

নর্মা একটা ট্যাক্সি ডাকল। দুজনেই উঠলাম, কিন্তু আমি একটিও কথা বলি নি। নর্মা আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ টিপে' হাসতে লাগল।

হঠাৎ আমাকে বলল—একটু চা খাওয়াবে?

চুপ করে রইলাম। নর্মার ছলনা আমার সহ্যের বাইরে চলে গেছে।

একটা রেস্তোরাঁর সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করাল নর্মা।

একটা কেবিনে ঢুকলাম। চা-ও এসে গেল।

নর্মা বলল—খুব যে মেজাজ দেখাচ্ছ। আমি কি করেছি শুনি?

এই নির্লজ্জতায় আর স্থির থাকতে পারলাম না। বললাম—কাল তুমি কেন আমার সঙ্গে এই ছলনা করলে, যখন বেলসনের সঙ্গে তোমার এনগেজমেণ্ট স্থির।

চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে নিষ্পাপ সরল এক মেয়ের মত বলল—এতে ছলনা কোথায় পেলে?

ছলনা নয়?—আমি প্রায় চীৎকার করে উঠি।—তুমি বেলসনের বাগদত্তা, অথচ—

নর্মা হেসে বলে—বেলসনের বাগদত্তা হলে যে তোমাকে ভালবাসতে পারব না—একথা তোমাদের কোন্ শাস্ত্রে বলেছে?

রাগে ফেটে পড়লাম আমি—তুমি আমাকে ভালবাসবে, অথচ বিয়ে করবে না ?

খিল খিল করে হেসে উঠল নর্মা, বলল—এইটুকু বাচ্চা ছেলে ! তোমায় বিয়ে করব কি ? তুমি বিয়ের কি বোঝ ?

তুমিই বা বিয়ের কি বোঝ ?—চীৎকার করে উঠি। রাগে সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠেছিল।

হাসতে হাসতে বলল নর্মা—রাগলে কি সুন্দর দেখায় তোমাকে ! ইচ্ছে হচ্ছে, আবার তোমাকে একটা চুমু খাই। এটা পাব্‌লিক প্লেস—তাই ছেড়ে দিলাম, কিন্তু তোমার পাওনা রইল।

হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে বলল—শোন দুষ্টু ! তুমি বোকা। আবার আমি বলছি, তোমাকে—শুধু তোমাকেই ভালবাসি। বেলসন আমার কেউ নয়, বেলসনের আমি বাগদত্তাও নই। ওর ওই এনগেজমেণ্ট রিং আমার আঙুলে কোনদিন উঠবে না। তুমি যদি আমাকে সত্যি সত্যিই ভালবাস, যদি বিশ্বাস কর—তবে একটু সহ্য করে যাও। বেলসনকে আমার এখন কয়দিন বড় প্রয়োজন। তাই ওর একটু মন রাখবার চেষ্টা করছি।

আমার হাতটা সে চেপে ধরল। আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম, চোখের দিকে তাকালাম। চোখ আর ফিরিয়ে নিতে পারলাম না। কি সুন্দর দেখতে নর্মাকে, আমার নর্মাকে !

একটু ঝুঁকে পড়ে আলগোছে আমার ঠোঁটে ওর ঠোঁট লাগিয়ে নর্মা উঠে পড়ল।

বলল—চল।

গম্ভীরভাবে বললাম—এতে কিন্তু পাওনা মিটল না।

হাসতে হাসতে উত্তর দিল নর্মা—না, এটা তোমার ফাউ।

রাস্তায় বেরিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নর্মা বলল—কাল তবে ডেড্‌ সী। আমি ওদের খবর দিয়ে রাখব। তুমি সন্ধ্যাবেলায় খেয়েদেয়েই থানায় হাজির হয়ো কিন্তু।

বললাম—বেশ, কিন্তু দুপুরবেলায় কি করবে তুমি ?

নর্মা উত্তর দিল—তোমার সঙ্গে গল্প করে কাটালেই তো আমার চলবে না। আমি একটু কাজ করব।

কি কাজ ?—প্রশ্ন করলাম।

ও বাবা !—হেসে উঠল নর্মা—এখনই কৈফিয়ৎ ! তুমি বোঝ না কেন, দুষ্টু, আমি এখানে এসেছি একটা বই লিখতে, তার জন্য ছবি আঁকতে। বেলসনের একটা পেন্সিল স্কেচ করেছি। আমাদের ক্লাবে কয়েকজন নতুন লোক এসেছে—বেশ মজাদার লোক, বেলসনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু—আজ সারা দুপুর বিকেল বসে তাদের ছবি আঁকব। কাল তোমাকে দেখাব।

দেখতে চাই না—বলে ফেললাম।

না দেখলে !—উত্তর দিল নর্মা।—আমাদের ফটো আজ আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেব, বসে বসে তাই দেখ !

আমি ঠিক সন্ধ্যাবেলায় এসে উপস্থিত হয়েছিলাম।

মিলস্ আর ডিগবি ছিল থানায়। তারা জানাল যে পুলিশের গাড়ির ব্যবস্থা হয়ে গেছে, কিন্তু তারা কেউ যেতে পারবে না সঙ্গে। কাল ইহুদিদের পুরিম উৎসব। দলে দলে ইহুদি প্যালেষ্টাইন থেকে এসে উপস্থিত হচ্ছে জেরুজালেমের মিয়া শিয়ারিম পল্লীতে। ওদিকে কেদ্রোন উপত্যকায় আরবদের মেলা। শান্তিরক্ষার প্রশ্ন এখন সবচেয়ে বড়। এই ব্যাপার নিয়ে না আবার আরব-ইহুদি লড়াই বেঁধে যায়। সুতরাং নজর রাখার জন্য তাদের এখন জেরুজালেমে থাকতেই হবে। পুলিশ গাড়িতে ড্রাইভার বাদে দুজন পুলিশ থাকবে ষ্টেনগান নিয়ে, পথে কোন বিপদ হবে না।

নর্মাও এল। ডিগবি আর মিলস্ যেতে পারল না শুনে মুখে খুব দুঃখ প্রকাশ করল বটে, কিন্তু বেশ বুঝতে পারলাম যে মনে মনে খুব খুশিই হয়েছে। নর্মা এসেছেও সুন্দর সেজে। একে অপূর্ব সুন্দরী, তার ওপর

তার এই অপরূপ সাজ—নর্মার দিক থেকে আর চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

পিছনের আসনে আমরা দুজন বসে একেবারে গা ঘেঁষে।

প্রথমে চারদিক অন্ধকার, মোটরগাড়ির আলোয় শুধু পথ আলোকিত হয়ে উঠেছে। তারপর জ্যোৎস্নায় হেসে উঠল সারা দেশ। ধূসর-নীল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ।

নর্মা বলল—দেখ, দেখ—কি সুন্দর চাঁদ!

উত্তর দিলাম—বিরক্ত করো না। আমি আকাশের চাঁদের চেয়েও সুন্দর চাঁদ দেখছি।

অসভ্য!—বলে নর্মা আরো কাছে এসে বসল।

গাড়ি ছুটে চলেছে। জেরুজালেম ছাড়িয়ে গাড়ি ছুটছে। নির্জন পথ। পাথরের টিলা আর টিলা—তার মাঝ দিয়ে লাল ধূলোর এই সরু রাস্তা। গাড়ি হঠাৎ বাঁদিকে ঘুরে পড়ল জেরিকো রোডে। এবার সুরু হবে পাহাড়ী রাস্তা—আমাদের দার্জিলিং বা মুসৌরি যাওয়ার রাস্তার মত। একদিকে উঠে গেছে দু' তিন হাজার ফুট উঁচু পাহাড়, আর একদিকে দু' তিন হাজার ফুট গভীর খাদ। জ্যোৎস্নায় কেমন যেন চারদিক ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ দূরে টিম টিম করে দু' একটা আলো জ্বলতে দেখা গেল। ড্রাইভার আমাদের জানাল যে ওই হয়েছে বেথানি।

এবার নামার পালা। প্রায় তিন হাজার ফুট ওপর থেকে নীচে নামা। রুক্ষ পাহাড় ভেঙে গাড়ি নীচে নামতে সুরু করল। পথ দেখলে ভয় করে। ঘোরানো পথ যেন পাহাড়ের কোল ঘেঁষে যেতে যেতে হঠাৎ এক বিরাট পাথরের সামনে এসে থেমে গেছে, কিন্তু ঠিক সেই জায়গায় আর একটা পথ হঠাৎ যেন মাথা তুলে এসে দাঁড়াচ্ছে। গোলক ধাঁধার মত পথ—সামনের আর পিছনের সামান্য পথটুকু ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না, অথচ পথের শেষ নেই।

একটা মোড়ের মাথায় ছোট একটা হোটেল দেখা গেল। ড্রাইভার জানাল—এটি 'গুড স্যামারিটান ইন', এরপর আর জনবসতি নেই—কি সকাল কি রাত কোন সময় একটি লোকও দেখা যায় না। লোকের দেখা মিলবে আবার 'ডেড্ সী' অঞ্চলে গিয়ে।

এবার গাড়ি আরো তাড়াতাড়ি নীচে নামতে লাগল। মনে হল যেন পাহাড়টার ওপর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে আমরা নীচে পড়ে যাচ্ছি পৃথিবীর গভীর গহ্বরে।

ড্রাইভার একটি ছোট সাদা পাথর দেখাল। বলল—এবার আমরা 'সী লেভেল'-এর নীচে নেমে যাব। 'ডেড্ সী' সী লেভেলের অনেক নীচে মনে হতেই সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সমুদ্র-তলের নীচে আমরা নেমে যাচ্ছি! আর আমাদের মাথার ওপরে পাঁচটি মহাসাগর, অসংখ্য সাগর, উপসাগর তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ মূর্তিতে আছড়ে পড়ছে।

নীচে, আরো নীচে। গাড়ি ঘুরে ঘুরে নামতে লাগল।

হঠাৎ পাহাড় গেল শেষ হয়ে ভোজবাজির মত। চোখের সামনে জ্যোৎস্না-বিধৌত সমতল ভূমি। আর একবার বাঁক ফিরলেই দেখা যাবে ডেড্ সী—ছোট্ট একটা হ্রদের মত। বাঁ দিকে দূরে আকাশের গায়ে মোয়াবের পর্বতমালা ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট।

গাড়ি ডান দিকে বাঁক নিল। বাঁ দিকে জেরিকো যাবার রাস্তা। ডান দিকে ডেড্ সী।

গাড়ি থামল।

আমরা নেমে পড়লাম।

ড্রাইভার বলল—গাড়ি এখানেই অপেক্ষা করবে। আপনাদের কষ্ট করে একটু হেঁটে যেতে হবে। একটা রেস্তোঁরা পাবেন ডেড্ সী-র একেবারে ওপরে।

আমরা দুজনে দুজনের ছোট দুটি ব্যাগ হাতে করে 'ডেড্ সী'র দিকে এগিয়ে চললাম। বাতাসে গন্ধকের তীব্র গন্ধ। প্রথমে অসহ্য মনে হয়, একটুবাদেই সয়ে যায়—ভাল লাগে।

রেস্তোরার বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে দুজনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ডেড্ সী দেখতে লাগলাম।

বয় দিয়ে গেল দু' গেলাস সফ্ট ড্রিংক আর স্যাণ্ডউইচ।

চারদিক নিথর, নিস্পন্দ। শুধু আমি আর নর্মা ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সামনে ডেড্ সী-র কালো-সবুজ জলে জ্যোৎস্না পড়ে এক স্বপ্নময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। পাশে পরীর মত সুন্দরী নর্মা। কথা বলাও যেন এখন পাপ। অথচ কত কথা মনে ভিড় করে আসছে। কত কথা আমি বলতে চাই নর্মাকে। কত কথা আমি নর্মার কাছ থেকে শুনতে চাই।

ডেড্ সী-র দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নর্মাকে দেখতে লাগলাম। কি সুন্দর চোখ, মুখ, নাকের গঠন। কি সুন্দর ওর পাতলা ঠোঁট দুটো। কি গভীর কালো তার ঘন চুলের গোছা! নর্মা ইংরেজ মেয়ে। আমাকে ওর এই ভাল-লাগা—এ কি তার ক্ষণিক মোহ? না, চিরকাল তার থাকবে? ঘুরে ফিরে বেলসনের কথাও মনে জেগে উঠতে লাগল।

হঠাৎ নড়ে উঠল নর্মা।

উঠে দাঁড়িয়ে দুষ্টুমি-ভরা চোখ মেলে বলল—আমি স্নানের জন্য পোশাক বদলে আসছি ওই থামের আড়াল থেকে। খবরদার, উঁকি মেরো না কিন্তু।

আমিও উঠে পড়লাম।

বললাম—চল, আমি পাহারা দিচ্ছি।

কি অসভ্য! -বলেই নর্মা চলে গেল একটু দূরে একটা থামের আড়ালে।

আমিও আমার পোশাক বদলে নিলাম। একটু বাদেই নর্মা এল। হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। কি নিখুঁত তার দেহের গঠন! উদ্ধত যৌবনকে তার এই স্বল্প পোশাক যেন কিছুতেই বেঁধে রাখতে পারছে না।

হাত ধরাধরি করে দুজনে এসে বসলাম সমুদ্রের ধারে। ছোট ছোট ঢেউ বাতাসে কেঁপে কেঁপে এসে পায়ের ওপর আছড়ে পড়ছে। আমি বাঁ হাত দিয়ে হঠাৎ নর্মাকে টেনে বুকের ওপর তুলে নিলাম, ডান হাত দিয়ে তার মুখটা তুলে ধরে ওর পাতলা ঠোঁট দুটিতে প্রচণ্ড আবেগে চুমু খেলাম। নর্মাও তার কোমল দুই হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল এবং একটু দম নিয়ে সমান আবেগে প্রতিদান করল।

বললাম—কালকের পাওনাটা ?

সুদে আসলে দেব—বলে হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরে ফেলে দিল বালির ওপরে। বুকের ওপর শুয়ে তার উত্তপ্ত ঠোঁট দুটো চেপে ধরল আমার ঠোঁটের ওপর। ওর উষ্ণ ঘন ঘন নিঃশ্বাস, ওর নরম উঁচু বুকের দ্রুত উত্থান-পতন, ওর আবেগ-রোমাঞ্চিত দেহের স্পর্শে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় ধীরে ধীরে যেন বিকল হয়ে এল। বিমুগ্ধ দর্শকের মত পড়ে রইলাম বালির ওপর, উপভোগ করলাম প্রতিটি শিরায়-উপশিরায়, রক্ত-কণিকায় তার কামোচ্ছ্বাসের প্রলয় নর্তন।

হাঁপিয়ে আমার পাশেই শুয়ে পড়ল নর্মা। আমি ধীরে ধীরে তার চুলে, মুখে, সর্বদেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। নরম-কঠিন সুডৌল বুকের ওপরে আমার হাত এসে থামাতে নর্মা শিউরে উঠে আরো বুকের কাছে ঘেঁষে এল।

নিজেকে আর সংযত রাখতে পারছিলাম না। হঠাৎ উঠে পড়ে আমি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলাম। নর্মাও জলে নামল। দুজনে অনেকক্ষণ সেই শান্ত সবুজ জলে সাঁতার কাটলাম।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে নর্মা বলল—এবার চল।

বালির ওপরে উঠে নর্মা বলল—এবার আমি পোশাক ছাড়ব। তুমি লক্ষ্মীটি চোখ বুজে আস্তে আস্তে কুড়ি পর্যন্ত গোন তো। আমি তত-ক্ষণে পোশাক বদলে নিই। কিন্তু খবরদার কুড়ি গোনার আগে চোখ খুলতে পারবে না কিছুতেই।

আমি চোখ বুজে খুব তাড়াতাড়ি গুনতে লাগলাম।

নর্মা বলল-উঁহু, অত তাড়াতাড়ি নয়। অত তাড়াতাড়ি করলে পঞ্চাশ পর্যন্ত গুনতে হবে। রেডি—ওয়ান, টু, থ্রি-ই—

আমি দশ পর্যন্ত গুনেই চোখ খুলে ফেললাম। দেখি, নর্মা পোশাক না পাল্টে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

বললাম—তুমি পোশাক বদলাচ্ছ না ?

হ্যাঁ—আর তুমি চোখ খুলে দেখ আর কি !—বলে হেসে উঠল নর্মা। —বললাম পঞ্চাশ পর্যন্ত গুনতে, তা না—দশ না গুনতেই চোখ খুলে দেখা হচ্ছে—

গম্ভীর ভাবে বললাম—আমি দেখছিলাম, তুমি তোমার চুক্তির শর্ত পালন করছ কিনা—

নর্মা দুষ্টু হেসে বলল—তুমি তোমার চুক্তির শর্ত পালন করেছ তো ?

তবে রে—বলে তার দিকে এগিয়ে যেতেই নর্মা চীৎকার করে উঠল—এই ! না-না—

পোশাক পাল্টে দুজনে আবার রেস্তোরাঁতে দুটো চেয়ারে বসলাম। নর্মা জিজ্ঞাসা করল—এটাকে 'ডেড্ সী' কেন বলে জান ?

বললাম—এই সমুদ্রের জলে এত রাসায়নিক লবণ যে মাছ বাঁচতে পারে না, সুতরাং পাখির এখানে আসার লোভ নেই, সাধারণ লোকে মাছও ধরতে আসে না।

নর্মা হঠাৎ খিল খিল করে হেসে বলল—আজ যদি আমাদের সঙ্গে লেনার্ড, মিলস্, ডিগবি আর কার্কপ্যাট্রিক এখানে আসত তো তুমি খুব জব্দ হতে। অসভ্য কোথাকার !

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, ইহুদিদের এই পুরিম উৎসবটা কি ?

নর্মা উত্তর দিল—সে এক গল্প। সেই পুরাকালে পারস্যে এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম আহাসিউয়েরাস। রাণীর নাম এসথার। রাণী ছিলেন ইহুদির মেয়ে। তাঁর বাবা মোর্দেসাই। সেই রাজার যে উজির ছিল

হামান, সে ইহুদিদের দুচোখে দেখতে পারত না। রাজাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এক আদেশ বের করল যে পারস্যের সমস্ত ইহুদিকে একদিন হত্যা করা হবে। লটারি বা পুর—বহুবচনে পুরিম—করে দিন স্থির হল 'আদার' মাসের তের তারিখ। এই ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিলেন রাণী এসথার। রাজা চটে গেলেন উজিরের ওপর। উজিরকে নির্বাসনে পাঠিয়ে মোর্দিসাইকে উজির করলেন। সমস্ত ইহুদি ধনে-প্রাণে বেঁচে গেল। পুরিম হয়েছে ইহুদিদের সেই বিজয়-উৎসব।

আমি নর্মাকে আস্তে আস্তে কাছে টেনে নিয়ে বললাম—নর্মা, আমি তোমার জন্য কি এনেছি দেখ।

পকেট থেকে বের করে আজ সকালের কেনা অল্প দামী একটা আঙটি তার হাতে রাখলাম। আঙটি দেখে খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠে বলল—ও, ইন্দ্র!—

আঙটি আঙুলে পরে নিয়ে নর্মা বলল—কি সুন্দর আঙটি! ইন্দ্র, আজ আমি তোমার বাগদত্তা। কিন্তু—কিন্তু—আমার সব কথা শুনে কি তুমি আমায় নেবে?—

বললাম—কিছু শুনতে চাই না, নর্মা। তোমাকে আমি ঠিক এইভাবে পেলেই খুশি।

তা হয় না—নর্মা উত্তর দিল।—তোমার কাছে আমি কিছু গোপন করব না, তুমি আমাকে তারপরে ভালবাসো বা না বাসো। কিন্তু ইন্দ্র, যদি আমাকে একটুও ভালবেসে থাক, তবে আমার এ গোপন কথা কাউকে জানিও না। শোন ইন্দ্র, আমার নাম নর্মা টার্নার নয়। আমি ইংরেজ নই। আমার নাম নাজমা সরিফুদ্দিন। এই জেরুজালেম আমার দেশ। আমার বাবা ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক। ব্যালফার ঘোষণা নিয়ে যখন খুব গোলমাল, যখন আরবরা প্যালেষ্টাইনে ইহুদি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে দেবে না স্থির করেছিল—বাবা সে সময়ে সেই আন্দোলনে যোগ দেন এবং দেশের নেতা হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশরা তাঁকে নির্বাসন দিল। তিনি প্রথমে চলে গেলেন ফ্রান্স। সেখানে আমার

মা-র সঙ্গে বিয়ে হয়। মা ছিলেন ফরাসী। সেখান থেকে বাবা যান ইংল্যাণ্ডে। আমার জন্ম সেখানেই। ছেলেবেলায় আমার মা মারা যান। বাবার কাছে মানুষ হই। বাবার কাছে শুনি প্যালেষ্টাইনকে ইহুদি-রাষ্ট্রে পরিণত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা, আরবদের সমস্ত আন্দোলনের কথা। গত বছর আমি ইংল্যাণ্ড থেকে যাই আমেরিকায়, উঠি গিয়ে এক আমেরিকান ভদ্রলোকের বাড়িতে। তিনি মিঃ টার্নার। হঠাৎ প্যালেষ্টাইনে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা বাবার ওপর থেকে তুলে নেওয়া হয়। বাবা জেরুজালেমে ফিরে আসার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। আমাকে চিঠি লিখে জানান যে জেরুজালেমে গিয়ে তিনি চিঠি লিখলেই যেন আমি চলে আসি। বাবা এলেন, বাবাকে অভ্যর্থনা করতে কতলোক সেদিন জড় হয়েছিল ; কিন্তু আততায়ীর গুলিতে বাবা সেইদিনই মারা গেলেন। জেরুজালেমে ঢোকা আর হল না, প্যালে-ষ্টাইন সীমান্তেই তাঁর জীবন গেল। আততায়ী ধরা পড়ল না, কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজন ধরা পড়ল। সে শেষ পর্যন্ত জানাল যে তারা ইহুদি হাগানা সন্ত্রাসবাদী দলের সভ্য এবং গুলি ছুঁড়েছিল সেই অঞ্চলের হাগানা দলের নেতা য়োসেফ বেলোক্লিফ নিজে। আমেরি-কায় বসে আমি সব খবর পেলাম। ওইখানেই স্থির করলাম যে প্রতিহিংসা নিতে হবে। সমগ্র ইহুদি জাতির ওপর আমার রাগ বা বিদ্বেষ নয়—শুধু একটি লোক য়োসেফ বেলোক্লিফের মৃত্যুতেই আমার শান্তি। আমি নর্মা টার্নার নাম নিয়ে এলাম জেরুজালেমে, পরিচয় দিলাম ইংরেজ বলে ; কিন্তু জেরুজালেমের আরবদের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় গোপনে দিয়েছিলাম। তারা সকলে আমাকে বুকে তুলে নিল—আমি শরিফুদ্দিনের মেয়ে! আমাকে সাহায্য করতে তারা গোপনে এগিয়ে এল। আরবরাও ইহুদিদের ভয়ে তখন আতঙ্কিত, ইহুদিরা গোপনে কি করছে না করছে তা লক্ষ্য রাখবার জন্য একটি গুপ্তদল গঠন করেছিল। আমি সেই দলে যোগ দিলাম। প্রতিদিন শেষ রাতে মাউণ্ট অব অলিভসের চূড়ায় আমাদের গুপ্ত সভা বসে। আমাদের

পাহারা দেয় পাহাড়ের নীচের উট-চালকেরা। কাউকে আসতে দেখলে সাবধান করে দেয়। সেই জন্যই প্রথম দিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল মাউণ্ট অব অলিভসে। তোমাকে আসতে দেখেই অন্যান্য লোকদের সেই উট-চালকেরা সাবধান করে দেয়। তাই তুমি যখন ওয়েলিং ওয়াল দেখতে চাইলে, তখন আমি তোমার সঙ্গে গেলাম এইজন্য যে আমাকে সঙ্গে দেখলে কোন আরব তোমার কোন ক্ষতি করবে না। গাইড হাফিজ আমাদের দলের লোক। সেদিন হাফি-জের মৃত্যু হল—ইহুদিদের ওই বোমার লক্ষ্য ছিল হাফিজ এবং আমি। বোধ হয় হাফিজ যে গুপ্ত সমিতির সদস্য তা তারা জানত এবং আমি লক্ষ্যের কারণ এইজন্য যে আমি ইংরেজ—ইংরেজদের ওপরও ইহুদিরা খুব খুশি নয়।

একটু দম নিয়ে আবার নর্মা বলতে লাগল—এখন ভেবে দেখ, ইন্দ্র, এর পরেও তুমি আমাকে নেবে কি না। শুধু একটা কথা – যতদিন না য়োসেফ বেলোক্লিফের শাস্তি হয়, ততদিন আমাকে বিয়ে করতে বল না। তারপর যেদিন বলবে, ইন্দ্র, আমি তোমার।—আমি তোমার দেশে যাব, তোমার কাছে থাকব—তোমার স্ত্রী হয়ে। ইন্দ্র,—ইন্দ্র, বল—

একটা স্বপ্নের থেকে জেগে উঠলাম যেন। আশ্চর্য করুণ এক কাহিনী শুনলাম এতক্ষণ।

তাকালাম নর্মার দিকে। উদগ্র উৎসুক দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

চোখের সামনে থেকে কুয়াশার পর্দা আস্তে আস্তে সরে গেল।

বললাম—নর্মা বা নাজমা তুমি যা-ই হও—

বাধা দিয়ে ও বলল—আমি তোমার কাছে শুধু নাজমা, আর নর্মা নয়। আর সকলে আমাকে জানুক নর্মা বলে।

বললাম—বেশ, তুমি আমার নাজমা। নাজমা, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

নাজমা কেঁদে ফেলল ঝর ঝর করে।

চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—এখনো কি ওই য়োসেফ বেলোক্লিফের সন্ধান পাও নি?

নাজমা মাথা নাড়ল।

বললাম—আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

না-না,—ইন্দ্র—বলে উঠল নাজমা।—এ বড় সাঙ্ঘাতিক খেলা। ইন্দ্র, তুমি বিপদের বাইরে থাক। তুমি এর মধ্যে থাকলে আমি পারব না, ভুল করে ফেলব। তোমার তো কাজ শেষ হয়েছে, তুমি এবার দেশে ফিরে যাও। আমিও যত তাড়াতাড়ি পারি কাজ শেষ করে তোমার কাছে চলে যাব।

বলছ ফিরে যেতে?—জিজ্ঞাসা করলাম।

হ্যাঁ, লক্ষ্মীটি—বলল নাজমা।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—বেশ, আমি তরশু চলে যাব। এবার চল।

ফিরে এলাম খুব ভোরে।

এবার আমার দেশে ফিরে যাওয়ার পালা।

সারা সকাল ঘুরে বেড়ালাম জেরুজালেমের পথে পথে। সারাক্ষণ মন জুড়ে রইল শুধু একজন—নাজমা। নাজমার ভালবাসা, আমার ভালবাসা, আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন—সবার ওপরে নাজমার বেদনা-করুণ অতীত কাহিনী।

এই ভিড়ের মধ্যে পুলিশ প্রহরায় দেখে এলাম ওয়েলিং ওয়াল। দেখার মত কিছুই নয়, দেখা হয়েছে অঝোরে ক্রন্দন-রত শত শত ইহুদিদের। দেখলে সারা মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে।

ফিরে এলাম সেখান থেকে। আজ আর নাজমার সঙ্গে দেখা হবে না বলেই দিয়েছে। এ কথা জেনে নিয়েছি যে বেলসন তার বন্ধুর দলবল নিয়ে জেরুজালেম দেখাতে বেরিয়েছেন। তাঁরা আজই রাত্রে চলে যাবেন। সুতরাং তিনি আজ ভীষণ ব্যস্ত। একদিক দিয়ে ভাল—নাজমা

আজ বেলসনের হাত থেকে বেঁচে যাবে।

শিয়ারিম পল্লীতে এলাহি ব্যাপার। জীপ, ল্যাণ্ড-রোভার, গাড়ি, লরি, বাস বোঝাই করে দলে দলে ইহুদি এসে জুটছে। পুরিম উৎসব। এতক্ষণে প্রায় হাজারখানেক লোক জমে গেছে। বেশির ভাগ তরুণ আর যুবক। শুনেছি, দলে দলে এরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা নেচে চলবে, গান গাইবে। এক দারুণ উত্তেজনা তাদের মধ্যে।

সেখান থেকে আবার বেরিয়ে পড়লাম।

ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম সলোমনের কোয়ারির সামনে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, নাজমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন নাজমা বলেছিল, জেরুজালেমে দ্রষ্টব্যের মধ্যে অন্যতম হয়েছে এই কোয়ারি। মাটির তলায় পাহাড়ের মধ্যে হাজার হাজার সুড়ঙ্গের সমষ্টি পুরাতন জেরুজালেমের নীচ দিয়ে চারিদিকে চলে গেছে। যিশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় হাজার বছর আগে হিব্রু রাজা সলোমন হিব্রুদের প্রথম ধর্ম-মন্দির এবং নিজের জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এদের পাথর এসেছিল এখান থেকেই। খুঁড়ে খুঁড়ে পাথর সংগ্রহ করা হয়েছিল। তারপর বছরের পর বছর কেটে যায়। মাটি চাপা পড়ে গিয়ে এই কোয়ারি লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায়। প্রায় সকলেই ভুলে যায় এই গুহার অস্তিত্বের কথা। তারপর প্রায় একশ বছর আগে একজন লোক কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ আর তার কুকুরকে খুঁজে পায় না। এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে সে এক জায়গায় এসে দেখে কুকুরটা একটা ছোট গর্তের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। কৌতূহল হয় তার। সে সেই গর্ত খুঁড়তে সুরু করে। খুঁড়তে খুঁড়তে তার আবিষ্কারে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। সেই গর্তটি আর কিছু নয়—বিরাট এক গুহার মুখ। লোকে তখনই জানতে পারল বিস্মৃত সলোমনের কোয়ারির কথা। তারপর এই কোয়ারি কিছুটা পরিষ্কার করা হয়েছে। লোকে আসে, ঘুরে দেখে যায় এই গুহাগুলো, চারদিকের সুড়ঙ্গগুলো।

এটা দেখবার জন্য তৈরি হয়ে আসি নি। তাই মনে দ্বিধা হচ্ছিল—

ঢুকব কি ঢুকব না। কিন্তু মনে হল পরশু চলে যাচ্ছি—আজ না দেখলে আর দেখা হবে না, কাল সারাদিন থাকব নাজমার কাছে।

কোয়ারির মুখ দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। বাইরে থেকে আলো এসে পড়েছে, গুহার ভেতরটা বেশ দেখা যায়। সুন্দরভাবে পাথরগুলো কাটা, গায়ে ছবি আঁকা। কিন্তু একটু এগিয়ে মোড় ফিরতেই বাইরের থেকে আলো আসা বন্ধ হল। সমস্ত গুহা অন্ধকার। এত অন্ধকার যে দু'হাত দূরের জিনিষও দেখা যায় না। ভয় হল। মনে হল, ফিরে যাই। আবার মনে হল, আর একটু এগিয়ে গেলেই হয়তো আবার আলো পাওয়া যাবে। তাই এগিয়ে গেলাম। কিন্তু একদিকের দেয়াল ধরে ধরে যতই এগিয়ে যাই ততই যেন অন্ধকার এসে গ্রাস করে। এবার সত্যি সত্যিই ভয় হল। দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বলতে পারি না, কখন কি বিপদ হতে পারে। হয়ত এক হাত দূরেই আছে গভীর খাদ। দাঁড়িয়ে পড়ে দম নিতে লাগলাম। হঠাৎ সেই গুহার ভেতর জুতোর খট খট শব্দ আর কথা গম্ গম্ করে উঠল। পাথরের দেয়াল ঘেঁষে লুকিয়ে পড়লাম। ছোট্ট এক টর্চের আলো এগিয়ে আসতে লাগল। আমার কাছ বরাবর এসেই থেমে গেল।

একজন লোকের গলা অস্বাভাবিক রকম গম্ গম্ করে উঠল—আপনারা এখন তবে যান। আমিও চলে যাচ্ছি। মনে রাখবেন রাত নটা। লোকজন ঠিক সময়ে আসবে। এক নম্বর দু নম্বর আর পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর গুহার ব্রেন আর ষ্টেনগানগুলো দিয়ে দেবেন। আমি ঠিক সময়ে হাজির হব।

তারপর দু দিকে দুটো আলো চলে গেল।

ভয়ে আমার হাত পা কাঁপতে লাগল। তবে কি সেই চোরাই অস্ত্রশস্ত্র এনে এখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে? আর আজ রাত্রি ন'টার সময় সুরু হবে বিদ্রোহ! ইহুদিরা যে সময় তাদের পুরিম উৎসবে মত্ত, ঠিক তখনই হয়তো সুরু হয়ে যাবে মারামারি!

আমি ধীরে ধীরে দেয়াল ধরে ধরে ফিরে যেতে লাগলাম। ভয়ে

তখনও হাতপা কাঁপছিল। বাইরে বেরিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই। আমি প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে চললাম থানার দিকে।

থানায় তখন প্রবল উত্তেজনা। সশস্ত্র পুলিশ এসে হাজির হয়েছে। সৈন্যবাহিনীকে সতর্ক করা হয়েছে।

লেনার্ড আমাকে দেখে বলল—সেন, বড় ব্যস্ত এখন। একটা বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া গেছে। আমরা সেখানে যাচ্ছি।

আমি বললাম—আমি তার চেয়েও সাজ্ঘাতিক খবর নিয়ে এসেছি।

লেনার্ড তাকাল আমার দিকে। তারপর বলল—এস আমার সঙ্গে।

আমাকে নিয়ে গেল এক বড় অফিসারের কাছে। পরিচয় করিয়ে দিল —ইনি কর্নেল হাণ্টার। এঁকে বল।

আমি সলোমনের কোয়ারির সব কথা খুলে বললাম।

কর্নেল হাণ্টার বললেন—ঠিক শুনেছেন নটায়? আর ওই কোয়ারি-তেই আছে অস্ত্রশস্ত্র? লোকটা কে চিনতে পারলেন?

জানালাম—না।

কর্নেল হাণ্টার বলে উঠলেন—আশ্চর্য! অথচ একটি আরব এসে আমাকে খবর দিয়ে গেল যে সে শুনে এসেছে আজ রাত আটটার সময় এখান থেকে পনের মাইল দূরে আরবরা বিদ্রোহ করছে। সে আরো খবর আনতে চলে গেছে।

আমি বললাম—এদের মতলবটা বুঝতে পারলেন না? আটটার সময় পনের মাইল দূরে বিদ্রোহ বলে এখান থেকে সমস্ত পুলিশ আর সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাবে, আর ঠিক নটায় এখানে ওরা সুরু করবে বিদ্রোহ। তখন তাদের বাধা দেবে কে?

কর্নেল হাণ্টার একটু ভেবে তাঁর হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। হাত নাড়া দিয়ে বললেন—ধন্যবাদ। আমরা এখনি সব ব্যবস্থা করছি।

তার পরেই পুলিশ আর সৈন্যবাহিনী সলোমন কোয়ারির মুখ আটকে

ফেলে শক্তিশালী আলো আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঢুকে পড়ল সেই কোয়ারির ভেতর। সহজেই খুঁজে পেল চোরাই চালানের বাক্স বোঝাই নানারকম আগ্নেয়-অস্ত্র। তিনজন লোককে সেখান থেকে গ্রেপ্তার করে তারা ফিরল।

জেরুজালেম শহরে ত্রাসের সঞ্চার হল। পুরিম উৎসবের জন্য যে-সব ইহুদি এসেছিল তারা এই খবর পেয়ে ভয়ে পালাতে লাগল।

কর্নেল হান্টার আমাকে আমার ঘরে ফিরে যেতে দিলেন না। প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন।

রাত্রি বেলায় ছাড়ল না আমার পুলিশ বন্ধুরা। আমি পরশু চলে যাব শুনে তারা সেই রাতেই আমাকে নিয়ে তাদের মেসে তুলল। ডেড্ সী-র গল্প তারা শুনবেই।

কি সাঙ্ঘাতিক উত্তেজনা আর আনন্দের মধ্যে কেটে গেল সারা দিনরাত।

পরদিন নটার সময় ছাড়া পেলাম।

ছুটে গেলাম নাজমার ক্লাবে।

নাজমা আর বেলসন বসে গল্প করছিল।

আমাকে দেখেই নাজমা আনন্দে লাফিয়ে উঠল—থ্রি চিয়ার্স ফর ইন্দ্র সেন। হিপ হিপ হুর রে! সাবাস সেন! তুমি এত বড় গ্যাঙ্গ ধরিয়ে দিলে!

বেলসন আমাকে বললেন—কনগ্র্যাচুলেশন্স্ সেন। সত্যিকারের বাহাদুরির কাজ করেছেন। আপনি যে এত বড় ডিটেকটিভ তা জানতাম না।

আমি মাথা নীচু করে বসে রইলাম।

বেলসন বললেন—শুনলাম আপনি কালই চলে যাবেন। আর কিছুদিন আপনি থাকলে খুশিই হতাম। হ্যাঁ—ভাল কথা।

জেরুজালেমের সব কিছু দেখা শেষ হয়ে গেছে ? হেজাকিয়া টানেল দেখেছেন ? অপূর্ব টানেল। আসিরীয় শত্রুরা যখন জুডা ঘিরে ফেলে, তখন জেরুজালেমে জল সরবরাহের জন্য এই সুড়ঙ্গ হেজাকিয়া কেটেছিলেন। ওপর থেকে শত্রুরা বুঝতে পারবে না জল কোন্ পথে আসছে, তাই তারা জল বন্ধ করে দেশের লোককে মারতেও পারবে না। দেখতে চান তো চলুন আজ সন্ধ্যাবেলা। তখন আমার কোন কাজ নেই।

আমি কিছু বলার আগেই নাজমা বলে উঠল—না, না। সেন কাল চলে যাচ্ছে, আজ সন্ধ্যায় ওই অন্ধকার টানেল দেখতে যাবে না। একটা দুর্ঘটনা ঘটলে কি হবে ?

বেলসন বিরক্ত হয়ে বললেন—তুমি চুপ কর নর্মা। আমি সঙ্গে যাচ্ছি, দুর্ঘটনা কি ঘটবে ?

নাজমা বলল—বেশ। তবে আমিও যাব।

বেলসন কিছুক্ষণ নাজমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে একটু হেসে বললেন—বেশ, তুমিও যাবে।

নাজমা আমাকে বলল—তবে তুমি এখন যাও। জিনিষ-পত্তর গুছিয়ে নাও। বিকেলে এখানে এস। তিনজনে একসঙ্গেই হেজাকিয়া টানেল দেখতে যাব।

সন্ধ্যাবেলায় গাড়িতে করে এসে নামলাম হেজাকিয়া টানেলের সামনে। আমি, নাজমা আর বেলসন।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। বেলসন টর্চ হাতে নিয়ে এগিয়ে এগিয়ে চললেন, আমরা দুজন পিছনে পিছনে।

তিন চার হাত চওড়া সুড়ঙ্গ, হাঁটু সমান জল। পায়ের তলায় পাথর, নুড়ি। একটা দুর্গন্ধ। সুড়ঙ্গটা ভীষণ অন্ধকার।

কিছুদূর এসে বেলসন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন—সেন, তুমি খুব বাহাদুর। তোমার শয়তানির আজ শেষ। আর তোমারও, নর্মা!

এখানে তোমাদের মেরে রেখে গেলে কেউ টের পাবে না। আমার এতদিনের প্রস্তুতি, এতদিনের পরিকল্পনা তুমি নষ্ট করে দিয়েছ, সেন। জেরুজালেম আমার হাতে এল না তোমার গোয়েন্দাগিরিতে। তার ওপর তুমি আমার বাগদত্তাকে নিয়ে গোপন অভিসারে গিয়েছিলে ডেড্ সী-তে। তার আঙুলে উঠেছে তোমার আঙটি। সুতরাং—

বেলসন পকেটে হাত দেওয়ার আগেই গর্জন শোনা গেল—হ্যাণ্ডস আপ—

এক সেকেণ্ডের মধ্যে বেলসন বুঝতে পারলেন নিজের অবস্থা। হাত থেকে টর্চ ফেলে দিয়েই আমাদের দুজনকে দুই ধাক্কা দিয়ে সরে গেলেন। এই অতর্কিত ধাক্কায় আমরা ছিটকে পড়লাম কয়েকজন লোকের ঘাড়ে।

চারদিক তখন কি অন্ধকার!

একটু পরেই আবার অনেক টর্চ জ্বলে উঠল। তাকিয়ে দেখলাম, দলে দলে পুলিশ রিভলভার আর টর্চ হাতে নিয়ে টানেলের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেলসনকে কাছাকাছি কোথাও দেখতে পেলাম না। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সরে পড়েছেন।

কর্ণেল হাণ্টার আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন। আমাদের দুজনকে ধরে বাইরে নিয়ে এলেন।

বললেন—আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ। মিঃ সেনের জন্য অস্ত্র সমেত তিনজন সর্দারকে ধরতে পেরেছি। আর মিস্ টার্নারের পেন্সিল স্কেচ দেখে আর দুজনকে ধরেছি মোয়াব হিলসের কাছে। আপনি সত্যিই চমৎকার ছবি আঁকেন মিস্ টার্নার। আর আপনি খবর দিয়ে আমাদের আগে থেকে তৈরি করে রেখেছিলেন বলেই পালের গোদা য়োসেফ বেলোক্লিফের পরিচয় এতদিনে পাওয়া গেল। এইবার সে ধরা পড়বে।

আমি নাজমার দিকে তাকালাম। জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি কি জানতে যে বেলসন আমাদের আজ এখানে খুন করবার চেষ্টা করবে?

নাজমা মাথা নাড়ল। বলল—হ্যাঁ। আমার সন্দেহ হয়েছিল যে বেলসনই বেলোক্লিফ। তাই ওর সঙ্গে এত মিশতাম। তাই ওর নতুন বন্ধুদের ছবি এঁকে রেখেছিলাম, যাতে পুলিশ ওদের সহজেই চিনে ধরতে পারে। তুমি যে অস্ত্রশস্ত্র চোরাই চালানি হতে দেখেছ, তুমি যে অস্ত্রের গুদাম দেখে ওদের বিদ্রোহের কথা ফাঁস করে দিয়ে দলের লোক ধরিয়ে দিয়েছ, তোমাকে ও যে সহজে ছেড়ে দেবে না - তাও জানতাম। তাই যখন অন্ধকার নির্জন হেজাকিয়া টানেল তোমাকে দেখাবার জন্য ও এত উৎসাহ দেখাল, তখনই আমি ওর মতলব বুঝতে পেরে কর্নেল হান্টারকে সব ব্যাপার বুঝিয়ে বলি। তিনি আগে থেকে টানেলের বাইরে আর ভেতরে পুলিশের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। ওঁরই জন্য আমরা দুজনে আজ প্রাণে বেঁচে গেছি।

আমি কর্নেলকে ধন্যবাদ জানালাম।

কিন্তু কিছু হল না। বেলসন বা য়োসেফ বেলোক্লিফের খোঁজ পাওয়া গেল না।

রেডিওয় হঠাৎ গান থেমে গেল। জরুরী ঘোষণা শোনা গেল : ইরাক, মিশর, সিরিয়া ও জর্ডন এক প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

তারপরেই নাসেরের বেতার ভাষণ :

"We are facing you in the battle and are burning with desire for it to start in order to obtain revenge. This will make the world realise what the Arabs are and what Israel is. We are so eager for battle in order to force the enemy to awake from his dreams and meet Arab reality face to face."

নাসের।

গামাল আবদুল নাসের আজ আরব রাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রতীক। সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে একক সংগ্রামে জয়ী। তরুণের স্বপ্ন। যৌবনের আশা। সমগ্র দেশের বিস্ময়।

মরোক্কো, আলজেরিয়া, লিবিয়া, মিশর, সুদান, সৌদি আরব, কুয়াইত, বাহরিন, কাতার, ইয়েমেন, মরিটানিয়া, জর্ডন, সিরিয়া, ইরাক, লেবানন—যেখানেই আরব, সেখানেই একটি নাম—নাসের।

ঈর্ষ্যা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিরোধ, অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন এই আরব-রাষ্ট্রগুলিকে এক সূত্রে গেঁথে তুলেছে একটি লোক—নাসের।

মিশরের দামাল ছেলে গামাল আবদুল নাসের। বাঙলার কবি-কণ্ঠে আজ ধ্বনিত হল না: গামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই—কিন্তু সত্যিই কামাল করেছেন এই দামাল গামাল।

মিশর-সম্রাট ফারুক ব্রিটিশের অপমান ভোলেন নি। তাঁর নির্বাচিত মন্ত্রীসভাকে ব্রিটিশ বন্দুকের ভয় দেখিয়ে বাতিল করে তাদের নিজেদের পছন্দমত মন্ত্রীসভা গঠন করেছিল—রাজা হয়ে একথা তিনি বিস্মৃত হতে পারেন নি।

যুদ্ধ শেষের পর তাই তিনি 'মন্ত্রী মন্ত্রী' খেলা সুরু করলেন। রাগ বা খামখেয়ালি যা-ই হোক না কেন—এক একটি মন্ত্রীসভা গড়ছেন আর ভাঙছেন। ভাঙা-গড়া খেলা পেয়ে বসল তাঁকে। রাজ্য-শাসন দেখার আর তাঁর ইচ্ছা নেই, বিলাস-ব্যসনই এখন তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়। দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় তাঁর কীর্তিকাহিনীর রসাল সংবাদ এখন সকলের আসরে সবচেয়ে মুখরোচক খাদ্য।

১৯৪৮ সালের প্যালেষ্টাইন যুদ্ধের ব্যর্থতা দেশকে মুহ্যমান করে

ফেলেছে। বিনা প্রস্তুতিতে হঠাৎ সংগ্রাম, তার ওপর অস্ত্র-সরবরাহের কেলেঙ্কারিতে মিশরের সামরিক বাহিনীর মধ্যে এক তীব্র অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছে, একদল অফিসার গোপনে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে—একথা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন ; কিন্তু এরা যে কারা—তা, না তিনি, না তাঁর গুপ্ত পুলিশ বিভাগ জানতে পেরেছিল। এত গোপনে এত যত্নের সঙ্গে ফারুকের বিরুদ্ধে বিপ্লবের পরিকল্পনা চলছিল।

সামরিক বাহিনীর মধ্যে এই বিপ্লবের নায়ক ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল গামাল আবদুল নাসের।

১৯১৮ সনের ১৫ই জানুয়ারি আলেকজান্দ্রিয়ায় গামালের জন্ম। তাঁর পিতা আবদুল নাসের হুসেন ছিলেন পোষ্ট অফিসের কর্মচারী। সরকারি চাকরি, তাই প্রায়ই এখানে ওখানে বদলি হতে হয়। সাত বছর বয়সে তাই গামালকে কায়রোতে তাঁর কাকা খলিল হুসেনের কাছে লেখাপড়ার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আট বছর বয়সে তাঁর মার মৃত্যু হয় এবং তাঁর পিতা আবার বিবাহ করেন।

কায়রোয় কাকার কাছে থেকে তিনি এল-নাহাসিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও হেলওয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। পরে পিতা আলেকজান্দ্রিয়ায় বদলি হয়ে এলে তিনি সেখানে রস-এল-তিন বিদ্যালয়ে পড়া শেষ করেন।

ছেলেবেলাতেই কাকার কাছে থাকার সময় তিনি পাঁচজনের মুখে গল্প শুনতেন অতীত মিশরের গৌরবোজ্জ্বল দিনের কথা এবং শুনতেন কি ভাবে ইংরেজরা তাঁর দেশকে শুষে খাচ্ছে। ইংরেজদের প্রতি কিছুটা ঘৃণা তাঁর মনে জমা হতে থাকে। কায়রোর আকাশে ব্রিটিশ প্লেন উঠলে অন্যান্য আরব-শিশুর মত তিনিও সেই এরোপ্লেন দেখবার জন্য ছুটে যেতেন, কিন্তু তাঁর সেই প্লেন দেখা অন্য শিশুদের মত নয়। অন্য শিশুরা যখন নীরব বিস্ময়ে প্লেনগুলোকে দেখত ধূসর নীল আকাশে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে, তখন গামাল হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করত —ইয়ে আজিজ ! ইয়ে আজিজ ! দহিয়া তাঘুদ অল-ইংলিস।—হে

ঈশ্বর ! হে ঈশ্বর ! ইংরেজের এখনই কোন যেন বিপদ হয়।

স্কুল জীবনেই গামাল রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সে যুগ ছিল ওয়াফদিষ্ট পার্টির গৌরবময় যুগ। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এই ওয়াফদিষ্ট পার্টি। তাঁর তরুণ মন সহজেই আকৃষ্ট হল এই ওয়াফদিষ্ট পার্টির প্রতি। রাজনীতির বই, বিপ্লবের বই পড়তে সুরু করলেন তিনি। রুসো, ভোলটেয়ার, গান্ধীর রচনা তাঁকে মুগ্ধ করল।

কিন্তু ওয়াফদিষ্ট পার্টির এই নিষ্ক্রিয় রাজনীতি সহ্য করবার ছেলে গামাল নয়। তিনি চান সংগ্রাম। ঘরে বসে দর কষাকষি তাঁর সহ্য হয় না। তা ছাড়া মিশরের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এতদিনকার একছত্র আধিপত্যের ফলে ওয়াফদিষ্ট পার্টির মধ্যে এসেছে এক পরম আত্ম-তুষ্টির ভাব, দলের মধ্যে ঢুকেছে দুর্নীতি—জননায়কেরা আর অতীত যুগের দেশের দুঃখ, দারিদ্র্য ও সংগ্রামী মিশরের প্রতীক নন। তাঁর মন ওয়াফদিষ্ট পার্টির কাছ থেকে সরে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল এবার আরো একটু সংগ্রামী দল মিশর এল-ফাতাত-এর দিকে। কিন্তু সেখানেও সেই এক অবস্থা। এই দলের নেতা আহমেদ হুসেনকেও আর তাঁর আদর্শ নেতা বলে মনে হল না।

মিশরের ওপর ব্রিটিশের কড়া শাসন মিশরবাসীরা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় খুশি ছিল না ওয়াফদিষ্ট পার্টির ওপর। তারা ব্রিটিশের সহায়তায় নিজেদের হাতের লোক সিদ্দিকী পাশাকে তুলে ধরল। সিদ্দিকী হলেন প্রধান মন্ত্রী—ব্রিটিশ ও ধনী ব্যবসায়ীদের খেলার পুতুল। জনসাধারণের নেই সেই মন্ত্রীসভার ওপর এতটুকু আস্থা।

ওয়াফদিষ্ট পার্টি আন্দোলন সুরু করল। অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মত এল-নাহদা বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই আন্দোলনের উত্তেজনা গামালের রক্তেও শিহরণ জাগাল। তিনিও সেই আন্দোলনে দেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে নেমে

পড়লেন। ব্রিটিশ ও মিশরীয় পুলিশের হাতে নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করলেন অন্যান্য ছাত্র-বন্ধুদের মত একই সঙ্গে। দেশ-স্বাধীনতার সংগ্রামে এই হল তাঁর প্রথম দীক্ষা, প্রথম রক্ত-তিলক পরলেন তাঁর ললাটে।

১৯৩৬ সনে মুসোলিনীর দৃষ্টি পড়ল উত্তর আফ্রিকার ওপর। ব্রিটিশ প্রমাদ গনলেন। বিক্ষুব্ধ মিশরবাসী হয়তো ব্রিটিশকে ক্ষমতাচ্যুত করতে আহ্বান জানাবে মুসোলিনীকে। ব্রিটেন তার ঔদ্ধত্য, তার নির্যাতন সংযত করে মৈত্রীর হাত বাড়াল। মিশরীয় জন-নেতারা স্থির মস্তিষ্কে ভেবে দেখলেন যে জানা শত্রুর চেয়ে অজানা শত্রু বেশি ভয়ঙ্কর। তারা ইটালিকে বাদ দিয়ে ব্রিটিশের হাতই ধরল।

ব্রিটেনের সঙ্গে মিশরের চুক্তি সম্পাদিত হল। ওয়াফদিষ্ট পার্টি এবার শাসন ক্ষমতা হাতে পেল। ইটালির লোভী হাতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত হওয়ার জন্য ব্রিটেন মিশরের সৈন্যবাহিনীকে উন্নত করার দিকে দৃষ্টি দিল। ওয়াফদিষ্ট পার্টি এই সময় এমন একটি কাজ তাদের অজান্তে করে বসল যে তারই ফলে ভবিষ্যতে দেশ থেকে রাজতন্ত্রই শুধু উঠে গেল না, তাদের নিজেদেরই অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ওয়াফদিষ্ট পার্টি সেই প্রথম অভিজাত পরিবারের বাইরে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে ছেলেদের মিশরের মিলিটারি একাডেমিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ করে দিল।

এই সুযোগের সদ্ব্যবহার শুধু যে গামাল আবদুল নাসেরই করলেন তা নয়, একাডেমিতে ভর্তি হলেন ভবিষ্যৎ সামরিক বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত আবদুল হাকিম আমের, আবদুল লতিফ এল-বাগদাদি, জাকারিয়া মহিউদ্দীন, গামাল সালেম, সালাহ সালেম এবং আরো অনেকে।

১৯৩৮ সনের জুলাই মাসে গামাল সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট হয়ে মিলিটারি একাডেমি থেকে পাশ করলেন।

এই মিলিটারি একাডেমিতে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় আর এক সম-আদর্শী বিপ্লবী তরুণের সঙ্গে। তাঁর নাম আবদুল হাকিম আমের। নব-

জাগরণের বীজ তখনই রোপিত হল। এই আমের মিশরের রাজতন্ত্র চূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর মিশরের উপরাষ্ট্রপতি ও মিশর সেনাবাহিনীর সহ-সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন।

নাসের এলেন মানকাবাদে। এখানে আলাপ হল আনোয়ার এল সাদাত ও জাকারিয়া মহিউদ্দীনের সঙ্গে। এঁরা দুজনেই উপরাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। তখন নাসেরের বয়স মাত্র একুশ কিন্তু এরই মধ্যে নাসের মিশরীয় তরুণ সামরিক অফিসারদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন।

১৯৩৯ সনে নাসেরকে সুদানে বদলি করা হল। আবদুল হাকিম আমেরও এখানে বদলি হয়ে এসেছিলেন। তাঁদের দুজনের সখ্যতা দৃঢ়তর হল। সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট থেকে লেফটেন্যাণ্ট এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হয়ে কায়রোর মিলিটারি একাডেমির শিক্ষক হয়ে মিশরে ফিরে এলেন।

ব্রিটিশ অধিকার মুক্ত মিশরের স্বপ্ন এই তরুণ অফিসারের মনে অনেক দিন থেকেই জাগ্রত। শুধু যে দেশের সর্বত্রই ব্রিটিশদের অধিকার তা-ই নয়, মিশরীয় সেনাবাহিনীতেও তাদেরই আধিপত্য। এই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে গেলে এই তরুণেরা অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে উঠল। এবার হয়তো জার্মানি আর ইটালি এসে উপস্থিত হবে মিশরে এবং ব্রিটিশদের এই দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করবে। এই তরুণদের আদর্শ তখন রাজনীতিকদের মধ্যে আলি মেহের পাশা এবং সামরিক অফিসারদের মধ্যে জেনারেল আজিজ এল-মাদারি।

নাসের এবং আমের দুজনেই আবার তখন সুদানে। তরুণ অফিসার আর মিশরের সঙ্গে তখন তাঁদের সম্পূর্ণ যোগাযোগ নেই। মিশরের সেনাবাহিনীর অন্তর্বিপ্লবের কাজ হাতে নিলেন আনোয়ার এল-সাদাত। ধৈর্যের অত্যন্ত অভাব তাঁর, সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না শুধুমাত্র এই অস্থির অধীরতার জন্য; কিন্তু বসে থাকার লোক তিনি নন। সম্ভব অসম্ভব সব রকম পথ একবার পরীক্ষা করে দেখা তাঁর চাই—তাতে ফল হোক বা না হোক।

সাদাত একদিকে জার্মানদের সঙ্গে গোপনে সংযোগ স্থাপন করে তাদের মনোভাব বোঝবার চেষ্টা করছেন, আর একদিকে তিনি মিশরের অভ্যন্তরে উগ্রপন্থী এক রাজনৈতিক দলের সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলেন। সন্ধানে মিলায় বস্তু। পেলেন সাদাত সেখ হাসান এল-বান্না এবং তাঁর মুসলিম ব্রাদারহুডকে। মুসলিম ব্রাদারহুড অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল, গোঁড়া ইসলামবাদী রাজনৈতিক দল—সাদাতের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর একেবারেই মিল নেই, কিন্তু এই ব্রাদারহুড চরম ব্রিটিশ বিদ্বেষী। সুতরাং সাদাত এদের দলে টানবার চেষ্টা করতে লাগলেন। মুসলিম ব্রাদারহুড একটি গোপন সন্ত্রাসবাদী শাখা খুলেছিল। বান্নাও তাঁর কার্যসিদ্ধির জন্য এবং সৈন্যবাহিনীতে তাঁর প্রভাব ও ক্ষমতা বিস্তারের জন্য সাদাতের আহ্বানে এগিয়ে গেলেন। মুসলিম ব্রাদারহুড সামরিক বাহিনীতে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হল।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ঠিকই জানত যে কয়েকজন অসন্তুষ্ট সামরিক অফিসার জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করছে। জেনারেল মাদারির জার্মান-প্রীতি সর্বজনবিদিত। যুদ্ধকালীন সময়ে মাদারিকে সেনাবাহিনীর এত উচ্চপদে রাখা উচিত নয়, সুতরাং ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী বললেন যে জেনারেল মাদারিকে সেনাবাহিনী থেকে অপসারিত করা হোক। মিশর সরকার চার্চিলের চাপে জেনারেল মাদারিকে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করল।

সাদাত নিরস্ত হলেন না। তিনি লিবিয়ায় জার্মান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আর মিশরে জেনারেল মাদারির সঙ্গে আলাপ চালাতে লাগলেন। জার্মানরা জেনারেল মাদারিকে মিশর থেকে সরিয়ে ফেলার পরামর্শ দিল। সাদাত জেনারেল মাদারিকে গোপনে সরিয়ে ফেলার কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করার পর একদিন ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বন্দী করে বন্দী শিবিরে রাখা হল।

সাদাতের এই নির্বোধ হঠকারিতায় সামরিক বাহিনীর অন্তর্বিপ্লব

ব্যাহত হল। নেতৃহীন তরুণ অফিসারেরা চুপ করে রইলেন। ঠিক এই সময়ে মিশরের জাতীয় জীবনে আর এক লজ্জাকর ও অপমানজনক ঘটনা সংঘটিত হল। রাজা ফারুক প্রধান মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব দিলেন জার্মান অনুরাগী আলি মেহের পাশাকে। ততদিনে জার্মান সেনাপতি রোমেল উত্তর আফ্রিকায় প্রতিটি যুদ্ধে ব্রিটিশকে পরাজিত করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন। মিশরে ব্রিটিশ রাজদূত স্যার মাইলস্ ল্যাম্পসন আর ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হঠাৎ ফারুকের আবেদিন প্রাসাদ সৈন্যবাহিনী দিয়ে ঘিরে ধরে জোর করে ফারুককে দিয়ে এক আদেশ লিখিয়ে নেন, যার ফলে আলি মেহের পদচ্যুত হন এবং ওয়াফদিষ্ট পার্টির নাহাশ পাশা প্রধানমন্ত্রী হন। ফারুকের ওপর তরুণ অফিসারদের কোন রকম শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি ছিল না, কিন্তু ব্রিটিশের এই কাজ তাঁদের কাছে অত্যন্ত অপমানজনক বোধ হল। এই বিক্ষুব্ধ অফিসার দল ফারুকের একটি মাত্র আদেশের জন্য অপেক্ষা করছিল, কিন্তু ফারুক নিজেই যখন এই অপমানজনক আচরণ নীরবে সহ্য করে গেলেন, তখন তাদের আর করবার কিছুই রইল না।

এই সময় এল-আলমাইনের মরু-যুদ্ধে রোমেল এবং জার্মান সেনা-বাহিনী ব্রিটিশের হাতে ভীষণভাবে পরাজিত হল। তরুণ অফিসারদল হতাশ হয়ে পড়ল, তারা বুঝতে পারল যে জার্মান সাহায্যে তাদের আর ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্তিলাভের কোন আশা নেই।

এবার নাসের ফিরে এলেন মিশরে। মুমূর্ষু আন্দোলনকে তিনি নিজের হাতে তুলে নিলেন। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে ধীরে ধীরে তিনি এই আন্দোলনকে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে লাগলেন এবং এই আন্দোলন শুধুমাত্র সামরিক মহলে সীমিত না রেখে তার বীজ জনসাধারণ ও ছাত্রসমাজের মধ্যেও ছড়িয়ে দিলেন। এত গোপনীয়তার সঙ্গে এই আন্দোলন চালিত হয়েছিল যে একমাত্র তিনি এবং আমের ছাড়া আর তৃতীয় কোন ব্যক্তি কোনদিন জানতে পারে নি, কে এই আন্দোলনের প্রকৃত নেতা।

১৯৪৪ সনে নাসের তাহিয়া খাজেমকে বিবাহ করেন।

১২ই মে, ১৯৪৮। ক্যাপ্টেন নাসের মেজর পদে উন্নীত হলেন।
১৫ই মে ব্রিটেন প্যালেষ্টাইনের ওপর তার কর্তৃত্ব ত্যাগ করল। ইহুদিরা গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠা করল তাদের ইজরায়েল রাষ্ট্র। বিক্ষুব্ধ আরব রাষ্ট্রগুলি প্যালেষ্টাইন দখল করার জন্য তাদের অপ্রস্তুত সেনা-বাহিনীদের আদেশ করল।
১৬ই মে নাসের জাকারিয়া মহিউদ্দীন ও আবদুল হাকিম আমেরের সঙ্গে একই ট্রেনে করে গাজার পথে রওনা হলেন।
মাত্র দশ হাজার সৈন্যের মিশর বাহিনী। অস্ত্রশস্ত্র সবই মান্ধাতা আমলের এবং অধিকাংশই অকেজো। সরবরাহ, চিকিৎসাব্যবস্থা, খাদ্য পরিবহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা—সব কিছুই হতাশাব্যঞ্জক। অনেক উর্ধতন অফিসারদের কাপুরুষতা ও খামখেয়ালি সত্ত্বেও তরুণ অফিসারেরা অমিত বিক্রমে সংগ্রাম করল। প্রথম জয় তো তাদেরই। হঠাৎ যুদ্ধ বিরতি। কিন্তু যুদ্ধ বিরতির সময় এল না নতুন অস্ত্র, এল না নতুন সৈন্য। হঠাৎ নতুন সাজে সজ্জিত ইজরায়েল বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল এদের ওপর, ব্রিটেন থেকে আনা বিমানবাহিনীর বোমাবর্ষণ স্বুরু হল। আরব বাহিনীর হল ভীষণ পরাজয়। অনেক তরুণ অফিসার হত ও আহত হল।
এই পরাজয় শুধু নিষ্ক্রিয় রাজনীতি ও ব্যর্থ প্রস্তুতির জন্য একথা তরুণ অফিসারেরা বুঝতে পেরেছিল। নাসের তাঁর স্মৃতি-কাহিনী 'দি ফিলজফি অব রেভলিউশন' বইয়ে লিখেছেন: 'আমরা রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করছিলাম, কিন্তু আমাদের চিন্তা তখন মিশরের দিকে ছুটে যাচ্ছে।' ঠিক একই কথা বলে গিয়েছিলেন মৃত্যুর পূর্বে মিশরের এক বীর অফিসার কর্নেল আহমেদ আবদুল আজিজ। মৃত্যুর পূর্বে সেনা-বাহিনীর প্রতি তাঁর শেষ বাণী ছিল: "Remember that the real battle is in Egypt."

এই অপমানজনক পরাজয়ের মধ্যেও মেজর নাসের অত্যন্ত বীরত্ব ও সামরিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। চতুর্দিকে ইজরায়েলি সেনাবেষ্টিত হয়েও অল্পসংখ্যক কিছু সৈন্য নিয়ে তিনি ইজরায়েলি আক্রমণ বারবার প্রতিহত করেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত সৈন্য নিয়েই ইজরায়েলি বেষ্টনী ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মুসলিম ব্রাদারহুড এবার সন্ত্রাসবাদী কাজে লিপ্ত হল। তারা কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাকে হত্যা করল। সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ এবার তীব্র আকার ধারণ করল। তরুণ অফিসারদের আন্দোলনে তারাও সজাগ হয়ে উঠল।

সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি আন্দোলন গড়ে উঠেছে বুঝতে পেরে মিশরের প্রধান মন্ত্রী আবদুল হাদি সেনাবাহিনীর জনপ্রিয় বীর নেতা মেজর নাসেরকে ডেকে পাঠালেন সেই সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ জানতে। তিনি ধারনাই করতে পারেন নি যে এই আন্দোলনের নেতাকেই তিনি প্রশ্ন করছেন আন্দোলন সম্বন্ধে। কিন্তু কোন সংবাদ তিনি জানতেও পারলেন না নাসেরের কাছ থেকে।

কায়রোতে সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসাররা বা 'ফ্রি অফিসারস' আবার একত্র হলেন। এবার আন্দোলন দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। 'ফ্রি অফিসার'রা তাঁদের নেতা নির্বাচিত করলেন মেজর গামাল আবদুল নাসেরকে ১৯৫০ সনে।

এবার নাসের আন্দোলনের শেষ প্রস্তুতির জন্য তৈরি হলেন।

নাসের বুঝতে পেরেছিলেন যে আন্দোলনের সময় একজন বয়স্ক এবং জনপ্রিয় সেনানায়ককে তাদের দলপতি হিসেবে লোক সম্মুখে তুলে না ধরতে পারলে এই আন্দোলন দেশের বাইরে এবং অভ্যন্তরে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করতে পারবে না। এই পদে একজন সেনানায়কের সন্ধান করতে লাগলেন তাঁরা। শেষ পর্যন্ত নাসেরের মনে হল মেজর জেনারেল নেগুইবের কথা। নেগুইব প্যালেষ্টাইনের যুদ্ধে অসীম

সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং সম্মুখ-সমরে ভীষণভাবে আহতও হয়েছিলেন। নেগুইব অত্যন্ত মিষ্টভাষী, তাঁর আচরণের জন্য তিনি জনপ্রিয়।

আবদুল হাকিম আমের তাঁর অধীনে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। সুতরাং আমেরকে পাঠানো হল নেগুইবের মনোভাব জানতে। আমের নেগুইবের সঙ্গে দেখা করে ফ্রি-অফিসারদের মনের অভিলাষ ব্যক্ত করলেন। নেগুইব ফ্রি-অফিসার আন্দোলনে যোগ দিতে সম্মত হলেন।

১৯৫২ সনের জানুয়ারি মাসে মেজর জেনারেল নেগুইব ফ্রি-অফিসার দলের নেতা নির্বাচিত হলেন। কিন্তু গোপন আলোচনার মধ্যে তাঁকে রাখলে সব কথা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তাঁকে ওই গুপ্ত সমিতির সক্রিয় সদস্য করাও হয় নি। এমন কি সামরিক বিদ্রোহের পরিকল্পনা কিংবা যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা ক্ষমতা হস্তগত করছে ততক্ষণ এই বিদ্রোহের কোন ব্যাপার তাঁকে জানানোও হল না।

ফ্রি-অফিসাররা এইবার নিজেদের ক্ষমতা একবার যাচাই করে দেখবার লোভ সংবরণ করতে পারল না। সামরিক বাহিনীর মধ্যে জনপ্রিয়তার জন্য ফারুক নেগুইবকে একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। ফারুকের আপত্তি সত্ত্বেও সামরিক অফিসাররা নেগুইবকে অফিসারস্ ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করলেন। ফারুক স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, এই ঘটনা আর কিছুই নয়—তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক অফিসারদের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ।

প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ফারুক নেগুইবকে সুদূর মিশর সীমান্তে বদলি করলেন। সামরিক অফিসারদের জব্দ করার জন্য প্যালেষ্টাইনের যুদ্ধে অকেজো অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের জন্য দায়ী জেনারেল সিরি আমেরকে মিশরের যুদ্ধমন্ত্রী নিযুক্ত করতে মনস্থ করলেন।

১০ই জুলাই, ১৯৫২।

ফ্রি-অফিসাররা কায়রোয় মিলিত হলেন। ঘৃণ্য সিরি আমেরকে মিশরের যুদ্ধমন্ত্রী নিয়োগের সম্ভাবনায় তাঁরা বিচলিত হয়ে উঠলেন। সিরি আমেরকে যুদ্ধমন্ত্রী হতে দেওয়া হবে না, এবং সামরিক বাহিনী তাঁর নিয়োগ বা আদেশ মানবে না—তারা এই শপথ গ্রহণ করলেন। এ কথাও নাসের ঘোষণা করলেন যে এতদিন প্রস্তুতির পর সেনা-বাহিনীর পক্ষে মিশরের ক্ষমতা অধিকার করা এখন সম্ভব। সুতরাং সব দিক আলোচনা করে বিদ্রোহের দিন স্থির করা প্রয়োজন।

৫ই অগাষ্ট সেইদিন নির্দিষ্ট হল।

কিন্তু ২০শে জুলাই ফ্রি-অফিসাররা জানতে পারলেন যে ফারুক সিরি আমেরের যুদ্ধমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগে সেনাবাহিনীর মত-বিরুদ্ধেও স্থির-প্রতিজ্ঞ। এই নিয়োগের পরেই চোদ্দজন ফ্রি-অফিসারকে কারারুদ্ধ করা হবে—এ সংবাদও তাঁরা পেলেন।

আর বিলম্ব নয়। এখনই সামরিক অভ্যুত্থান করতে হবে। ২২শে জুলাই এই অভ্যুত্থানের দিন স্থির হল।

মাঝে মাত্র একদিন। তাহোক, তখনই অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা তৈরি করতে বসে গেলেন তাঁরা। বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করলেন নাসের, আমের, কামাল এল-দিন হুসেন ও জাকারিয়া মহিউদ্দীন। স্থির হল যে ত্রয়োদশ বাহিনী অধিকার করবে সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টার্স। সেই সঙ্গে অন্যান্য সেনাবাহিনীরা আলমাজা বিমানবন্দর, রেডিও স্টেশন, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি অধিকার করে সদলে হেড কোয়ার্টার্সের দিকে এগিয়ে আসবে।

২২শে জুলাই। বিদ্রোহের দিন।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় ফ্রি অফিসারেরা সংবাদ পেলেন যে হেড কোয়ার্টার্স তাদের ক্ষমতা অধিকারের কথা জানতে পেরে গেছে। প্রবীণ সামরিক অফিসারেরা সেখানে মন্ত্রণাসভা বসিয়েছেন। হয়তো তাঁরা এতক্ষণে সৈন্য সংগ্রহ করে বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু এখন আর ফেরার পথ নেই। ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়েছে। মিশরের সর্বত্রই সামরিক বাহিনী বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত, এখন কায়রো পিছিয়ে আসতে পারে না। সংগ্রাম যদি বাঁধে তো বাঁধুক।

এদিকে প্রতিটি সামরিক বাহিনী অতি উৎসাহে নির্ধারিত সময়ের কিছু আগেই আঘাত হেনে বসল। হেড কোয়ার্টার ঘিরে ধরল মিশরের ত্রয়োদশ বাহিনী। সেখানকার প্রধান অফিসারেরা লোক দেখানো প্রতিরোধ করে আত্ম-সমর্পণ করলেন।

কায়রোর পতন হল।

ফারুক তখন আলেকজান্দ্রিয়ায়। ২৪শে জুলাই সন্ধ্যার মধ্যে জাকারিয়া মহিউদ্দীন আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার করে নিলেন। গামাল সালেম ও সালাহ সালেম অধিকার করলেন সিনাই উপকূলের বিরাট সামরিক ঘাঁটি এল-আরিস্।

সমস্ত ব্যাপারই নির্ঝঞ্ঝাটে পরিকল্পনামত সফল হল। শুধু একটি মাত্র সন্দেহ রয়ে গেল। ব্রিটেন কি করবে? সুয়েজ অঞ্চলে অবস্থিত ব্রিটিশবাহিনী কি মিশরের আভ্যন্তরীন বিপ্লবে হস্তক্ষেপ করবে?—এই হস্তক্ষেপ বন্ধ করতেই হবে।

দেরী করলে আর চলবে না।

২৩শে জুলাই সকালবেলাতেই নেগুইবকে তাঁর বাড়ি থেকে ডেকে এনে বিপ্লব পরিষদের প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা হল। পরদিনই এই বিপ্লব পরিষদের পক্ষে প্রেসিডেন্ট নেগুইব আলি মেহের পাশাকে প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করলেন।

আলেকজান্দ্রিয়ায় ফারুকের কাছে বিপ্লব পরিষদ আলি মেহের পাশার হাত দিয়ে এক দাবী পত্র পাঠালেন, দাবীগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল নেগুইবকে সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ এবং রাজার প্রিয়পাত্র সমস্ত কর্মচারীদের বরখাস্ত করা। এই বিপ্লবে ফারুক সিংহাসনচ্যুত হলেন না দেখে তিনি সব কটি দাবীই মেনে নিলেন। ফারুকের সম্মতি নিয়ে আলি মেহের পাশা ফিরে এলেন কায়রোয়।

কিন্তু ফারুককে সিংহাসনে রাখার জন্য তো এই বিপ্লব নয়। ফারুকের সম্মতি গ্রহণের ছলনা শুধু ব্রিটিশদের হস্তক্ষেপে বাধা দেওয়ার জন্যই।

ব্রিটিশ একটি কথা বলল না।

২৬শে জুলাই সকালবেলায় মিশরের ট্যাঙ্কবাহিনী আলেকজান্দ্রিয়ায় রস-এল-তিন রাজপ্রাসাদ চতুর্দিক দিয়ে বেষ্টন করে ফেলল। রাজ-রক্ষীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু তারা পরাজিত হয়ে পরাভূত হল। ফারুকের হাতে দেওয়া হল তাঁর সিংহাসন-ত্যাগ পত্র সই করতে। তাঁর হাত থর থর করে কাঁপছিল, প্রথমে সই করতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন বিপ্লব পরিষদ প্রয়োজন হলে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হবে না। তখন তিনি তাঁর সিংহাসন ত্যাগ করতে স্বীকৃত হয়ে তাঁর নাবালক পুত্র আহমেদ ফুয়াদকে রাজা মনোনীত করলেন। সেইদিনই রাণী নরিম্যান ও ফুয়াদকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মিশর ত্যাগ করে নেপলস্ চলে গেলেন।

বিপ্লব পরিষদ মিশরে ক্ষমতাসীন হল।

শুধুমাত্র অপদার্থ রাজা ফারুকের সিংহাসন-ত্যাগই কি এই ফ্রি অফিসারেরা চেয়েছিলেন? মোহম্মদ আলির বংশধরদের হাত থেকে শাসনভার কেড়ে নেওয়াতেই কি এই বিপ্লব শেষ হয়ে যাবে? এই সামরিক অভ্যুত্থানের শরিকরা আবার কি ফিরে যাবে তাদের সামরিক ঘাঁটিতে? মিশরের কর্তৃত্বের ভার কি তুলে দিতে হবে দুর্নীতি-দুষ্ট রাজনৈতিক দলগুলির হাতেই? এর জন্যই কি এত প্রস্তুতি, এত ত্যাগ?

বিপ্লবের সময় ওয়াফদিষ্ট পার্টির নেতা নাহাশ পাশা আর ফুয়াদ সেরাজুদ্দীন ছিলেন ফ্রান্সে, রিভিয়েরাতে। ফারুকের পতনের সংবাদ শুনেই তাঁরা ছুটে এলেন মিশরে। বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ওয়াফদিষ্ট

পার্টি—জনগণের একমাত্র আশা, ভরসা। শাসনক্ষমতা এখন তাঁদেরই প্রাপ্য।

কিন্তু নাসেরের কাছে এই দুই বৃদ্ধ অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ বুদ্ধির খেলায় অত্যন্ত শিশু। ওয়াফদিষ্ট পার্টির সবচেয়ে বড় এবং শক্ত ঘাঁটি নীল নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চল। নাহাশ পাশা আর সেরাজুদ্দীন মিশরে আসামাত্র নাসের বিপ্লব পরিষদের নেতা হিসেবে নেগুইবকে ওই অঞ্চল পরিভ্রমণ করতে পাঠালেন। ফারুকের কুশাসন-মুক্ত জনতা স্বভাবতই মুক্তিদাতা বিপ্লব পরিষদের নেতা জেনারেল নেগুইবকে যে সম্বর্ধনা জানাল—তা মিশরের ইতিহাসে অভাবনীয়। লোকের মুখে মুখে ধ্বনিত হতে লাগল—'নেগুইব', 'নেগুইব'। ওয়াফদিষ্ট পার্টির দুই নেতা তাঁদের নিজেদের ঘাঁটিতে বসে দেখলেন জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দোচ্ছ্বাস, অভিনন্দন—বুঝলেন জনতার কাছে ওয়াফদিষ্ট পার্টি আজ আর কিছু নয়। আজ তাঁদের এতদিনকার জনপ্রিয়তাকে ছাইগাদায় ছুঁড়ে ফেলে একমেবাদ্বিতীয়ম হয়ে উঠেছেন নেগুইব এবং বিপ্লব পরিষদ। মিশরের মুকুটহীন সম্রাট নাহাশ পাশা আজ খোঁড়া রেসের ঘোড়ার মতই বাতিল।

নাসের রাজনৈতিক দলগুলিকে তাদের স্বরূপ দেখাতে চেয়েছিলেন, সেদিক দিয়ে সফল হলেন। কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকী। রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপ বন্ধ করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলগুলির প্রচুর অর্থ ও সম্পদ। এই অর্থ নিয়ে তারা কম কেলেঙ্কারির সঙ্গেও জড়িত নয়।

বিপ্লব পরিষদ একটি নতুন আইন প্রণয়ন করে আদেশ করল যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক কর্মসূচী, সংগঠন এবং ধনসম্পদের পূর্ণ তালিকা দাখিল করতে হবে। তারপর ১৯৫৩ সনের জানুয়ারি মাসে মিশরের সমস্ত রাজনৈতিক দল অবৈধ বলে ঘোষণা করা হল এবং তাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিল।

১৮ই জুন, ১৯৫৩ সনে মিশরে রাজতন্ত্র শেষ হল।

দেশ-শাসনের ভার নিল বিপ্লব পরিষদ। জেনারেল নেগুইব হলেন প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী এবং নাসের হলেন সহকারী প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

কিন্তু বিরোধ বাঁধল নেগুইবকে নিয়ে। নেগুইব মানুষ হিসেবে চমৎকার। তাঁর জন্যই এই বিপ্লব দেশে-বিদেশে নিন্দিত হয় নি। তাঁর মা সুদানের মেয়ে বলে সুদানে তিনি জনপ্রিয় এবং সুদানের সঙ্গে সম্প্রীতির জন্য তাঁর দাম কম নয়। কিন্তু নেগুইব বিপ্লব পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছিলেন না। তিনি যে এক-জন মেজর জেনারেল, অন্যান্য সদস্য তাঁর অধীনস্থ অনেক ছোট অফিসার—এ কথা তিনি সহজে বিস্মৃত হতে পারছিলেন না। এই ছোট অফিসারদের কথা শুনে তিনি চলবেন কি?

তাছাড়া তাঁর কেমন যেন ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে তাঁর জন্যই এই বিপ্লব সফল হয়েছে। সুতরাং তাঁর কথা সকলের শুনে চলা উচিত।

বিপ্লব পরিষদ নেগুইবকে ক্ষমতায় আর বেশিদিন রাখতে চাইছিল না, সহসা পদচ্যুত করতেও সাহস পাচ্ছিল না। নেগুইব তখনও সারা মিশরে যথেষ্ট জনপ্রিয়। কিন্তু দিন দিন নেগুইব সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিলেন। দেশের ভেতরে বাইরে বিপ্লব পরিষদের সদস্যদের তিনি সমালোচনা করতে সুরু করলেন। নেগুইবের প্ররোচনায় নেগুইবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কর্নেল সাওকি বিপ্লব পরিষদের সমালোচনা করামাত্র নাসের তাঁকে পদচ্যুত করেন। তারপর নেগুইবের সঙ্গে পরামর্শ না করেই মুসলিম ব্রাদারহুডকে তিনি অবৈধ ঘোষণা করেন।

নেগুইবের পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হল না। তিনি প্রেসিডেন্ট, তিনি প্রধান মন্ত্রী—অথচ তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করেই সমস্ত নীতি নির্ধারিত হয়। সুতরাং ১৯৫৪ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি তিনি পদ-ত্যাগ করেন এবং বিপ্লব পরিষদ তাঁর পদত্যাগ গ্রহণ করেন।

কিন্তু বিপ্লব পরিষদের অন্যতম সদস্য খালেদ মহীউদ্দিন নেগুইবের

অপসারণ মেনে নিতে চাইলেন না। তিনি রাজনৈতিক দলের হাতে শাসন-ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। নেগুইব অনেক-বারই জানিয়েছেন যে রাজনৈতিক দল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে। নেগুইব অপসৃত হলে রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতার আশা সুদূর পরাহত হবে।

সুতরাং বিপ্লব পরিষদের বিরুদ্ধে তিনি অশ্বারোহী দলের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়ালেন। নাসের গেলেন তাদের বশীভূত করতে, কিন্তু পারলেন না। তারা দাবী জানাল ঃ নেগুইবকে ফিরিয়ে এনে প্রেসিডেন্ট করতে হবে, আর খালেদ মহীউদ্দিনকে করতে হবে প্রধান মন্ত্রী। নিরুপায় নাসের স্বীকৃত হয়ে ফিরে এলেন, কিন্তু বিপ্লব পরিষদ আর সেনাবাহিনী নাসেরের পিছনে শক্ত হয়ে দাঁড়াল। নেগুইবকে ফিরিয়ে আনা হল, কিন্তু নির্বাসনে পাঠানো হল বিদ্রোহী খালেদকে। এবার নেগুইব হলেন রাষ্ট্রপতি এবং নাসের প্রধান মন্ত্রী।

নেগুইব সরকারী সফরে গেলেন খার্তুমে। সেই অবসরে নাসের অশ্বারোহী বাহিনীর বিদ্রোহী অফিসার এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতাদের কারারুদ্ধ করলেন।

নেগুইব ফিরে এলেন কায়রোতে। এবার শেষ চাল চাললেন নাসের। সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়ে নিজে পদত্যাগ করে প্রধান মন্ত্রীত্বের ভার তুলে দিলেন নেগুইবের হাতে।

নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত হয়ে রাজনৈতিক দল-পুষ্ট সমস্ত সংবাদ পত্র রাজনৈতিক দলের শাসন প্রবর্তনের জন্য একযোগে ধুয়ো তুলল।

নেগুইব পড়লেন বিপদে। এতদিন তিনি রাজনৈতিক দলের শাসন ক্ষমতার কথা বলে এসেছেন। তারা ক্ষমতায় আসীন হলে তাঁর ক্ষমতা কোথায় থাকবে? তাছাড়া যে দেশবাসী রাজনৈতিক দলের কুশাসন-মুক্ত হয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিল, তারা কি মনে করবে?

নাসেরের স্বপক্ষে বিপ্লব পরিষদ শহরে শহরে প্রবল আন্দোলন সুরু করে দিল। এই আন্দোলন রুখতে পারলেন না নেগুইব। নাসেরকে

ডেকে আবার তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ দিলেন। নাসের প্রথমেই সংবাদ পত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করলেন।

মুসলিম ব্রাদারহুডকে নাসের অবৈধ ঘোষণা করেছেন। নাসেরের জন্যই আবার মুসলিম ব্রাদারহুড শাসন-ক্ষমতা লাভ করতে পারল না। সুতরাং তারা নাসেরকে হত্যা করার গোপন ষড়যন্ত্র করতে লাগল। আলেকজান্দ্রিয়ায় এক জনসভায় তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা ব্যর্থ হল। এই ষড়যন্ত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতাদের ধরপাকড় করা হল। ছয় জনের হল ফাঁসি এবং তাদের সর্বময় কর্তা হাসান এল-হুদাইবির হল যাবজ্জীবন কারাবাস।

এই ষড়যন্ত্রের বিচারে মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে নেগুইবের যোগ-সাজসের কথাও প্রকাশ পেল। কিন্তু এ কথা কেউ বিশ্বাস করল না, এমন কি নাসেরও না—নেগুইব এত হীনমনা নন। তবু সন্দেহের শেষ রাখতে নেই। ১৪ই নভেম্বর রাষ্ট্রপতির পদ থেকে নেগুইবকে সরিয়ে দেওয়া হল।

নাসের হলেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী।

১৪

মার্চ ৫, ১৯৫৩।

রাত্রে মস্কো রেডিওয় একটি ঘোষণা শোনা গেল :

"The heart of the comrade and inspired continuer of Lenin's will, the wise leader and teacher of the Communist Party and the Soviet people—Joseph Vissarinovich Stalin—has stopped beating."

সেইদিনই ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এণ্টনি ইডেন আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব ফস্টার ডালেসকে নিয়ে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ব্যাপার আর কিছুই নয়—সুয়েজ খাল সমস্যা।

১৯৫৩ সনের জানুয়ারিতেই মিশরের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল মহম্মদ নেগুইব "ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদীদের" মিশরীয় ঘাঁটি থেকে বিতাড়িত করার কথা ঘোষণা করেছেন। পঁয়ষট্টি মাইল দীর্ঘ ও তিন মাইল প্রশস্ত ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি, আশি হাজার ব্রিটিশ সৈন্য, সুয়েজ খালের দুই তীরেই ব্রিটিশদের অসংখ্য কারখানা, অনেক তৈলাধার। নেগুইবের ওই ঘোষণার পর ব্রিটেনের পক্ষে খুব চিন্তার কথাই বটে।

সুয়েজ সমস্যা সমাধানের জন্য ইডেন একটি পরিকল্পনা তৈরি করে এনেছিলেন। ইচ্ছা যে একবার আইসেনহাওয়ারকে এই পরিকল্পনা দেখিয়ে তাঁর সম্মতি নিয়ে ব্রিটেন ও আমেরিকা এই দুই বৃহৎ শক্তি একত্রে নেগুইবের ওপর চাপ দিয়ে সেই পরিকল্পনা মেনে নিতে বাধ্য করাবে। এই পরিকল্পনায় ছিল যে ব্রিটেন তার অধিকাংশ সৈন্য সুয়েজ অঞ্চল থেকে ধাপে ধাপে অপসারণ করবে, সামান্য সংখ্যক সৈন্য সেখানে থাকবে সুয়েজ খাল অঞ্চল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।

নেগুইবের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আইসেনহাওয়ার ইডেনকে সেই

পরিকল্পনা কার্যকর করে তোলার অবাস্তবতার দিক দেখিয়ে দিলেন। ইডেন আমেরিকার সাহায্য লাভে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন। চার্চিল আমেরিকার ওপর হলেন ভীষণ বিরক্ত।

যাই হোক, নেগুইবের মনের ভাব জানবার জন্য আইসেনহাওয়ার নেগুইবকে একটা চিঠি লিখলেন। সেই চিঠিতে মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা রক্ষায় মিশর ও ব্রিটেনের যুক্ত দায়িত্বের সম্বন্ধে সচেতন করে দিলেন। নেগুইব আইসেনহাওয়ারকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর কথা সব স্বীকার করে নিয়েও স্পষ্টই জানালেন যে ব্রিটেন ও মিশরের মধ্যে হৃদ্যতা চিরস্থায়ী হতে পারত এবং নিজেদের মধ্যে বোঝাবুঝিও সহজ হতে পারত, কিন্তু তার প্রথম এবং প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে "destructively persistent stationing of British armed forces on Egyptian Territory."

স্যুয়েজ অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের জন্য মিশর দাবী জানাতেই ব্রিটেন তার পরিকল্পনা মিশরের কাছে পেশ করল। ইডেন জানিয়ে দিলেন যে তাঁর প্রস্তাবিত পরিকল্পনার প্রতিটি শর্ত মিশরের বিনা আপত্তিতে মেনে নিতে হবে। নেগুইব তাঁর কথায় অটল। ধাপে ধাপে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের বিষয় তিনি ভেবে দেখতে পারেন, কিন্তু ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটিতে যে সৈন্য থাকবে তার কর্তৃত্ব থাকবে কার হাতে এই নিয়ে বাঁধল বিরোধ।

ইডেন বললেন,—এই সৈন্যদের কাছে আদেশ যাবে সরাসরি লণ্ডন থেকে। নেগুইব জানালেন—না, তা হতে পারে না। লণ্ডন আদেশ পাঠাবে কায়রোয় মিশরীয় কর্তৃপক্ষের কাছে। মিশর সে আদেশ বিবেচনা করে স্যুয়েজস্থিত সৈন্যবাহিনীকে জানাবে।

ইডেন আর নেগুইব দুজনেই এক চুল নড়তে রাজি হলেন না। আইসেনহাওয়ার এই বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য ডালেস আর স্ট্যাসেনকে কায়রোয় পাঠালেন, কিন্তু কোন লাভ হল না।

আলোচনা ভেঙে গেল।

আইসেনহাওয়ার চার্চিলকে লিখলেন যে সুয়েজস্থিত ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটিতে ব্রিটিশের মিত্র যে-কোন আরব-শক্তির সৈন্যবাহিনী রাখার ব্যবস্থা করলে নেগুইবকে হয়তো রাজি করানো যেতে পারে। কিন্তু চার্চিল আইসেনহাওয়ারের গায়ে-পড়া পরামর্শে বিরক্ত হলেন। জানালেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করার জন্য আইসেন-হাওয়ার মিশরের পক্ষ টানছেন। সুতরাং আইসেনহাওয়ার হাতগুটিয়ে নিতে বাধ্য হলেন।

৩০শে জুলাই, ১৯৫৩। ব্রিটিশ আবার এল কায়রোয় এক নতুন পরিকল্পনা নিয়ে। কিন্তু শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্রিটেনের রক্ষণশীল দল ঘোষণা করে বসল : মিশর থেকে একটিও ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ করা চলবে না।

সুতরাং আলাপ-আলোচনা বাতিল হয়ে গেল। সুয়েজ সমস্যার কোন সমাধান হল না।

এদিকে রাশিয়াও চুপ করে বসে নেই। রাশিয়া ধীরে ধীরে মধ্যপ্রাচ্যে তার প্রভাব বিস্তার করতে সুরু করল।

সশঙ্ক হয়ে উঠল ব্রিটেন ও আমেরিকা।

রাশিয়াকে মধ্যপ্রাচ্যে রুখতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যে কম্যুনিজমের প্রসারকে বাধা দেবার জন্য আমেরিকা আর ব্রিটেন একটি সামরিক চুক্তির প্রস্তাব করলেন। ব্রিটিশ-ভক্ত নুরি সইদ ইরাকের প্রধান মন্ত্রী। তিনি হলেন ব্রিটিশ-আমেরিকান প্রস্তাবিত বাগদাদ প্যাক্টের পাণ্ডা। আরব রাষ্ট্রসমূহে নাসেরের জনপ্রিয়তায় তিনি ঈর্ষ্যান্বিত। তাঁর ইচ্ছা, আরব জাতির অবিসম্বাদী নেতা হন তিনি ; কিন্তু সে-পথে একমাত্র অন্তরায় নাসের।

নুরি এবং নাসেরের দৃষ্টিভঙ্গীও সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী। নুরি মনে করতেন যে পাশ্চাত্য শক্তির মিত্র-রূপে থাকাই আরবদের বাঞ্ছনীয়

এবং কম্যুনিজমকে ঠেকিয়ে রাখা উচিত। কিন্তু নাসের মনে করতেন যে পাশ্চাত্য শক্তির মিত্রতার আর এক অর্থ তাদের দাসত্ব, যদিও নাসেরও আরব-কম্যুনিষ্টদের ওপর খুশি ছিলেন না।

সুতরাং নাসের এই বাগদাদ প্যাক্টের ঘোরতর বিরোধিতা করলেন। তিনি নুরি সইদকে জানালেন যে এই চুক্তির ফলে ব্রিটিশ-আমেরিকান শক্তি মধ্যপ্রাচ্যে ঘাঁটি গাড়বে এবং আরব-স্বাধীনতা বিপন্ন করে তুলবে। কিন্তু কে শোনে সে কথা ? নুরি জানালেন যে এই বাগদাদ প্যাক্ট দিয়েই তিনি সমগ্র আরব জাতিকে এক সূত্রে গেঁথে তুলবেন।

ব্রিটেনের পদলেহী পাকিস্তান ও ইরান ব্রিটেনের আদেশমত এই প্যাক্টে সই করল। তুর্কীও হঠাৎ এই ব্যাপারে অতি উৎসাহী হয়ে উঠল। তুর্কীর প্রধান মন্ত্রী মান্দারাস বাগদাদে ছুটে এসে এই চুক্তিতে সই করে গেলেন। নুরির স্বপ্ন—সমস্ত আরবদের একত্রিত করা—সফল হল। বাগদাদ প্যাক্টে সই করল ব্রিটেন, তুর্কী, ইরান, পাকিস্তান ও ইরাক—এই গোষ্ঠির মধ্যে একমাত্র আরব জাতি ইরাক।

আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মিশর বরাবরই এই চুক্তির বিরোধী। সিরিয়ার প্রধান মন্ত্রী ফারিস খুরি বাগদাদ চুক্তিতে সই করতে আপত্তি জানালেন। লেবানন নীরব রইল। জর্ডনের রাজা হুসেনের আপত্তি ছিল না এই সামরিক চুক্তিতে সই করতে, কিন্তু দেশবাসীর প্রবল বিক্ষোভে তিনি শেষ পর্যন্ত সই করতে আপত্তি জানালেন। সৌদি আরব ব্রিটিশের মিত্র হয়েও এই চুক্তিতে সই করতে অসম্মত হল শুধু একটি কারণে—এই চুক্তিতে সই করেছেন সৌদি রাজবংশের শত্রু হাসেম বংশের রাজা (ইরাক)।

সুতরাং মধ্যপ্রাচ্যে রুশ-প্রভাব বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল।

এই সময় সিরিয়ার মন্ত্রীসভা বদল হল। নতুন প্রধান মন্ত্রী হলেন সাবব্রি আল আমলি। সিরিয়া রাশিয়ার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিল, ক্রুশ্চেভও সে হাত সস্নেহে তুলে নিলেন।

বাগদাদ চুক্তি নিয়ে সিরিয়ার সঙ্গে মিশরের বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হল।

আর এই সময় থেকেই নাসের সমগ্র আরবজাতির নায়ক হয়ে দেখা দিলেন।

ট্রুমান ডকট্রিন অনুযায়ী মধ্য-প্রাচ্যে যত আমেরিকান সমর-সম্ভার বিক্রি হত, তার অর্ধেক দেওয়া হত আমেরিকার তাঁবেদার ইজরায়েলকে, বাকী অর্ধেক অন্যান্য আরব-রাষ্ট্রে বিক্রি হত। আমেরিকার ইজরায়েল-পোষণ দেখে নাসের রুশ অস্ত্রশস্ত্র কিনতে সুরু করলেন।

এ ব্যাপারে টনক নড়ল আমেরিকার পররাষ্ট্র-সচিব ফষ্টার ডালেসের। নাসেরই রাশিয়াকে মধ্য-প্রাচ্যে স্থান করে দিয়েছে, নাসেরই বাগদাদ চুক্তি সফল হতে দেয় নি—নাসেরই মধ্য-প্রাচ্যে আমেরিকার একমাত্র শত্রু। সুতরাং নাসেরকে শিক্ষা দিতে হবে।

এই সময় নীল নদীর ওপর আসোয়ান বাঁধ তৈরি করার জন্য নাসের আমেরিকা ও ব্রিটেনের কাছে অর্থ সাহায্য চাইলেন। এদিকে রাশিয়াও মিশরকে এই বাঁধের জন্য অর্থ সাহায্য করতে স্বীকৃত হল। কিন্তু নাসের রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ করলেন না। আমেরিকা ও ব্রিটেন অর্থ সাহায্য করতে প্রথমে সম্মত হল। কিন্তু ডালেস এই সাহায্যে আপত্তি জানালেন। সুতরাং অনেকদিন টালবাহানা করে ১৯৫৬ সনের ১৯শে জুন আমেরিকা ঘোষণা করল যে তারা মিশরকে অর্থ সাহায্য করতে পারবে না। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনও জানাল যে তাদের পক্ষেও সাহায্য করা সম্ভব নয়।

নাসের বুঝলেন ইঙ্গ-আমেরিকান খেলা। অনন্যোপায় হয়ে তিনি স্থির করলেন যে আসোয়ান বাঁধের জন্য কোন দেশের কাছ থেকেই তিনি সাহায্য গ্রহণ করবেন না।

২৬শে জুন আলেকজান্দ্রিয়ায় এক জনসভায় তিনি ঘোষণা করলেন : সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানি মিশর রাষ্ট্রীয়করণ করবে এবং এই কোম্পানির আয় থেকেই তিনি আসোয়ান বাঁধ নির্মাণ করবেন।

কোনও রাষ্ট্রের কাছে তিনি আর ভিক্ষার হাত পাতবেন না। সাম্রাজ্য-বাদী শক্তিরা ব্যর্থ আক্রোশে তাদের হাত কামড়িয়ে মরুক।
হাজার হাজার আলেকজান্দ্রিয়াবাসী তুমুল উল্লাস-ধ্বনিতে তাঁকে অভিনন্দিত করল।

এ সংবাদ ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী এণ্টনি ইডেন পেলেন ডিনার টেবিলে বসে। তিনি তখন বাগদাদ প্যাক্টের নাটের গুরু ইরাকের রাজা ফয়জলকে নৈশ-ভোজে আপ্যায়িত করছিলেন।
ফয়জলের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে সেই রাত্রেই ক্যাবিনেটের মিটিং ডাকলেন। সুয়েজ খাল ব্রিটিশ জাতির প্রাণস্বরূপ, এই খাল হাতছাড়া হলে ব্রিটেনের ধন-মান-প্রাণ সবই যাবে। এর প্রতিশোধ নিতে হবে।
সমগ্র ব্রিটিশ জাতি এই ব্যাপারে এক হল।
ফ্রান্সও উত্তেজিত হল। সুয়েজ খালের অংশীদার ব্রিটেন ও ফ্রান্স। সুয়েজ খাল হাতছাড়া হলে তাদের লাভের বখরা আসবে কোথা থেকে?
নাসেরের বিরুদ্ধে এই দুই দেশের রাগের আরো কারণ ছিল। ব্রিটেন মনে করে যে জর্ডন সেনাবাহিনীর ব্রিটিশ জেনারেল গ্লাব পাশাকে পদচ্যুত করার মূলে আছে নাসেরের হাত। আর ফ্রান্সের দৃঢ় সন্দেহ আলজেরিয়ায় ফরাসীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উসকানি দিচ্ছেন নাসের। সুতরাং সমব্যথী দুই রাষ্ট্র ফ্রান্স ও ব্রিটেন আমেরিকার কাছে ধর্না দিল। বাগদাদ চুক্তি নিয়ে আইসেনহাওয়ারের রাগ নাসেরের ওপর কম নয়, কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে নাসেরের এক চালে এরকম বেকায়দায় পড়তে দেখে তিনি মনে মনে হাসলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের একটি বৈঠক আহ্বান করে কর্তব্য স্থির করা উচিত।
ইডেন ডাকলেন কমনওয়েলথ রাষ্ট্রসমূহের বৈঠক।

বৈঠক বসল। বৈঠকে স্থির হল, অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মেনেজিস কায়রোতে গিয়ে নাসেরকে সুয়েজ খাল রাষ্ট্রীয়করণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবেন।

মেনেজিস-মিশন ব্যর্থ হল। নাসেরকে ভয় দেখানো হল, কিন্তু নাসের ভয় পেলেন না।

আইসেনহাওয়ার একটি কথাও বললেন না। আমেরিকা মধ্য-প্রাচ্যের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে ব্রিটিশের কথামত মাথা গলাতে গিয়ে জনপ্রিয়তা যথেষ্ট হারিয়েছে, আর বেশি বাড়াবাড়ি করতে গেলে যতটুকু প্রভাব এখনো আছে তা-ও যাবে। সুতরাং ব্রিটিশের কথায় আমেরিকা এবার আর নাচতে প্রস্তুত হল না।

এণ্টনি ইডেন আইসেনহাওয়ারের এই নিরপেক্ষতায় ভীষণ চটে গেলেন। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তি ব্রিটেন তখন আর প্রথম শ্রেণীর শক্তি আমেরিকার ওপর জোর খাটাতে পারে না। ব্রিটেন চুপ করে গেল।

কিন্তু ব্রিটেনের অধিবাসী বিশেষতঃ ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল দল ইডেনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। মিশরকে উপযুক্ত জবাব দিতেই হবে। ব্রিটিশরা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে ইডেনের ভবিষ্যৎ কার্যনীতির জন্য।

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬। হাউস অব কমন্‌স্।

ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল দল ও বিরুদ্ধ শ্রমিক দলের প্রতিটি সদস্য সেদিন পার্লামেণ্টে উপস্থিত। ভিজিটর্স গ্যালারিতেও সেদিন তিল ধারণের স্থান নেই। সর্বত্রই প্রবল উত্তেজনা। আজ ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী এণ্টনি ইডেন মিশরের সুয়েজ খাল রাষ্ট্রীয়করণ সম্বন্ধে সরকারী নীতি ঘোষণা করবেন।

ইডেন জানালেন—ব্রিটিশ সরকার মিশরের এই একতরফা ব্যবস্থা কোনমতেই মেনে নিতে পারে না। সমস্ত রকম ভাবে ব্রিটেন মিশরের এই অবৈধ কাজে বাধা দেবে।

উপসংহারে সদম্ভে ঘোষণা করলেন—"I refuse to renounce the

possibility of force."

এবার ইডেন শরণাপন্ন হলেন ফ্রান্সের। ফ্রান্সও বিক্ষুব্ধ রাষ্ট্র। মিশরের এই কাজে ফ্রান্সের ক্ষতিও কম নয়। সুতরাং নাসেরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ফ্রান্সকে ইডেন ব্রিটেনের দলে টানবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু মিশরের সঙ্গে কলহের জন্য একটি সাক্ষীগোপাল প্রয়োজন। ব্রিটেনের মানস-সন্তান ইজ রায়েল সেই ভূমিকা নিতে তৈরি। আকাবা উপসাগর ও তিরাণ প্রণালী মিশরের হাতে। এই সমুদ্রখণ্ডের প্রহরী হয়েছে সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণ বিন্দুতে শারম-এল-শেখ। মিশরের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি। এই শারম-এল-শেখে মিশরের অবস্থিতির জন্যই ইজরায়েলের এলাথ বন্দর অকেজো। সুতরাং ইজরায়েল চায় সিনাই উপত্যকা আর সেই সঙ্গে শারম-এল-শেখ দখল করতে।

মিশরের বিরুদ্ধে ইজরায়েল ঝগড়া বাঁধাতে এক কথাতেই রাজি। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী গিমলে সরাসরি মিশর আক্রমণ করতে সম্মত হলেন না। যুদ্ধ বাঁধলে আরব দেশ থেকে এক ফোঁটা তেল পাওয়া যাবে না। তাছাড়া যুদ্ধের একটা কারণ থাকাও প্রয়োজন।

ইডেন জানালেন, আরব রাজ্যসমূহের মধ্যে অবস্থিত বিভীষণ ইজরায়েলই প্রথম মিশর আক্রমণ করবে। সঙ্গে সঙ্গে তারা ঘোষণা করবে যে মিশর তাদের বিনা কারণে আক্রমণ করেছে। আমরা তখন মানবতার খাতিরে ইজরায়েলকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যাব।

শেষ পর্যন্ত গিমলে এই পরিকল্পনায় সম্মত হলেন।

গোপনে মাল্টা ও সাইপ্রাসে গিয়ে জড় হল ব্রিটিশ বাহিনী। ফ্রান্স ও ক্যানাডা থেকে অস্ত্রশস্ত্র, বিমান গিয়ে হাজির হল ইজরায়েলে। এত গোপনে এই ষড়যন্ত্র চলতে লাগল যে আমেরিকা, রাশিয়া, মিশর— পৃথিবীর কোন দেশই জানতে পারে নি এ কথা।

মিশর আক্রমণের পরিকল্পনা সুরু হয় ছাব্বিশে জুলাইয়ের পরে। চব্বিশে অক্টোবর ইডেন চূড়ান্ত পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হলেন

প্যারিসে। ইজরায়েল থেকে এলেন ইজরায়েলি প্রধান মন্ত্রী বেন গুরিয়ন। সুরু হল জতুগৃহ দাহের ব্যবস্থা।

এই যুদ্ধের পর অবশ্য এণ্টনি ইডেন অস্বীকার করেছিলেন মিশরের বিরুদ্ধে কোন রকম ষড়যন্ত্র করার কথা। এ কথাও জানিয়ে ছিলেন যে মিশর আক্রমণ করা বা ইজরায়েলকে সাহায্য করা পূর্বপরিকল্পিত নয়, কিন্তু সে কথা যে কতদূর মিথ্যা তা প্রমাণিত হয়েছে সাম্প্রতিক এক গ্রন্থে।

ব্রিটেনের পররাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী এণ্টনি নাটিং তাঁর পুস্তক "নো এণ্ড অব এ লেসন" গ্রন্থে এই সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"ইজরায়েলি প্রধান মন্ত্রী বেন গুরিয়ন আমাদের কাছে এই আশ্বাস চেয়েছিলেন যে, যে মুহূর্তে ইজরায়েলি সৈন্যবাহিনী আক্রমণ সুরু করবে, ব্রিটেন ও ফ্রান্স ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই মিশরীয় বিমান বাহিনী একেবারে ধ্বংস করে ফেলবে। এই কাজে যদি সামান্য দেরী হয় তবে নাসেরের ইলিউসিন বোম্বারদের হাতে তেল আভিভ এবং ইজরায়েলের অন্যান্য নগরী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

"এই পরিকল্পনায় প্রথমে গোলমাল বাঁধল। ব্রিটিশ চেয়েছিল যে আরব যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ঘাঁটিতে বোমা-বর্ষণ করার পূর্বে তাদের একটা চরম পত্র দেবে, কিন্তু বেন গুরিয়ন জোর করতে লাগলেন সর্বাগ্রে মিশরীয় বিমান ঘাঁটিতে বোমা-বর্ষণ। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশদের হার মানতে হল এবং ইজরায়েলি নগরীগুলিকে মিশরীয় বোমার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মিশরীয় বিমান ঘাঁটিতে বোমা-বর্ষণ প্রভৃতি ইজরায়েলিদের সমস্ত দাবীতে তাদের স্বীকৃত হতে হল।"

৩১ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬।

সকাল সাড়ে সাতটায় হঠাৎ মিশরের আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে ব্রিটেনের রয়েল এয়ার ফোর্সের বিমান হানা দিল। বোমা-বর্ষণ সুরু হল মিশরীয় বিমান ঘাঁটিতে, মিশরের তৈলখনি অঞ্চলে।

সেই সঙ্গে ইজরায়েলের সাঁজোয়া বাহিনী ফাঁকা মাঠ পেয়ে ছুটে চলল সিনাই মরুভূমি, গাজা অঞ্চল ধরে সুয়েজের দিকে। ফ্রান্স ও ব্রিটেন পিছিয়ে রইল না। সুয়েজ আক্রান্ত হল তিন দিক দিয়ে।

মিশর দারুণ প্রতিবাদ জানাল এই গায়ে-পড়া যুদ্ধের জন্য, বিশেষত ব্রিটিশের হীন চক্রান্তে। ব্রিটেন জানাল—মিশর ইজরায়েল আক্রমণ করেছে বলেই তারা ইজরায়েলকে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছে। যতক্ষণ না মিশর ইজরায়েল অভিযান বন্ধ করবে ততক্ষণ ব্রিটেন আর ফ্রান্স লড়াই করে যাবে।

এ কথা বিশ্বাস করল না কোন দেশ, কারণ ইজরায়েলের ধারে কাছে মিশরের একটি সৈন্যও দেখা যায় নি। আর কোন দেশ আক্রমণ করতে হলে কিছুটা প্রস্তুতি থাকা দরকার, কিন্তু মিশরের কোন প্রস্তুতিই দেখা যায় নি।

সর্বত্রই মিশরের নিদারুণ পরাজয় হতে লাগল। ব্রিটিশ সহযোগিতায় ইজরায়েল অধিকার করল তাদের চির-বাঞ্ছিত শারম-এল-শেখ। সিনাই তাদের অধিকারে এল। ব্রিটেন তাদের এই বীরত্বে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়াল।

আমেরিকা ব্রিটেনকে কড়া নোট দিল। আইসেনহাওয়ার স্পষ্ট ইডেনকে জানালেন যে ব্রিটেনের এই ভণ্ডামি আমেরিকা সহ্য করবে না। এই যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

পৃথিবীর সমস্ত দেশ রাষ্ট্রসঙ্ঘে মিলিত হয়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইজায়েলকে নিন্দা করল। কিন্তু যুদ্ধ থামল না।

সকলের প্রতিবাদের ওপরে এবার একটি পুরুষ-সিংহের কণ্ঠ শোনা গেল। তিনি হলেন রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভ। তিনি ইডেনকে কড়া ধমকিয়ে বললেন—ব্রিটেন আজ অসহায় ও দুর্বল মিশরের বিরুদ্ধে অহেতুক ঘৃণ্য যুদ্ধে মত্ত হয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে, কিন্তু ব্রিটেন যেন ভুলে না যায় যে তার চেয়েও অনেক শক্তিশালী দেশ পৃথিবীতে অন্ততঃ এখনও একটি আছে যার একটিমাত্র বিধ্বংসী অস্ত্রে

সমস্ত ব্রিটেন তার দম্ভ ও আত্মপ্রসাদ নিয়ে সমুদ্রের অতলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। আর এই সব বিধ্বংসী অস্ত্র বহনের জন্য কোন বাহনের প্রয়োজন হয় না।

ক্রুশ্চেভের এক সিংহ-গর্জনে ব্রিটেন লেজ গুটিয়ে পশ্চাদপসরণ করল। যুদ্ধ-বিজয়ী ব্রিটেন কলঙ্কের কালিমা মুখে মেখে আবার নিজের কোটরে ফিরে এল। ফ্রান্সও তার বন্ধুর অনুগমন করল। সুয়েজ দখল করা আর তাদের হল না।

রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী এসে নামল মিশরে। নির্লজ্জ ইজরায়েলকে দূর করে দিল তাদের সীমানার অভ্যন্তরে।

৬ই নভেম্বের ১১-৫৫ মিনিটে যুদ্ধ-বিরতি। ১৯শে নভেম্বর ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী এণ্টনি ইডেন অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে তাঁর ডাউনিং স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে জামাইকার পথে যাত্রা করলেন। সেই যাত্রাই তাঁর কলঙ্কিত রাজনৈতিক জীবনের সমাধি। আর তিনি ফিরতে পারেন নি সক্রিয় রাজনীতিতে।

তাঁর দম্ভোক্তি "Nasser must be destroyed" উপহসিত হল। নাসের আজও পূর্ণ মর্যাদায় আরব জগতে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ইডেনের নাম এখন আর পৃথিবী জানে না।

যুদ্ধে পরাজিত হয়েও বিজয়ী বীরের সম্মান পেলেন নাসের।

১৫

আরব জগতে চরম বিপর্যয় ও লজ্জার দিন এসেছিল সেদিন, যেদিন তাদের হাত থেকে স্পেন চিরকালের জন্য বেদখল হয়।

দ্বিতীয় লজ্জা ও বিপর্যয়ের ক্ষণ প্যালেস্টাইনের যুদ্ধে নিদারুণ পরাজয়।

আরববাসীরা লজ্জা, অপমান এবং গভীর নৈরাশ্যে অন্ধকার কোটরে মুখ লুকিয়ে বসে রইল। হত-চৈতন্যের ভাব কেটে গেলে পর যখন তারা চোখ মেলে চাইল তখন তাদের দেশের বুকের ওপরে ব্রিটেন ও আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি ইজরায়েল সুপ্রতিষ্ঠিত।

দেশের জনগণকে এই নৈরাশ্য, এই হতমান ও এই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য দেশনায়কেরা জোর গলায় আরবদের মনে অতীত ঐতিহ্য ও অতীত গৌরবময় দিনের স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। বাগাড়ম্বরের ফাঁপা চাতুরিতে দেশের বাস্তব চেতনাকে রঙিন স্বপ্নের মৌতাতে বুঁদ রাখতে তাঁরা সচেষ্ট হলেন।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে জনসাধারণের মনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল বিক্ষোভ আর অসন্তোষ। এই পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারে নি সামরিক বাহিনী। এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী কে?—এই প্রশ্নের উত্তর তারা পেয়েছিল। দেশের শাসকগোষ্ঠির অপরিণামদর্শিতা, সামরিক শক্তিকে উন্নীত করার ব্যর্থতা, স্বার্থপরায়ণতা, দুরাচার, ঈর্ষ্যা, দ্বন্দ্ব ও অসহিষ্ণুতার জন্যই যে তাদের এই লজ্জা ও অপমান—তা বুঝতে পেরে সকলেই শাসকগোষ্ঠির ওপর বীতশ্রদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এই শাসকগোষ্ঠির হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। সমগ্র আরবে বিপ্লব ও বিদ্রোহের ক্ষেত্র ধীরে ধীরে প্রস্তুত হতে লাগল।

প্রথম আঘাত লাগল সিরিয়ায়।

প্যালেষ্টাইন যুদ্ধে পরাজয়ের পর আরবভূমিতে প্রথম বিপ্লবের স্বাদ পেল সিরিয়া।

সিরিয়ার শাসন-ক্ষমতা তখন ন্যাশানাল ব্লক দলের হাতে। গোঁড়া জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল এই ন্যাশানাল ব্লক। কায়েমি স্বার্থরক্ষায় তৎপর এই দলের শাসনে দেশে তখন জনসাধারণের দুঃখ ও দুর্দশা চরমে উঠেছে। সকলেই শাসকগোষ্ঠির ওপর তিতিবিরক্ত।

কর্নেল হুসনি এজ-জইম এই সুযোগ গ্রহণ করলেন ১৯৪৯ সনে।

১৯৪৮ সনে প্যালেষ্টাইনের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর থেকেই তিনি এবং সামরিক বাহিনীর অপর কয়েকজন অফিসার জনস্বার্থের প্রতি উদাসীন এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। প্যালেষ্টাইন যুদ্ধে পরাজয়ের কারণও এই সরকারের ব্যর্থতা। তাঁরা এই পরাজয় ভুলতে পারেন নি—তাঁরা ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

হঠাৎ একদিন কর্নেল জইম তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে এই শাসক-গোষ্ঠির বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ালেন। সিরিয়ার মন্ত্রীমণ্ডলী কল্পনাও করতে পারেন নি যে কোথাও বিপ্লবের প্রস্তুতি চলছিল। সেনাবাহিনী প্রথমেই আঘাত দিল দামাস্কাসে সরকারী প্রধান দপ্তরে এবং সঙ্গে সঙ্গে রেডিও অফিসে। শাসক-গোষ্ঠি কি হয়েছে ধারনা করবার পূর্বেই দামাস্কাস রেডিওতে জরুরী ঘোষণা শুনলেন: দামাস্কাস সামরিক কর্তৃত্বাধীনে এসেছে। কর্নেল হুসনি এজ-জইমের নেতৃত্বাধীনে এক বিপ্লব পরিষদ দেশের শাসন-ভার গ্রহণ করেছে।

দেশের লোক আনন্দে অধীর হয়ে উঠল। দলে দলে তারা মিছিল নিয়ে বের হল প্রতি শহরের রাস্তায় রাস্তায়। অনর্গল তারা আনন্দধ্বনি দিয়ে যেতে লাগল—জইম! জইম! সিরিয়ার কামাল আতাতুর্ক। আর ভয় নেই।

দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-প্রবাহে ভেসে গেল ন্যাশানাল ব্লকের

প্রতিরোধ প্রচেষ্টা'। সামরিক কর্তৃপক্ষের আর বিশেষ কিছু করতে হল না। জইমের বিপ্লব পরিষদকে স্বাগত জানাল সিরিয়ার জনগণ।

এই সংবাদ প্রবল আলোড়ন তুলল ইরাক, লেবানন আর মিশরে। এই দেশগুলির আরব অধিবাসীরা অভিনন্দন জানাল সিরিয়ার জনগণকে। সিরিয়ার তুর্নীতিপরায়ণ শাসকগোষ্ঠির পতন হয়েছে, দেশবাসী কুশাসনের হাত থেকে মুক্তি লাভ করেছে—তাদের দেশেও এই সুদিন আসবে কবে?

জইম! সিরিয়ার রক্ষাকর্তা। আরবজাতির ভ্রাতা। এক নতুন আতাতুর্ক।

সমগ্র আরব জগৎ তাকিয়ে রইল জইমের দিকে।

কিন্তু কোথায় আতাতুর্ক, আর কোথায় জইম! সেই কর্মক্ষমতা, দূরদৃষ্টি, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী—সবার ওপরে সমস্ত প্রতিবন্ধক চূর্ণ করার সাহস জইমের কোথায়? জইম একজন সৎ এবং জনপ্রিয় সামরিক অফিসার মাত্র। কাজ করতে জানেন, কাজ করাতে জানেন—কিন্তু তার ফল কি হতে পারে তা বোঝবার ক্ষমতা নেই। কোন রাজনৈতিক জ্ঞান নেই।

সুতরাং কামাল আতাতুর্কের মত দেশের গোঁড়ামিতে আঘাত দিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। চাষী ও দরিদ্রের তুঃখ-তুর্দশা লাঘবের জন্য আইনগত ব্যবস্থা করলেন, তারা অনেক সুখ-সুবিধা লাভ করল। সবচেয়ে বৈপ্লবিক কাজ হল যে সিরিয়াতে নারীজাতি পুরুষদের সঙ্গে সমান রাজনৈতিক অধিকার পেল। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তিনি মতি স্থির করে উঠতে পারছিলেন না। প্রথমে তিনি ইরাকের নুরি সইদের কীর্তিকলাপে মুগ্ধ হয়ে স্থির করলেন যে ইরাক ও সিরিয়াকে একত্র করে একটি রাষ্ট্র গঠন করবেন, কিন্তু কয়েকদিন পরেই তাঁর আমন্ত্রণ এল মিশর থেকে। মিশর সফর শেষ করে এসে তিনি মিশর ও সৌদি আরবপন্থী হয়ে উঠলেন এবং ইরাক ও জর্ডনের বিরুদ্ধাচরণ করতে প্রবৃত্ত হলেন।

নেতৃত্বের মোহে জইম একটা মারাত্মক ভুল করেছিলেন। যে সামরিক বাহিনীর সক্রিয় সহায়তায় তিনি এই দেশের নেতা, তিনি সেই সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সব সময়ে মানিয়ে চলতে পারছিলেন না। এক এক সময় সামরিক অফিসারদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার খুব রূঢ় হয়ে পড়ত।

বিক্ষুব্ধ সামরিক অফিসারেরা গোপনে মিলিত হলেন। জইমের শাসন পতনের আলোচনা হল। যদি জইম সামরিক অভ্যুত্থান করে শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করতে পারেন, তবে তাঁরাই বা পারবেন না কেন ?

চলল গোপন প্রস্তুতি। একদিন হঠাৎ দামাস্কাস প্রবল সামরিক বিপ্লবে আলোড়িত হয়ে উঠল। জইম এই বিপ্লবীদের হাতে বন্দী হলেন। দেশের শাসন-ক্ষমতা নতুন বিপ্লবীরা হস্তগত করল বটে, কিন্তু দেশবাসীর কাছে জইম তখনও জনপ্রিয়। সুতরাং এবারে আর এই নতুন বিপ্লব পরিষদের অভ্যুত্থানে সিরিয়াবাসীরা আনন্দোৎসবে মত্ত হল না। নতুন বিপ্লব পরিষদ দেখল যে জনগণ হয়তো জইমকে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য বিদ্রোহ করতে পারে। সুতরাং তাদের পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলার জন্য জইমকে তারা হত্যা করল।

কিন্তু এই সামরিক শাসনও বেশিদিন চলল না। পূর্বসূরীদের প্রদর্শিত পথ বেছে নিল আর এক দল সামরিক অফিসার। নতুন বিপ্লবীদের নেতা হলেন কর্নেল শিশাকলি। তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন সোশালিষ্ট পার্টির নেতা আক্রাম হুরানী। শিশাকলি এক সামরিক অভ্যুত্থানে সিরিয়ার শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করলেন।

শিশাকলি প্রথমেই দেশের সুশাসনের দিকে দৃষ্টি দিলেন। দেশের আভ্যন্তরীন দুর্নীতি তিনি কঠোর হাতে দমন করতে লাগলেন। দেশের শাসন ও সমাজ ব্যবস্থায় বিরাট এক পরিবর্তন আনলেন। মুর্খ ও দরিদ্র দেশবাসীর ধর্মপ্রাণতা বা অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে যে-সব ধর্ম-যাজক বা রাজনৈতিক দল এদের ভুল পথে চালিত করত বা উৎপীড়ন করত, আইন করে তিনি সে-সব বন্ধ করে দিলেন। ফলে ধনী

ব্যবসায়ী, জমিদার, রাজনৈতিক দল, ধর্ম-সংস্থা প্রভৃতি শিশাকলির ওপর অত্যন্ত চটে উঠল। যে হুরানী করেছিলেন শিশকালির বিপ্লবে সাহায্য, তিনি হয়ে উঠলেন তাঁর পরম শত্রু। তিনি গোপনে সামরিক বাহিনীর একদলকে শিশাকলির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগলেন।
এই পরিস্থিতিতে শিশাকলির আধিপত্যও বেশিদিন চলবার কথা নয়, চললও না। নিজের হাতে যদি সম্পূর্ণ শাসন-ক্ষমতা রাখায় আগ্রহী হয়ে শিশাকলি দেশকে কঠোর সামরিক শাসনের অধীনে রাখবার চেষ্টা করতেন তবে হয়তো তিনি শাসন-ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে যেতেন। কিন্তু তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গীই শেষে কাল হল।
তিনি স্থির করলেন যে সিরিয়ায় সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন। যেই স্থির করা সেই কাজ। ১৯৫৩ সনে সিরিয়ায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। দেশে আবার পার্লামেণ্টারি শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন হল। শিশাকলি সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন।
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়াতে রাজনৈতিক দলের ওপর থেকে বিধি-নিষেধ দূর হল। ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারদের অর্থ সাহায্যে রাজনৈতিক দল ও ধর্মসংস্থাগুলি আবার সামরিক বাহিনীর সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে সক্রিয় হয়ে উঠল। হুরানীর সঙ্গে হাত মেলালেন বাথ পার্টির সালা বিতার ও মিচেল আফ্লাক।
এবার আর এক সামরিক অভ্যুত্থান।
শিশাকলি শাসন-ক্ষমতা নতুন বিপ্লব পরিষদের হাতে দিয়ে দেশ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

কিন্তু শিশাকলি তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করে গিয়েছিলেন। সিরিয়াবাসীদের মনে তিনি প্রজাতন্ত্রের বীজ রোপন করে গিয়েছিলেন। সিরিয়াবাসীরা তাদের এই অধিকার ত্যাগ করতে স্বীকৃত হল না।
এই সামরিক শাসন সুতরাং সিরিয়াতে বেশিদিন টেঁকে নি। দেশে

আবার প্রজাতন্ত্রী শাসন-ব্যবস্থা ফিরে এল।

নাসের তখন আরব জগতের একচ্ছত্র নেতা।
পৃথিবীর মানচিত্রে আরবদের আবার স্থান করে দিয়েছেন নাসের।
আপামর জন-সাধারণের আশা-ভরসা, স্বপ্ন-আকাঙ্খা, আরব-স্বাধীনতার দীপ্ত প্রতীক।
আরব-ঐতিহ্যবাদী সিরিয়ায় ক্ষমতাসীন বাথ-সোসালিষ্ট পার্টির স্বপ্ন অতীতের সেই গৌরবময় যুগের, যখন এক আরব-শাসনে ইউরোপের স্পেন, আফ্রিকার মরোক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া, মিশর, সুদান, লেবানন, ইরাক, সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া এবং আরব উপদ্বীপ—তুর্কী, ইরান, আফগানিস্থান এবং ভারতে ঐশ্লামিক রাজ। এখন স্পেন তাদের হাতছাড়া, ভারতে ঐশ্লামিক রাজ নেই—কিন্তু তাছাড়া যেখানে আরব অধিকার ছিল এখনও সেই দেশগুলি আরবেরই অধিকারে। সব জড়িয়ে, সকলে একত্র হয়ে একটি আরব-রাষ্ট্র গঠন করা কি সম্ভব হবে না?
নাসের আরব একতার প্রতীক।
১৯৫৮ সনে বাথ-সোসালিষ্ট পার্টির এক প্রতিনিধি দল দেখা করল নাসেরের সঙ্গে। তারা প্রস্তাব করল যে মিশর ও সিরিয়াকে একত্র করে একটি আরব যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হোক। তারপর অন্যান্য আরব-রাষ্ট্র ইচ্ছামত একে একে এসে এই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করবে এবং এই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হবেন নাসের।
আরব একতার যিনি হোতা এবং প্রতীক সেই নাসের কিন্তু প্রথমে এই যুক্তরাষ্ট্র গঠনে সম্মত হতে পারলেন না। এই ব্যবস্থা কার্যকরী করার অনেক অসুবিধা, কিন্তু সবচেয়ে বড় অসুবিধা হয়েছে দুই দেশের শাসক-গোষ্ঠির স্বতন্ত্র লক্ষ্য। নাসেরের নিজের ভাষায় "unity of aim is more important than unity of ranks."
নাসের জানতেন যে সিরিয়ার বাথ-সোসালিষ্ট পার্টির আদর্শের সঙ্গে

তাঁর আদর্শের মিল নেই। আক্রাম হুরানীর সোসালিষ্ট পার্টি আর সালা বিতার ও মিচেল আফ্লাকের বাথ-পার্টির সংমিশ্রণে এই বাথ-সোসালিষ্ট পার্টি ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত। স্বার্থে আঘাত লাগলেই ধনী ব্যবসায়ীরা বাথ-সোসালিষ্ট পার্টির মাধ্যমে এই একতার বিরুদ্ধে যাবে।

নাসেরের আপত্তি শুনলেন না বিতার-হুরানী-আফ্লাক। নাসেরকে এই ঐক্য মেনে নিতে হল। প্রতিষ্ঠিত হল মিশর ও সিরিয়ার মিলনে এক আরব যুক্তরাষ্ট্র।

নাসের হলেন প্রেসিডেন্ট। চারজন ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা, মিশর ও সিরিয়ার জন্য দুটি পৃথক আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হল। নাসেরের একটি সর্ত ছিল যে কোন দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকতে পারবে না। বাথ-সোসালিষ্ট পার্টি প্রথমে অসম্মত হয়ে শেষ পর্যন্ত এই দল ভেঙে দেন। মিশর ও সিরিয়াতে মাত্র একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হল—ন্যাশানাল ইউনিয়ন।

কায়রো থেকে সিরিয়া শাসন করা কঠিন ছিল। নাসেরের নিজের স্বীকৃতি ঃ "Almost three-quarters of my time was spent in solving Syria's problems and overcoming its difficulties and hardships."

কিন্তু হুরানী-বিতার-আফ্লাক চক্র কিছুদিনের মধ্যেই দেখল যে নাসেরের কড়া শাসনে তাদের সুবিধা হচ্ছে না, অথচ এই মিলনের তাঁরাই প্রবর্তক বলে এই মিলন নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার অনেক অসুবিধা আছে। ধনী ব্যবসায়ী দলও নাসেরের কঠিন শাসনে বিপন্ন বোধ করছিল। সুতরাং সকলে মিলে জনসাধারণের মনে এই ধারণা প্রবেশ করিয়ে দিতে লাগল যে এই যুক্তরাষ্ট্রে মিশরীয়রা প্রধান এবং সিরিয়াবাসীরা গৌণ। অনুরূপভাবে নাসেরের বিরুদ্ধে সিরিয়ার সামরিক বাহিনীর মধ্যে নাসের-বিরোধী প্রচারকার্য চলল।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

কায়রোতে বসে নাসের সংবাদ পেলেন সিরিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। বিদ্রোহীরা দামাস্কাস অধিকার করে নিয়েছে এবং এখন তারা ছুটে চলেছে সিরিয়ার সর্বত্র তাদের অধিকার কায়েম করতে। নাসের একবার মনে করলেন যে এই বিদ্রোহ দমনে হস্তক্ষেপ করবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় রইলেন। বুঝতে পারলেন যে এই বিদ্রোহের মূল গায়েন হয়েছে বাথ-সোসালিষ্ট পার্টি, যাদের পরিচালনা করে ধনিকশ্রেণী।

তিনি জানালেন, এই বিদ্রোহের পর সিরিয়া ইচ্ছা করলে আরব যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান না-ও করতে পারে।

সিরিয়া মিশরের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করল।

নাসের মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—আমাদের ত্রুটি স্বীকার করার সাহস থাকা চাই। গত সাড়ে তিন বৎসর ধরে সিরিয়ায় আমরা অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি, অনেক ঝঞ্চাটের মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হয়েছে।

সিরিয়ার নতুন শাসকগোষ্ঠি, সেই বাথ-সোসালিষ্ট পার্টি এবার নাসেরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারণে মত্ত হল। সংবাদ-পত্র, রেডিও, বিবৃতি, ঘোষণা মারফৎ নাসেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার নিয়মিত কুৎসিৎ চেষ্টা চলল। হুরানী এই অভিযোগও করলেন যে নাসের আমেরিকার দালাল এবং আমেরিকার টাকার লোভে ইজরায়েলকে আজও আরবভূমিতে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

নাসের মর্মাহত হলেন। সিরিয়ার সঙ্গে মিলন ও বিচ্ছেদের কারণ বিশ্লেষণ করে বলেন—

"We fell victims to a dangerous illusion. We always refused to make peace with imperialism but we made the mistake of making peace with reaction."

সিরিয়ার এই সামরিক অভ্যুত্থান এবং তাদের শাসকগোষ্ঠির সম্বন্ধে

তাঁর উক্তি :

"In Syria, capitalism, feudalism and opportunism joined forces with imperialism to wipe out the gains of the masses and to strike at the socialist revolution."

১৯৬২ সনে আরব লীগের বৈঠক বসল। এই বৈঠকে সিরিয়া মিশরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের এক দীর্ঘ তালিকা পেশ করল। মিশর আর সেই বৈঠকে যোগ দিল না। আরব লীগ ত্যাগ করে মিশরের প্রতিনিধিরা ফিরে এল।

মিশরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল সিরিয়া, কিন্তু দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে এল না। রাজনৈতিক ঈর্ষ্যা ও কলহ লেগে রইল অহোরহ। একের বিরুদ্ধে অপরের চক্রান্ত, নিত্য নতুন শাসকগোষ্ঠির উত্থান ও পতনে দেশবাসীর অসন্তোষ বাড়তে লাগল। নাসেরের ছবি তাদের মন থেকে একেবারে মুছে যায় নি, আবার তাদের নাসের-প্রীতি জেগে উঠল। এই শাসকগোষ্ঠির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা অধৈর্য হয়ে উঠল।

৯ই মার্চ, ১৯৬৩।

আবার আর এক সামরিক অভ্যুত্থান সিরিয়ায়।

এবারে এই অনাচারী শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল নুরেদ্দিন আতাসী। দামাস্কাস অধিকার করেই তিনি মিশর এবং নাসেরকে অভিনন্দন জানালেন। বিপ্লবের সুরু থেকেই রেডিওয় বেজে উঠল আরব যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত। নাসের-বাদের জয় জয়কার।

আতাসীর নেতৃত্বে বিপ্লব পরিষদের প্রথম কাজ হল নাসের-বিরোধী প্রত্যেকটি লোককে শাসনযন্ত্র থেকে দূর করে দেওয়া। দ্বিতীয় কাজ হল, আরব লীগে বাথ-সোসালিষ্ট পার্টি মিশরের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ পেশ করেছিল, তা প্রত্যাহার করা। এবার আর মিশরের সঙ্গে

সিরিয়ার ঐক্যের কোন বাধা রইল না। আতাসী আবার মিশর-সিরিয়া আরব যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অভিপ্রায় জানালেন।

কিন্তু বিপ্লব যদিও করলেন আতাসী, শাসনক্ষমতা চলে গেল বাথ-সোসালিষ্ট পার্টির হাতে। তারা চাইল না এই ঐক্য, আতাসীর এই অভিপ্রায়ে তারা প্রবলভাবে বাধা দিল।

ঠিক এই সময়ে আর এক ব্যাপার ঘটে গেল। ৩১শে মার্চ আলজেরিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী কর্নেল বুমেদিন এলেন দামাস্কাসে। বুমেদিনকে অভিনন্দন জানাতে এসে জনতা নাসেরের জয়ধ্বনি দিয়ে বসল, সমস্ত দেশ মুখরিত হয়ে উঠল 'নাসের', 'নাসের' ধ্বনিতে। দামাস্কাসের পথে, ঘাটে, পার্কে আনন্দোৎসব, শোভাযাত্রা।

বাথ-সোসালিষ্ট পার্টি প্রমাদ গুনল। দামাস্কাসে কারফিউ জারি হল। নাসের-পন্থী লোকদের ধরপাকড় করতে সুরু করা হল। তারপর চলল সামরিক বাহিনী থেকে বাথ-সোসালিষ্ট পার্টি বিরোধীদের নিয়মিত তাড়ানো। এর বিরুদ্ধে একটি সামরিক বিদ্রোহ হল। এই অভ্যুত্থান নিষ্ঠুর হাতে দমন করলেন বাথ-পন্থী জেনারেল হাফেজ।

বাথ-সোসালিষ্ট পার্টি ঘোষণা করল যে এই সামরিক বিদ্রোহ নাসেরের উস্কানিতে হয়েছে, সুতরাং মিশরের সঙ্গে সিরিয়া আর যুক্তরাষ্ট্র গঠন করবে না।

নাসের প্রত্যুত্তরে ঘোষণা করলেন—ফ্যাসিস্ট নাৎসী গারদ-সরকারের সঙ্গে ঐক্যে আরব যুক্তরাষ্ট্র কখনো সম্মত হতে পারে না।

শেষ হয়ে গেল সিরিয়া ও মিশরের যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রশ্ন। বাথ-সোসালিষ্ট পার্টিরই এই স্বপ্ন, বাথ-সোসালিষ্ট পার্টিই ভেঙে দিল।

—

আবার ১৯৬৪ সনে সিরিয়ার শাসনতন্ত্রে পরিবর্তন। এবার জেনারেল হাফেজ হলেন বিপ্লব পরিষদের প্রেসিডেণ্ট। কিন্তু শাসনযন্ত্র পরিচালনার ভার পড়ল এক মন্ত্রীসভার ওপর। বাথ-সোসালিষ্ট পার্টি গঠন করল মন্ত্রীসভা। কিন্তু দেশবাসীর বিশ্বাস ও সহযোগিতার অভাবে এই

নেতৃত্ব অত্যন্ত দুর্বল এবং অপ্রিয় হয়ে উঠছিল। বাথ-সোসালিষ্ট পার্টির মধ্যেও দুটি দল দেখা দিল, একদল নাসের বিরোধিতাকে মোটেই সুনজরে দেখছিল না। তারা ধীরে ধীরে দলের মধ্যে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে লাগল। সুযোগ বুঝে জেনারেল হাফেজ এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

কিন্তু জেনারেল হাফেজকে সিরিয়াবাসীরা ভোলে নি। দামাস্কাসে পুলিশী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা এবং নিপীড়ন এত সহজে ভোলা যায় না। ১৯৬৬ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারি আবার আর এক সামরিক অভ্যুত্থান। এবার ক্ষমতাশীল হলেন আবার জেনারেল নুরেদ্দিন আতাসী।

প্যালেষ্টাইনে আরবদের নিদারুণ পরাজয়ে আর এক আরব দেশেও যথারীতি অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল।

সিরিয়ার পরেই জর্ডন।

যে জর্ডন শেষ পর্যন্ত ইজরাইলের বিরুদ্ধে লড়াই করে ইজরায়েলের রাক্ষুসে গ্রাস থেকে প্যালেষ্টাইনের কিছু অংশও আরবদের অধিকারে রেখেছিল। এখানে কোন সামরিক অভ্যুত্থান নয়, শাসক-গোষ্ঠির বিরুদ্ধে সর্বগ্রাসী বিদ্রোহ নয়, শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের কোন পরিকল্পনাও ছিল না এই বিক্ষোভে। এই ষড়যন্ত্রের বলি মাত্র একজন। জর্ডন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা আবদাল্লা।

ইহুদি রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা ও আরবদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য ব্রিটিশদের ওপরে প্রচণ্ড রাগ এবং বিদ্বেষ ছিল প্রতিটি আরববাসীর। সেই ব্রিটিশ সেনাপতি গ্লাব পাশার অধীনে জর্ডন বাহিনী।

১৯৫১ সনের জুলাই মাসে আবদাল্লা তীর্থ করতে এলেন জেরুজালেম। ষড়যন্ত্রকারীরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। সেখানে আততায়ীর হাতে আবদাল্লা নিহত হলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, কিন্তু রাজত্ব করা তাঁর ভাগ্যে ছিল না। তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতি প্রথম থেকেই ছিল, রাজ্য-

লাভের পর তা আরো বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তাঁকে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।

এর পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র হুসেন।

হুসেনের রাজত্বের সময়েই জর্ডনে সব দিক দিয়ে বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়। ট্র্যান্স-জর্ডন অঞ্চলকে যখন প্রথম স্বাধীন জর্ডন রাজ্য হিসাবে গঠন করা হয়, তখন এখানকার অধিবাসীরা বেশির ভাগই ছিল অশিক্ষিত। আবদাল্লার অধীনে প্রজারা ছিল ঠিক মধ্যযুগে ; রাজার সমস্ত আদেশ তারা বিনা প্রশ্নে মেনে নিত, সমস্ত অত্যাচার তারা মুখ বুজে সহ্য করত। কিন্তু প্যালেষ্টাইন যুদ্ধের পর প্যালেষ্টাইনের কিছু অংশ জর্ডনের সঙ্গে যুক্ত হল। প্যালেষ্টাইনের অধিবাসীরা অনেকেই ব্রিটিশের অধীনে কাজ করেছে, অনেকেই শিক্ষিত, অনেকেই একাধারে ব্রিটিশ ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। তারা রাজার স্বৈরাচার সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। সুতরাং শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হল এবং অনেক ক্ষেত্রেই জনগণের দাবী হুসেনকে মেনে নিতে হল।

হুসেন ছিলেন নাসেরের ঘোরতর শত্রু। মিশরের রাজবংশ তিরোহিত করেছিলেন নাসের। নাসেরের প্রভাবে তাঁকেও সিংহাসন ত্যাগ করতে হতে পারে—এই দুশ্চিন্তাই তাঁকে নাসের-বিরোধী করে তুলেছিল। সুতরাং বাগদাদ চুক্তি সই করলে নাসেরের বিরোধিতা করা হবে ভেবেই তিনি সেই চুক্তিতে সই করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু জর্ডনের অধিবাসীরা প্রবল আপত্তি জানাল। তাদের সম্মিলিত প্রতিবাদের কাছে মাথা নত করলেন হুসেন। বাগদাদ চুক্তির বাইরে রয়ে গেল জর্ডন।

এখানেই শেষ হল না জনগণের প্রতিবাদ। জর্ডন বাহিনী এখনো ব্রিটিশ সেনাপতি গ্লাব পাশার অধীনে। এবার হুসেনের গ্লাব পাশা এবং অন্যান্য ব্রিটিশ অফিসারদেব বিদায় দিতে হল। জর্ডন থেকে ব্রিটিশ প্রভাব একেবারে দূর হয়ে গেল।

কিন্তু হুসেন নাসেরকে মেনে নিলেন না। জর্ডনের প্রধানমন্ত্রী সুলেমান নেবুলসি ছিলেন অত্যন্ত নাসের-ভক্ত। নেবুলসিকে তাঁর প্রধান মন্ত্রিত্বে রাখতে হয়েছে শুধু প্রজাদের চাপে পড়ে। এমন সময় নেবুলসি রাশিয়ার সঙ্গে জর্ডনের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। হুসেন সুযোগ খুঁজছিলেন। এবার জানালেন যে নেবুলসি জর্ডনকে রাশিয়ার হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন, সুতরাং নেবুলসিকে তিনি সহজেই পদচ্যুত করলেন।

সিরিয়া ও মিশরের বিরোধে ইরাক ও লেবাননের সঙ্গে হুসেনও যোগ দিলেন। দিন দিন মিশরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠতে লাগল; কিন্তু ইজরায়েলের জন্য এই দুই দেশে কিছুটা সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হল। ইজরায়েল জর্ডন নদীর জল দিয়ে নেগেভে সেচের ব্যবস্থা ঘোষণা করায় নাসের ইজরায়েলের এই কাজে আপত্তি জানালেন, কারণ জর্ডন তবে একেবারে অনুর্বরা মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে। কৃতজ্ঞ হুসেন এইবার ভাল করে নাসেরের দিকে তাকালেন। সম্মুখ শত্রুতা দূর হল, যদিও অবিশ্বাস ও সন্দেহের নিরসন হল না।

লেবাননও বিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা পায় নি।

মিশর ও লেবাননে প্রায় একই সময়ে বিপ্লব হয়, যদিও দুই বিপ্লবের প্রকৃতি একেবারে পৃথক। লেবাননে কোন সামরিক অভ্যুত্থান হয় নি, সামরিক কর্তৃপক্ষ শুধু উপদেষ্টার কাজ করেছিল। জনগণ লড়াই করে নি, করেছিল আন্দোলন।

এক নাগাড়ে দশ বছর ধরে লেবাননের প্রেসিডেণ্ট লেবাননের রাজনৈতিক আকাশে একেশ্বর হয়ে বসেছিলেন। এই সুদীর্ঘ শাসন-কালে শাসনযন্ত্রের প্রতি স্তরে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছিল। বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল জনগণ, বিক্ষুব্ধ হয়েছিল সামরিক বাহিনী। কিন্তু সামরিক বাহিনীর ইচ্ছা থাকলেও কিছু করার উপায় ছিল না, কারণ লেবাননে সামরিক বাহিনী বলতে বিশেষ কিছুই নেই। তারা কোন সংগ্রামে

মুখ্য স্থান গ্রহণ করতে পারে না।

এই সময় সিরিয়া ও মিশরে বিদ্রোহ হওয়ার লেবাননের অধিবাসীদের মনে সাহস ও শক্তি সঞ্চারিত হল। তারা প্রেসিডেন্টের কুশাসনের বিরুদ্ধে স্থুরু করল আন্দোলন। দিন দিন তাদের বিক্ষোভ নানা দিকে নানা ভাবে প্রকাশ পেতে লাগল। তবু প্রেসিডেন্ট এতটুকু রাশ আলগা করলেন না। এই আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেদিক দিয়ে এতটুকু সফল হলেন না। অনন্যোপায় হয়ে লেবাননের অধিবাসীরা হরতাল স্থুরু করল। দেশের সাধারণ জীবনযাত্রা প্রায় অচল হয়ে উঠল। এবারে সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করল পদত্যাগ করতে। প্রেসিডেন্ট বাধ্য হয়ে শাসন ক্ষমতা ত্যাগ করলেন। সামরিক বাহিনী কিন্তু অন্যান্য আরব দেশের মত ক্ষমতা হস্তগত করল না। দেশে নতুন নির্বাচন হল। প্রেসিডেন্ট হলেন শামুঁ এবং প্রধানমন্ত্রী চার্লস মালিক।

শামুঁ এবং মালিক তাঁদের শাসন-ক্ষমতার স্থায়িত্বের জন্য লেবাননে বিভেদ-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলেন। লেবাননের অধিবাসীরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—খৃষ্টান ও মুসলমান। তিনি খৃষ্টানদের সঙ্গে আরবদের বিরোধ সৃষ্টি করলেন। ফরাসীদের মতই তিনি খৃষ্টানদের মনে এই ভয় ঢুকিয়ে দিলেন যে মুসলমান সম্প্রদায় নাসের-পন্থী এই জন্য যে, নাসেরের সাহায্যে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের মত লেবাননেও ঐশ্লামিক রাষ্ট্র স্থাপন করতে পারবে। স্থুতরাং নাসেরের প্রভাব মুক্ত থাকার জন্য তিনি পাশ্চাত্য শক্তির দ্বারস্থ হলেন। খৃষ্টান সম্প্রদায় তাঁর সহায় হল।

স্থুয়েজ সমস্যা নিয়ে যখন ইজরায়েলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিশর আক্রমণ করল, তখন শামুঁ ও মালিক খুব খুশি হলেন। স্থুয়েজ যুদ্ধে পরাজয়ের পর তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে আরব জগতে নাসেরের ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হবে, কিন্তু তা না হয়ে বরং বিপরীত হল। নাসের আরব জগতের 'হিরো' হয়ে উঠলেন।

লেবাননের মুসলমান সম্প্রদায় শামুঁর এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হল, কিন্তু খৃষ্টান সম্প্রদায় শামুঁকে উত্তেজিত করে তুলল। ফলে ১৯৫৭ সনের মে মাসে লেবাননে খৃষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অলিখিত অন্তর্যুদ্ধ বাঁধল। সিরিয়া জাতীয়তাবাদী আরবদের উস্কানি দিতে লাগল।

শামুঁ আমেরিকার শরণাপন্ন হলেন। এদিকে ইরাকেও নাসের-পন্থী সামরিক অভ্যুত্থান সফল হয়েছে। সিরিয়াতেও তাই। লেবাননেও নাসের-পন্থী শাসকগোষ্ঠি প্রতিষ্ঠিত হলে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার প্রভাব আর থাকবে না। সুতরাং আমেরিকা এই বিপ্লবে বাধা দিতে লেবাননে সৈন্য পাঠাল। লেবাননের অধিবাসীরা আমেরিকার এই ব্যবহারে এমন প্রতিবাদ জানাল যে আমেরিকা লেবাননের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হল না। বিজয়ী জাতীয়তাবাদী আরব প্রেসিডেণ্ট শামুঁকে অপসারিত করল। নতুন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল লেবাননে। প্রেসিডেণ্ট হলেন চেহাব। নতুন শাসনতন্ত্রে এই স্থির হল যে প্রতি ছয় বৎসর অন্তর নির্বাচন হবে এবং খৃষ্টান সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত হবেন প্রেসিডেণ্ট, মুসলমান সম্প্রদায় থেকে হবেন প্রধানমন্ত্রী।

সৌদি আরবেও ঝড়ের হাওয়া লাগল।

রাজা সৌদ চারদিকে ভীত চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন যে শুধু জনগণের বিক্ষোভ আর বিপ্লব। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হল যে এই সবের মূলে রয়েছে মাত্র একটি লোক—নাসের। নাসেরের জন্যই রাজ-সিংহাসন টলমল, শাসকগোষ্ঠির পতন।

তাঁর এই সন্দেহে ইন্ধন যোগাল আমেরিকা। তাদের যত না ভয় নাসেরকে, তার চেয়েও বেশি ভয় রাশিয়াকে। মধ্য-প্রাচ্যে রাশিয়া এখনো বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি— কিন্তু নাসের ও রাশিয়ার আঁতাত স্থায়ী হলে শেষ পর্যন্ত কি যে হবে বলা কঠিন।

আইসেনহাওয়ার ঘোষণা করলেন তাঁর বহু-বিতর্কিত আইসেন হাওয়ার ডক্ট্রিন, যার একমাত্র শ্লোগান—'কম্যুনিজম রুখতে হবে।' মধ্য প্রাচ্যে কম্যুনিজমের প্রসার-রোধের জন্য যে কোন আগ্রহী আরব রাষ্ট্রকে আমেরিকা অকাতরে অর্থ সাহায্যে প্রস্তুত। এক হাতে অর্থ নাও, আর এক হাতে হটাও রাশিয়াকে, হটাও নাসেরকে।

সৌদ চান তাঁর তখ্‌ত-এ-তাউসে বসে থাকতে। সুতরাং নাসের তাঁর আদর্শ নন, কম্যুনিজম তাঁর স্বপ্ন হতে পারে না। তিনি আইসেনহাওয়ারের ভজনা করাই স্বীকার করলেন। আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনে তিনি মাথা গলালেন। কিন্তু দেশের লোক কম্যুনিজম না চাইতে পারে, কিন্তু নাসেরকে চাইবে না—এ কখনো সম্ভব নয়। সৌদকে তারা ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু নাসেরকে—নৈব নৈব চ।

১৯৫৭ সনের মার্চে সিরিয়া রাজা সৌদের একটি ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিল—মিশর ও সিরিয়ার যাতে মিলন না হয় তার জন্য নাকি সৌদ নাসেরকে হত্যা করার চক্রান্ত করেছিলেন।

নাসের-প্রাণ সৌদ আরবের অধিবাসীরা রাজা সৌদের এই হীন চক্রান্ত বরদাস্ত করল না। সৌদ সিংহাসনচ্যুত হলেন। সিংহাসনে বসলেন তাঁর ভাই ফয়জল। ফয়জলের আমেরিকা-প্রীতি ছিল না খুব বেশি, এবং নাসের-পন্থী না হলেও নাসের-বিরোধী ছিলেন না।

প্যালেষ্টাইন যুদ্ধে আরব-বিপর্যয় কিন্তু ইরাকের শাসনযন্ত্রকে নাড়া দিতে পারে নি।

তার কারণও ছিল। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় একাধিকবার শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে দেশবাসীরা ক্লান্ত। তা ছাড়া দেশের শাসক-গোষ্ঠি জনগণের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে অবহিত ছিল। বিশেষত প্রধানমন্ত্রী নুরি সৈয়দ ছিলেন বিচক্ষণ ও কর্মঠ লোক এবং তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

অন্যান্য আরব রাজ্যে বিপ্লব করে সামরিক বাহিনী, কিন্তু ইরাকে যুদ্ধের সময়ে রসিদ আলির সহযোগিতায় চার কর্নেলের সামরিক

বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যায়। এই ব্যর্থতায় সামরিক বাহিনী আর একবার বিপ্লব করার মত সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারে নি।

নুরি সৈয়দের সব গুণ ছিল, কিন্তু একটি দোষই তাঁর সর্বনাশ করেছিল—সেটি হয়েছে নাসেরের প্রতি তাঁর ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষ। নাসেরের সঙ্গে বিরোধ তাঁর দামাস্কাস চুক্তির সময় থেকেই। নুরি সৈয়দ কিছুতেই ভুলতে পারেন নি যে বাগদাদ চুক্তিকে তামাসায় পরিণত করার ব্যাপারে নাসেরই ছিলেন একমাত্র দায়ী। নাসেরের জন্যই তাঁর পক্ষে আরব জাতির অবিসম্বাদী নেতা হওয়ার সৌভাগ্য ঘটে নি। তিনি হেরে গিয়েছিলেন নাসেরের ব্যক্তিত্ব ও দেশপ্রেমের কাছে।

সুয়েজ খাল নিয়ে মিশরের ওপরে ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণে তাই নুরি খুব খুশি হলেন। কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন যে এই পরাজয়ের গ্লানিতে আরব জগৎ থেকে নাসেরের নাম চিরকালের জন্য মুছে যাবে, কিন্তু ঠিক তার বিপরীত হল। সমগ্র আরব জগতে, এমন কি ইরাকেও নাসের সর্বজনপ্রিয় একমাত্র নেতা।

নাসেরের দীপ্ত ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে সিরিয়া তখন মিশরের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেছে এবং আরব জাতীয়তাবাদের এক পরম সহায়ক। লেবাননে শামুঁ তাঁর প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য খৃষ্টানদের জাতীয়তাবাদী মুসলমান আরবদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগলেন। সিরিয়া লেবাননের জাতীয়তাবাদীদের সাহায্যে অগ্রসর হল। নুরি সৈয়দ এই ব্যাপারে স্থির থাকতে পারলেন না। নাসেরের প্রভাব লেবাননেও আসন্ন, সুতরাং লেবাননকে রক্ষা করা প্রয়োজন। একমাত্র সিরিয়াতে আক্রমণ করে অধিকার করলে তাঁর দুটি কাজ সমাধা হয়—এক, লেবাননের জাতীয়তাবাদীদের সাহায্য বন্ধ এবং দুই, সিরিয়াও মিশরের গাঁট-ছড়া ছিন্ন।

১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে নুরি সৈয়দ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদুল সালাম কাসেমকে আদেশ করলেন সসৈন্যে সিরিয়া আক্রমণ করতে। তাঁর সহকারী করে দিলেন কর্নেল আরেফকে। জেনারেল

কাসেম এবং কর্নেল আরেফ সৈন্যবাহিনী নিয়ে আর সিরিয়ায় গেলেন না। সোজা এসে উঠলেন রাজধানী বাগদাদে। জেনারেল কাসেমের হাতে বাগদাদের পতন হল। সৈন্যবাহিনী ঘিরে ধরল রাজপ্রাসাদ। রাজা ফয়জাল আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালালেন, কিন্তু কিছু হল না। সৈন্যবাহিনী তাঁকে আর তাঁর খুল্লতাত রিজেন্ট প্রিন্স আবতুল ইলাহকে বন্দী করে সেইখানেই তাদের বিচার করতে বসল। বিচারে তাঁরা অপরাধী সাব্যস্ত হলেন। শাস্তি হল প্রাণদণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের তুজনকে গুলি করে হত্যা করা হল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাজতন্ত্র ধ্বংস হয়ে গেল।

প্রধানমন্ত্রী নুরি সৈয়দ এই সামরিক অভ্যুত্থানের সংবাদ পেয়েই ছদ্মবেশ ধরে গোপনে বাগদাদ ছেড়ে পালালেন। তিনি জানতেন যে, রাজা ফয়জাল বা রিজেন্টের ওপর দেশবাসী যত না ক্রুদ্ধ তার চেয়ে অনেক বেশি ক্রোধ তাঁর ওপর। সেনাবাহিনী নুরিকে সারাদেশ খুঁজতে খুঁজতে উপস্থিত হল তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে। নুরি আবার আর এক ছদ্মবেশে পালাবার উদ্যোগ করছিলেন, কিন্তু এবার ধরা পড়ে গেলেন। সেইখানেই তাঁকে হত্যা করা হল এবং তাঁর মৃতদেহ রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হল।

জেনারেল কাসেমের শাসনাধীনে ইরাকে প্রতিষ্ঠিত হল প্রজাতন্ত্র।

ইরাক প্রথমেই বাগদাদ চুক্তি নাকচ করল। ইরাক বাগদাদ চুক্তিতে না থাকলে বাগদাদ চুক্তি নিরর্থক, সুতরাং আমেরিকা বাগদাদ চুক্তির সঙ্গে জড়িত অন্যান্য রাজ্যগুলিকে নিয়ে এবার করল সেনেটো (CENTO) বা সেন্ট্রাল ট্রিট অরগ্যানাইজেশান।

এই বিপ্লব সফল হলে পর নির্বাসন থেকে ইরাকে ফিরে এলেন গোল্ডেন স্কোয়ার বা চার কর্নেলের বিদ্রোহের রসিদ আলি। কর্নেল আরেফ ছিলেন জেনারেল কাসেমের পরেই শক্তিমান। রসিদ আলি আর আরেফ একত্র হলেন। এরা তুজনেই ঘোরতর কম্যুনিষ্ট বিরোধী এবং নাসের-পন্থা। জেনারেল কাসেম কম্যুনিষ্ট-দরদী ছিলেন না

কোনদিনই, নাসের-বিরোধীও ছিলেন না; কিন্তু আরেফ আর রসিদ আলির এই মিলনে তিনি ভয় পেলেন। এরা দুজনে শক্তিশালী হয়ে উঠলে তাঁর কর্তৃত্ব দূর হবে, একথা কাসেমের বুঝতে বাকি রইল না। নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তিনি কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে হাত মেলালেন। কাসেমের অনুগ্রহে কম্যুনিষ্টরা এখানে শক্তিশালী হয়ে উঠল।

আরেফ চাইলেন ইরাক আর মিশর একটি আরব যুক্তরাষ্ট্র গঠন করুক; কিন্তু এর বিরোধিতা করল কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং বাথ পার্টি—ইরাকের দুইটি বড় রাজনৈতিক দল, কারণ নাসের কম্যুনিষ্টদের দু চোখে দেখতে পারেন না এবং বাথ পার্টির ওপরও তাঁর প্রচুর সন্দেহ।

এই দুই দলের চাপে পড়ে কাসেম নিজের ক্ষমতার লোভে আরেফ আর রসিদ আলিকে গ্রেফতার করলেন। বিচারে আরেফের হল কারাবাস এবং রসিদ আলির প্রাণদণ্ড। তাঁর দুই প্রধান শত্রুকে সরিয়েও কাসেম নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। কর্নেল আবদ এল-ওয়াহেব মোস্থল শহরে বিদ্রোহ করলেন। এই বিদ্রোহ দমনের পর আবার কিরকুক শহরে বিদ্রোহ। ১৯৫৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে কর্নেল সাওয়াফও কাসেমের শাসনের বিরুদ্ধ বিদ্রোহ করে ব্যর্থ হলেন। কম্যুনিষ্ট-চালিত কাসেম নাসেরকে এখন মনে-প্রাণে ঘৃণা করেন। কাসেম ঘোষণা করলেন যে ইরাকে সমস্ত বিদ্রোহের মূল নাসের, তিনিই সব ক্ষেত্রে উস্কানিদাতা। নাসেরও কাসেমকে ফ্যাসিবাদী কম্যুনিষ্ট বলে অভিহিত করলেন। এই দুইজনের মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। ইরাক ও মিশরের সম্পর্ক ঠিক নুরি সৈয়দের সময়কার মত সম্পর্কে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু কাসেমের সময় ঘনিয়ে এসেছিল। সামরিক বাহিনীর আরেফ-পন্থী অভিসাররা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ১৯৬২ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি তাঁরাও আর এক বিপ্লব করে শাসনক্ষমতা হস্তগত করলেন।

কাসেমকে বন্দী এবং পদচ্যুত করা হল। বিচারের পর কাসেম এবং শাসক-গোষ্ঠির অনেককে হত্যা করা হল। কর্নেল আরেফের বন্ধনদশা ঘুচিয়ে তাঁকে ইরাকের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করা হল।

আরেফ প্রেসিডেন্ট হয়ে মিশরের সঙ্গে এক যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের জন্য আবার আগ্রহী হয়ে উঠলেন ; কিন্তু বাধা দিল বাথ পার্টি। কাসেমের বিরুদ্ধে এই বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল বাথ পার্টি, কারণ তারা কম্যুনিষ্টদের প্রাধান্যে ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে উঠেছিল। নূতন মন্ত্রীমণ্ডলীতে তাই বাথ পার্টির সদস্য সংখ্যাই বেশি।

আরেফ বুদ্ধিমানের মত চুপ করে গেলেন। তিনি মিশরের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গঠনে উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। প্রতিদানে নাসেরও সহযোগিতা এবং বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলেন। এতদিন পরে এই প্রথম মিশর ও ইরাক বন্ধুভাবাপন্ন হল।

অবশেষে এই কয়দিনের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হল।

৫ই জুন আবার আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ। সত্য কথা বলতে গেলে আরব বনাম আমেরিকা, ব্রিটেন ও ইজরায়েল। উনিশ বছরের মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয় বার।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের বীর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে গোপন মুলাকাৎ করে ফিরে এলেন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী উইলসন চার তারিখে আর পাঁচ তারিখে ইজরায়েল আক্রমণ করল একযোগে মিশর, জর্ডন, সিরিয়া ও লেবানন!

সংবাদপত্র ও রেডিও মারফত ভুল, বিভ্রান্তিকর এবং সম্পূর্ণ বিপরীত সংবাদ ও প্রচারে প্রথমে বোঝা যায় নি যুদ্ধের স্বরূপ, তার রীতি। বোঝা যায় নি কে প্রকৃত অপরাধী! কিন্তু ঘোলা জল থিতিয়ে যাওয়ার পর এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন বুঝতে অসুবিধা হয় না—এ যুদ্ধ কার, কে সত্যকার অপরাধী, কিসের জন্য এ যুদ্ধ। আমেরিকার সংবাদ-পত্রের উল্লাসে পৃথিবী জানতে পেরেছে এ যুদ্ধে প্রকৃত জয়ী কে?—ইজরায়েল, না আমেরিকা?

৫ই জুন। সবে সকাল হয়েছে। কায়রো শহরে স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—সারা আকাশ জুড়ে সাইরেনের বিপদ-সঙ্কেত ধ্বনি এবং পর মুহূর্তেই কায়রোর আকাশে আমেরিকান-ইজরায়েলি প্লেন। শহরবাসীরা কিছু বোঝার আগেই সুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ। মিশরীয় ফাইটার প্লেন ছুটে গেল, এ্যান্টি-এয়ার-ক্র্যাফট্ কামান গর্জে উঠল। শত্রুর প্লেন বোমা বর্ষণ করে ফিরে গেল। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে প্রায় একই সময়ে আরও পঁচিশ জায়গায়—মিশর, জর্ডন, সিরিয়া ও লেবাননের বিভিন্ন অঞ্চলে।

তার আগেই ইজরায়েলি সৈন্যবাহিনী ট্যাঙ্ক নিয়ে ঢুকে পড়েছে সিনাই, গাজা, জর্ডন, সিরিয়া ও জেরুজালেমে।

এ সংবাদ প্রথম জানা গেল কায়রো রেডিও মারফৎ। রেডিও কায়রো হঠাৎ সকাল বেলায় নিয়মিত প্রোগ্রাম বন্ধ করে ঘোষণা করল : স্থানীয় সময় নটায় ইজরায়েল সমগ্র আরব-ভূমির ওপর স্থলে ও অন্তরীক্ষে আক্রমণ করেছে।

রেডিও কোল ইজরায়েল পাল্টা জবাব দিল : মিশর বাহিনী প্রথমে ইজরায়েল আক্রমণ করায় বাধ্য হয়ে ইজরায়েল প্রতিরোধ করছে।

তারপর একদিকে আরব ইজরায়েলের মরণ সংগ্রাম, অপর দিকে রেডিওর যুদ্ধ।

রেডিও কোল ইজরায়েল গর্জে উঠল : ইজরায়েলের সৈন্যগণ, আজ এই দিনে আমাদের আশা ও নিরাপত্তা তোমাদের হাতে।

কায়রো রেডিও ঘোষণা করল : জনগণ জাগো! ইজরায়েলি আক্রমণ প্রতিহত কর। আল্লা .সহায়, আমাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত।···জয় হোক আরব জাতির, জয় হোক আরব জনগণের।

বেইরুত রেডিও : এই সংগ্রাম লেবাননের সংগ্রাম। এই সংগ্রাম আরব জাতির সংগ্রাম। প্যালেষ্টাইন উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আরব-জাতির শান্তি নেই।

দামাস্কাস রেডিও : সিরিয়ার সৈন্যদল! ইজরায়েলকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেল।

জর্ডনের রাজা হুসেন নাসেরকে বার্তা পাঠালেন : আরব জাতির ইতিহাসে এই চূড়ান্ত সংগ্রামে জর্ডন মিশরের পাশে।

লেবাননের প্রধান মন্ত্রী রসিদ করামি ঘোষণা করলেন : আরব জাতির সংগ্রাম সুরু হয়েছে। আমরা এখন তার জন্য প্রস্তুত।

কায়রো রেডিওর সংবাদ ঃ

ব্রিটিশ ও আমেরিকান বিমানবাহিনীর সহযোগিতায় ইজরায়েলি বিমানবাহিনী সকাল নটার থেকে এগারোটা পর্যন্ত কায়রো এবং সুয়েজ খাল বরাবর আরব প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন স্থানে বোমা বর্ষণ করে। একই সঙ্গে ইজরায়েলি স্থলবাহিনী আরবরাজ্য আক্রমণ করে। আরব বাহিনী শত্রুদের এই ঘৃণ্য আক্রমণকে বাধা দেবার জন্য বিপুল বিক্রমে সংগ্রাম করে চলেছে।

বিকেলে আবার ইজরায়েলি প্লেন কায়রোয় হানা দেয়।

এখন পর্যন্ত সত্তরটি ইজরায়েলি বিমান ধ্বংস হয়েছে। মিশরের মাত্র দুটি প্লেন বিধ্বস্ত হয়েছে, কিন্তু বিমানচালকদের কোন ক্ষতি হয় নি।

ইজরায়েলি রেডিও জানায় ঃ

নাসেরের প্ররোচনায় আরব রাজ্যগুলি ইজরায়েল আক্রমণ করায় আমাদের বীর সৈন্যেরা সর্বত্রই তাদের উচিত শিক্ষা দিচ্ছে। মিশরের একটি প্লেনও আর সাহস করে আকাশে উড়ছে না। আমরা মিশরের দেড়শটি জঙ্গী বিমান প্রথমবারেই ধ্বংস করেছি।

কায়রো আর আম্মান রেডিও একত্র জানাল ঃ আমেরিকার বিমান থেকে নেপাম বোমা বেসামরিক লোকদের ওপর বর্ষিত হচ্ছে। আরব বিমানবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে আমেরিকান ও ব্রিটিশ বিমান-বাহিনী।

আমেরিকার পররাষ্ট্র-সচিব ডীন রাস্ক ধরা পড়ে চীৎকার করে উঠলেন ঃ এই সব অভিযোগ মিথ্যা—সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আমেরিকার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভাষ্যকার রবার্ট ম্যাকক্লসকি জানালেন ঃ আমেরিকা চিন্তায়, কথায় এবং কাজে একেবারে নিরপেক্ষ।

এবং নিরপেক্ষ আমেরিকান ও ব্রিটিশ বিমানবাহিনী আরবভূমিতে ও আরব জনগণের ওপর বোমা বর্ষণ করতে লাগল, কারণ ইজরায়েলকে

সাহায্য করতে তারা বাগ্‌দত্ত।

কায়রো রেডিওর রাতের সংবাদ ঃ
ইজরায়েলি আক্রমণের ফলে গাজার দক্ষিণাঞ্চলে খান ইউজুনে প্রচণ্ড স্থলযুদ্ধ চলছে। সিনাই অঞ্চলেও যুদ্ধের বিরাম নেই। গাজা অঞ্চলে অনেক ইজরায়েলি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছে। ভীষণ সংগ্রামের পর ইজরায়েলি বাহিনী এখন পশ্চাদপসরণ করছে। মিশরীয় সেনাবাহিনী ইজরায়েলি অঞ্চলে প্রবেশ করেছে।

আম্মান রেডিওর সংবাদ ঃ
ব্রিটিশ ও আমেরিকান বিমান বাহিনী ইজরায়েলের সঙ্গে একত্র হয়ে জর্ডন রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে আম্মান নগরীর ওপর প্রবল বোমাবর্ষণ করে। জেরুজালেম শহরটিতে যুদ্ধ করা হবে না ঘোষণা করা সত্ত্বেও ইজরায়েলি স্থলবাহিনী তিন দিক ঘিরে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করছে। জর্ডন বাহিনী অসমসাহসে শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

রেডিও কোল ইজরায়েল ঃ
শত্রুদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ করার সুযোগ ইজরায়েল দেবে না এবং এই যুদ্ধে জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত এতটুকু বিরতি দেওয়া হবে না। সিনাই অঞ্চলে আমরা অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গিয়েছি, দু'শ ট্যাঙ্ক ধ্বংস, হাজার হাজার মিশরীয় সৈন্য বন্দী। গাজা অঞ্চল আমাদের অধিকারে।

জর্ডন বাহিনী পুরাতন জেরুজালেম এবং তেল আভিভের ওপর গোলা বর্ষণ করায় আমাদের বাধ্য হয়ে জেরুজালেম আক্রমণ করতে হয়েছে। জেরুজালেমের পতন আসন্ন।

কায়রো রেডিওর রাত্রির ঘোষণা ঃ বিশ বছর ধরে আমাদের দেশের লোকেরা এই সংগ্রামের প্রতীক্ষায় ছিল। এখন তারা ইজরায়েলকে

যে শিক্ষা দেবে, তা হয়েছে মৃত্যু। আরব সেনাবাহিনীদের আজ ইজরায়েলে উৎসবে যোগদানের নিমন্ত্রণ।

রেডিও কোল ইজরায়েল: আমাদের প্রভু ঈশ্বর বলেছিলেন—'তোমার ভাইয়ের রক্ত মাটির নীচে থেকে আমাকে চীৎকার করে ডাকে।' সুতরাং ইজরায়েলবাসীরা, তোমরা প্রস্তুত হও। শত্রুদের শিক্ষা দাও।

বেইরুত রেডিও: আমরা চূড়ান্ত সংগ্রামের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। হয় বাঁচা, নয় মরা—এই আমাদের পণ। তেল আভিভ আমরা অধিকার করব। সৈন্যদল, সর্বত্র আঘাতের পর আঘাত হানো। আক্রমণকারীকে স্বখাতসলিলে নিমজ্জিত কর, সমূলে বিনাশ কর।

রেডিও কোল ইজরায়েল মিশরীয় ভাষায় মিশরের জনগণকে আহ্বান করে বলে:
আর কেন? অনেক হয়েছে। এবারে তোমরা আত্মসমর্পণ কর। নাসেরকে দূর কর।

পরের দিন। একই ধরনের যুদ্ধের সংবাদ। আরব রাজ্যের সর্বত্র বোমা বর্ষণ। সিনাই অঞ্চলে প্রচণ্ড যুদ্ধ। ইজরায়েলি সৈন্য ছুটে চলেছে সুয়েজের দিকে।
সী অব গ্যালিলির কাছে সিরিয়ার সৈন্যবাহিনী ইজরায়েলি আক্রমণ প্রতিহত করেছে।
ইজরায়েলি সেনাবাহিনীর কাছে পুরাতন জেরুজালেমের পতন।

ইজরায়েল ও জর্ডনের এক অলিখিত চুক্তি ছিল যে তিন ধর্মের এই তীর্থক্ষেত্রে কোন দিন যুদ্ধকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে না। যুদ্ধ বাঁধার

সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন জেরুজালেমের সমস্ত তোরণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। জেরুজালেমবাসী আরবরা নিশ্চিন্ত মনে ছিল যে তাদের যুদ্ধে লিপ্ত করা হবে না।

কিন্তু ইজরায়েল হঠাৎ ঘোষণা করল যে পুরাতন নগরী থেকে জর্ডন সেনাবাহিনী তাদের ওপর কামান দাগছে। সুতরাং ইজরায়েলি প্লেন প্রথমে সুরু করল বোমাবর্ষণ। তারপর দক্ষিণে হিনম উপত্যকা আর উত্তরে ম্যাণ্ডেলবাউম গেট থেকে সুরু হল গোলাবর্ষণ।

সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে আবার ইজরায়েলি প্লেন বোমাবর্ষণ করতে সুরু করে। রাত গভীর হলে ম্যাণ্ডেলবাউম গেট থেকে দুটি সাঁজোয়া বাহিনী ছুটে চলল পুরাতন জেরুজালেম নগরীর দিকে। একটি সাঁজোয়া বাহিনী স্বল্প সংখ্যক জর্ডনী সৈন্যকে পরাভূত করে অধিকার করল মাউন্ট স্কোপাস। আর এক বাহিনী উপস্থিত হল জেরুজালেমের উত্তর দিকের দেয়াল ঘিরে পূবে সেণ্ট স্টিফেন্স গেটে। হিনোম উপত্যকার থেকেও দুটো সাঁজোয়া বাহিনী একই সঙ্গে ছুটে চলল। একটি বাহিনী উপস্থিত হল দক্ষিণের জিয়ন গেটে, অপর বাহিনী সমগ্র দক্ষিণ দিক ঘিরে পূবের সেণ্ট স্টিফেন্স্ গেটে।

সকাল বেলাতেই ট্যাঙ্কের কামান প্রথমে ভাঙল সেণ্ট স্টিফেন্স গেট, তারপর জিয়ন গেট এবং সব শেষে দামাস্কাস গেট। বিজয়ী ইজরায়েলি সৈন্য আনন্দে অধীর হয়ে পুরাতন জেরুজালেমে প্রবেশ করল। ছুটে চলল তারা ওয়েলিং ওয়ালে।

কিন্তু জেরুজালেমের অভ্যন্তরে কোথায় জর্ডনের সৈন্য? তাদের স্বাগত জানাল বোমাবর্ষণে মৃত প্রায় হাজার খানেক বেসামরিক আরব, বিধ্বস্ত আরব ঘরবাড়ি।

এই যুদ্ধে জয়লাভ করে তারা আনন্দে চীৎকার করে উঠল: আমরা ঈশ্বরের নগরী অধিকার করেছি। এই পবিত্র নগরী প্রথমে আমাদের ছিল—আমাদের এবং আমাদের ঈশ্বরের এই নগরী। এখান থেকে আর আমরা যাব না। কখনও না।

রেডিও কোল ইজরায়েল ঘোষণা করল ঃ সমস্ত জেরুজালেম এখন আমাদের হাতে।

আমেরিকা ও বৃটেনের এই ঘৃণ্য চক্রান্তে ক্রুদ্ধ হয়ে আরব রাজ্যগুলি একে একে ওই দুই দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করল। প্রথমে মিশর, তারপর একে একে সিরিয়া, আলজেরিয়া, ইয়েমেন, ইরাক, সুদান এবং মরিটানিয়া।

আমেরিকা ও বৃটেনকে খনিজ তেল দেওয়া বন্ধ করে দিল ইরাক, কুয়াইৎ, আলজেরিয়া, সৌদি আরব, লিবিয়া, বাহরিন, কাতার, সিরিয়া আর লেবানন। আলজেরিয়া ব্রিটিশ ও আমেরিকান তৈল কোম্পানিগুলিকে রাষ্ট্রায়াত্ত করে নিল।

•

রাষ্ট্রসঙ্ঘের জরুরি অধিবেশন বসল পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট সম্বন্ধে আলোচনা করতে। যুদ্ধ বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ রাষ্ট্রই ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তে ইজরায়েলের নির্লজ্জ এই আক্রমণের নিন্দা করে। রাশিয়া একটি প্রস্তাব আনে যে এখনই ইজরায়েল এবং আরব রাষ্ট্রগুলিকে যুদ্ধ বন্ধ করতে আদেশ দেওয়া হোক এবং ইজরায়েলকে বলা হোক যে যুদ্ধ-পূর্ব সীমায় তাদের ফিরে যেতে। ইঙ্গ-মার্কিন জোট এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় সেটি গৃহীত হতে পারে না।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের কয়েকটি সদস্য-রাষ্ট্র জেরুজালেমকে 'মুক্ত নগরী' রাখার প্রস্তাব আনেন। এই প্রস্তাবের সমর্থনে সেক্রেটারি জেনারেল জানান যে, জেরুজালেমে অমূল্য ও অপূরণীয় ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্মৃতিসৌধ আছে যার আধ্যাত্মিক মূল্য অত্যন্ত বেশি। ভবিষ্যতের জন্য এগুলির সংরক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

জর্ডন মেনে নেয় এ কথা, কিন্তু ইজরায়েল মৌখিক আশ্বাস দিয়েও ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাচীন জেরুজালেম নগরীর ওপর।

গভীর রাত্রে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে এই স্থির হয় যে, যুদ্ধমান

রাষ্ট্রগুলিকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বলা হবে। এই যুদ্ধ-বিরতিতে জর্ডন সম্মত হয়; মিশর, সিরিয়া ও ইরাক জানায় যে ইজরায়েল যুদ্ধ বন্ধ না করলে তারাও যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

ইজরায়েলের পক্ষে এবং আরবের বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার জন্য আরব রাষ্ট্রগুলির অধিবাসীরা এই দুই দেশের দূতাবাসগুলির বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ জানায়। আমেরিকান দূতাবাসগুলি এবং আমেরিকান অধিবাসীরাই এই বিক্ষোভের মূল লক্ষ্য ছিল।

প্রতিটি আরব-রাষ্ট্রে বিক্ষোভ এমন প্রবল আকার ধারণ করে যে বিশ হাজারেরও বেশি আমেরিকান যে যেভাবে পারে মধ্য-প্রাচ্য ছেড়ে পালাতে সুরু করে। কায়রো, বাগদাদ, দামাস্কাস, বেইরুত, আম্মান, খার্তুম, আলজিয়ার্স, বেনগাজি, তিউনিস—সব জায়গায় আমেরিকান দূতাবাস ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি দরজা জানলা বন্ধ করে দেয় এবং দলে দলে পালাতে সুরু করে।

আরব জনতা বেইরুতে আমেরিকান দূতাবাসের সমস্ত জানলার কাঁচ ভেঙে মোটর গাড়িগুলিতে অগ্নি-সংযোগ করে দেয়। আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় তারা বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়। পথে ঘাটে আমেরিকানরা অপমানিত হতে থাকে। বেইরুতের শহরতলি অঞ্চলে আমেরিকান শেল কোম্পানির পেট্রোলের গুদামে আগুন লাগানো হয়। সিরিয়া থেকে আমেরিকানরা পালিয়ে দলে দলে বেইরুতে এসে উপস্থিত হয়। জনতার আক্রোশ এবং বিক্ষোভের হাত থেকে লেবাননের পুলিশ ও সামরিক বাহিনী এদের রক্ষা করে ভাড়া-করা প্লেনে এদের দেশত্যাগ করার ব্যবস্থা করে দেয়। কিছুক্ষণ পরেই জনতা এখানকার মার্কিন দূতাবাস ঘিরে ফেললে দূতাবাসের কর্মীরা ভয় পেয়ে মারমুখী জনতার ওপর গুলি চালায়। তার ফলে ক্রুদ্ধ জনতা দূতাবাসে আগুন লাগিয়ে দেয়।

সিরিয়ার মার্কিন দূতাবাসেও অগ্নি-সংযোগ করে বিক্ষুব্ধ জনতা।

আলেপ্পো শহরে মার্কিন কন্সাল জেনারেলের বাড়ি জনতা ঘিরে ফেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। সেই বাড়ির ওপরতলায় তখন মার্কিন ও ব্রিটিশ কনসাল জেনারেল ছিলেন। জনতার ভয়ে তাঁরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারেন নি। বাড়ির পিছনের জানলায় দড়ি বেঁধে দুজনে সেই দড়ি বেয়ে গোপনে নীচে নামেন এবং সিরিয়ার রক্ষী বাহিনীর সাহায্যে ভাড়া গাড়ি করে তুর্কীতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

বাগদাদ, দামাস্কাস, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া—সর্বত্রই মার্কিন ও ব্রিটিশ দূতাবাসের ওপর হামলা চলে।

লিবিয়ায় অবস্থিত মার্কিন বিমান ঘাঁটি থেকে বত্রিশটি মার্কিন প্লেনের ইজরায়েলে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে লিবিয়াবাসীরা এই বিমান ঘাঁটিটি বোমা বর্ষণ করে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। মার্কিন নৌবাহিনীর একটি দল লিবিয়াবাসীদের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে পড়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় কোন রকমে প্রাণ রক্ষা করে।

আলজেরিয়া রেডিওর ঘোষণা ঃ

ইজরায়েলের সঙ্গে আমাদের কথার ভাষা হবে ধ্বংস এবং আগুনের ভাষা।

৭ই জুন !

সেই রেডিওর খেলা। আজকে আর কায়রো রেডিওর সংবাদ চাঞ্চল্যকর নয়, রেডিও কোল ইজরায়েলের আজ বড় গলা। নিয়মিত প্রোগ্রাম বন্ধ করে মাঝে মাঝেই তাদের সংবাদ শোনা যাচ্ছে।

রেডিও কায়রো ঃ

আমাদের সৈন্যদল আমাদের দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ইজরায়েলিদের সঙ্গে তীব্র সংগ্রাম করে চলেছে। শত্রুকে দেশত্যাগ করানোর শপথ

নিয়েই তাদের এই সংগ্রাম। ইজরায়েলি বোমারু বিমান আরবভূমির যত্রতত্র বোমা বর্ষণ করে চলেছে। এখন তাদের আক্রোশ পড়েছে বেসামরিক অধিবাসীদের ওপর, তাই তাদের এই নৃশংস হত্যালীলা।

রেডিও কোল ইজরায়েল :

১৯৫৬ সনের মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইজরায়েলি সৈন্যবাহিনী সিনাই অঞ্চলে যতদূর প্রবেশ করেছিল, এবারে তারা তার চেয়েও অনেক দূরে প্রবেশ করেছে। ইজরায়েলি সৈন্যবাহিনীর সুয়েজ দখল করার আর বেশি দেরি নেই। জর্ডনের অভ্যন্তরে আমাদের সৈন্যবাহিনী প্রবেশ করে অনেকখানি জায়গা অধিকার করে নিয়েছে এবং জর্ডনের ঘাঁটি থেকে আমাদের একটি সামরিক বাহিনী প্রবল বিক্রমে সিরিয়া আক্রমণ করেছে।

রেডিও কায়রো :

বত্রিশটি আমেরিকান বোমারু বিমান আজ লিবিয়ার ঘাঁটি থেকে ইজরায়েলে এসে উপস্থিত হয়েছে। সিনাই মরুভূমি অঞ্চলে আজ কতগুলি ব্রিটিশ ছাপমারা ক্যানবেরা বিমানকে ইজরায়েলি বাহিনীকে সাহায্য করতে দেখা গেছে। একশ তিরনব্বইটি ইজরায়েলি বিমান আজ বিনষ্ট করা হয়। এল-আরিশ, আবু গিল, কোসেইমাতে আমাদের সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে।

রণ-সম্ভারের দিক দিয়ে ইজরায়েল প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু আমেরিকা ও ব্রিটেন সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেই ক্ষতিপূরণ করে দিয়ে যাচ্ছে।

রেডিও কোল ইজরায়েল :

এতক্ষণ পর্যন্ত ৩৭৪টি আরব প্লেন ধ্বংস হয়েছে এবং মাত্র ১৯টি

ইজরায়েলি প্লেন খোয়া গেছে। গাজা শহর আমাদের অধিকারে এসেছে, নাটোস শহরও আমরা অধিকার করেছি।

কায়রো রেডিও ফ্ল্যাশ ঃ
সিনাই অঞ্চলে আটটি ইজরায়েলি বিমান ভূপাতিত করা হয়। এই অঞ্চলে একটি সম্পূর্ণ ইজরায়েলি ডিভিসনকে আমাদের সৈন্যবাহিনী ঘেরাও করে বন্দী করে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবার তার দ্বিতীয় নির্দেশ দিল। নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে যে সন্ধ্যার মধ্যে ইজরায়েল ও আরব-রাষ্ট্রগুলিকে সর্বপ্রকার সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ করতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ নির্দেশ দিক। এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয় এবং নিরাপত্তা পরিষদ এই নির্দেশ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে জানায়।
জর্ডন এই যুদ্ধ-বিরতি মেনে নেয়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নেয় মিশর। এই দুই দেশ তাদের সেনাবাহিনীদের অস্ত্র সংবরণ করতে নির্দেশ দেয়; কিন্তু ইজরায়েল এই দুই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দিষ্ট যুদ্ধ-বিরতি মেনে নিয়েও হঠাৎ আবার আক্রমণ সুরু করে।

রেডিও কোল ইজরায়েল ঘোষণা করে চলে ঃ
শরম এল-শেখ অধিকৃত। আকাবা উপসাগর ও তিরান প্রণালী আমাদের হাতে।
ইজরায়েলি বাহিনী সুয়েজ খালের পূর্বতীরে উপস্থিত।
জেবেল লিবজি আমাদের অধিকারে। ত্রিশটি মিশরীয় ট্যাঙ্ক ধ্বংস।
জর্ডন নদীর পশ্চিম তীর থেকে সুয়েজ খালের পূর্ব তীর পর্যন্ত সমস্ত আরব ভূমি এখন আমাদের অধিকারে।
জেরিকো অধিকৃত।
বেথেলহেম, হেব্রোন, রমল্লা টেনাসের পতন।

জর্ডনের বিস্তৃত অঞ্চল এখন ইজরায়েলের অধিকারে।

কিন্তু সিরিয়া-ইজরায়েলি যুদ্ধ থামল না।
ইজরায়েল তাদের সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সিরিয়ার ওপরে, কিন্তু গ্যালিলির সমুদ্রের কাছে ইজরায়েলি বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। হুলেহ্ সমতলভূমিতে অবতরণ করে সিরিয়ার সৈন্যবাহিনী নাজারেথের দিকে তাদের তাড়া করে নিয়ে গেল।
ইজরায়েল বিমান বাহিনী প্রতি মুহূর্তে দামাস্কাসের ওপর বোমাবর্ষণ করে চলেছে। গ্যালিলির সমুদ্রের দিক দিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় দেখে ইজরায়েলি বাহিনী জর্ডন অঞ্চল দিয়ে সিরিয়া আক্রমণ করল এবং এল-কুমেইত্রা দখল করে নিল। সেইখানে কামান বসিয়ে তারা দামাস্কাসের ওপর কামান দাগতে লাগল।
রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ আবার দুই ঘণ্টার মধ্যে ইজরায়েল ও সিরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ-বিরতির আহ্বান জানান। সেক্রেটারি জেনারেল উ-থাণ্ট বলেন যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধিরা সংবাদ দিয়েছেন যে ইজরায়েলি বিমানগুলি থেকে সিরিয়ার ওপর অনবরত নেপাম এবং অন্যান্য বিধ্বংসী বোমা বর্ষণ করা হচ্ছে। ইজরায়েল যুদ্ধ-বিরতি মেনে নেয় নি।
১০ই জুন।
সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছে। শুধু তাই নয়, যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাব অমান্য করে দামাস্কাসের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টার জন্য রাশিয়া জানিয়েছে যে এই বিশ্বাসঘাতকতার কাজ যদি তারা বন্ধ না করে তবে অন্যান্য শান্তিকামী রাষ্ট্রের সঙ্গে একযোগে রাশিয়া ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তার পরিণাম হবে মারাত্মক।
সোভিয়েট রাশিয়ার কড়া ধমকে ইজরায়েল যুদ্ধ-বিরতি মেনে নিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার পরেও তারা তিনবার দামাস্কাসের ওপর বোমা

বর্ষণ করে। এই সংবাদ জানালেন যুদ্ধ-বিরতি কমিশনের আইরিশ সভাপতি।

যে আলজেরিয়া এই যুদ্ধে আরবদের পক্ষে একটি বন্দুকও তুলল না, তার রাষ্ট্রপতি জেনারেল বুমেদিন শুধু যুদ্ধ-বিরতি মেনে নিলেন না। টেলিভিশনে তিনি ঘোষণা করলেন : ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ চলছে এবং চলবে। যতদিন পর্যন্ত না আমাদের প্রতি ন্যায় বিচার করা হচ্ছে, যতক্ষণ না আমাদের দেশ শত্রুশূন্য হচ্ছে এবং যতদিন না শত্রুর অধিকার থেকে আমাদের দেশ পুনরধিকৃত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অস্ত্র সংবরণ করব না।

১৭

ছয় দিন।

মাত্র ছয় দিনে শেষ হয়ে গেল আরব ইজরায়েলের যুদ্ধের তৃতীয় পর্ব। ঠিক ছয় দিনও নয়—ষাট ঘণ্টাই বলা যায়, কিংবা এ কথাও বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে ইজরায়েলি আক্রমণের প্রথম ঘণ্টাতেই এই যুদ্ধের শেষ পরিণতি প্রশ্নাতীতভাবে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। বাকী ছিল শুধু সরকারিভাবে ফলাফল ঘোষণা করা।

যুদ্ধের সেই প্রথম ঘণ্টার মধ্যে আমেরিকা-ব্রিটেন-ইজরায়েলের যৌথ বিমানবাহিনী আরব-ভূমির পঁচিশটি বিমান ঘাঁটিতে একই সময়ে অতর্কিত আক্রমণ করে আরব রাষ্ট্রগুলির প্রায় সমস্ত বিমান ধ্বংস করে দেয়। ধূ ধূ-করা ফাঁকা মরুভূমিতে বিমান-ছত্র ছাড়া ট্যাঙ্ক বা স্থলবাহিনীর যুদ্ধ আত্মহত্যার সামিল। আরব রাষ্ট্রগুলিরও ঠিক সেই অবস্থা হয়েছিল। আক্রমণের জন্য একেবারে অপ্রস্তুত আরব রাষ্ট্রগুলি সম্বিত ফিরে পাবার আগেই দেখতে পেল যে আমেরিকা-ব্রিটেন-ইজরায়েলের বিমানবাহিনী তাদের বিমানবাহিনীকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে চলে গেছে।

অথচ ইজরায়েলি ট্যাঙ্কবাহিনী ও স্থলবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে তাদের ট্যাঙ্ক নিয়ে অগ্রসর হতেই হবে, কিন্তু তাদের নেই এই ট্যাঙ্কবাহিনীকে শত্রুর বিমান-বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করার মত কোন বিমান-ছত্র—বেপরোয়া আক্রমণকারী ইজরায়েলি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার জন্য নেই আরবদের আর বাড়তি বিমান। সুতরাং আমেরিকার সংবাদ-সাপ্তাহিক 'টাইম' পত্রিকার ভাষায় "Without air cover, tanks and infantry under the clear skies of the desert offered little more than target practice." আমেরিকান-ব্রিটিশ-ইজরায়েলি বিমান নিঃশঙ্ক চিত্তে নির্বাধ আকাশ থেকে আরব

ট্যাঙ্কগুলিকে বেপরোয়া ধ্বংস করতে সুরু করল।

যুদ্ধের এই পরিকল্পনাই স্থির হয়েছিল। স্থির করেছিল আমেরিকা, ব্রিটেন ও ইজরায়েলের সামরিক কর্তৃপক্ষ এক সঙ্গে বসে। তাদের হিসেবে ভুল হয় নি।

ঠিক ১৯৫৬ সনের সুয়েজ আক্রমণের সময়কার ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এবার ফ্রান্সের বদলে নাম লেখালো আমেরিকা। আর যেহেতু আমেরিকার শক্তি ব্রিটেনের চেয়ে অনেক বেশি, সেইজন্য এবারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেও তারা।

আমেরিকা অবশ্য অস্বীকার করেছে এ কথা। ব্রিটেন আছে চুপ করে। ইজরায়েল আমেরিকার কথাই হিজ মাস্টারস্ ভয়েসের মত উদ্গীরণ করে চলেছে।

আমেরিকার পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র রবার্ট ম্যাকক্লোসকি চীৎকার করে বলেছেন: "The U. S. is neutral in thought, word and deed."

এই যুদ্ধে আমেরিকার সক্রিয় সাহায্যের ব্যাপার ধরা পড়ে যাওয়ার পর আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব ডীন রাস্ক ঘোষণা করেছেন: "These charges are utterly and wholly false."

আর ইজরায়েলের চীফ অব স্টাফ ইৎঝাক রাবিন আমেরিকা ও ব্রিটেনকে অপরাধ-মুক্ত করার জন্য সবিনয়ে জানালেন: "All this has been done by the Israeli defence forces alone, with what we have, without anything or any body else."

কিন্তু মিশর, জর্ডন, সিরিয়া, ইরাক এবং লেবানন অর্থাৎ যে-কটি দেশ এই ইজরায়েলি আক্রমণের স্বাদ গ্রহণ করেছে, সেই সব দেশের প্রত্যেকেই প্রথম থেকেই এক বাক্যে অভিযোগ করেছে মার্কিন বিমান আক্রমণের এবং যুদ্ধে আমেরিকার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ যোগসাজসের কথা।

সোভিয়েট কূটনৈতিক মহলের সংবাদে প্রকাশ ঃ যুদ্ধের কয়েকদিন আগে যে সব তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবক ইজরায়েলে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তারা কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশের সেনাবাহিনীতে চাকুরিরত ইহুদি। সংযুক্ত আরব রাজ্যের কর্তৃপক্ষ ইজরায়েলি পাইলটদের কথাবার্তার যে টেপ-রেকর্ডিং করেছেন এবং ধৃত ইজরায়েলি পাইলটদের জেরা করে যা জানা গিয়েছে তাতে বহু বিদেশী পাইলটের এই যুদ্ধে যোগদানের প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু এ কথা আমেরিকার বিরুদ্ধে রাশিয়ার বিষোদগার বলে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না, কারণ খাস আমেরিকার সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র 'টাইম' স্বীকার করেছে ঃ "More than 8,000 young Americans volunteered to go to Israel, and 200 of them managed to get in……"

এমন কি আমেরিকান 'লাইফ' পত্রিকা পর্যন্ত স্বীকার করেছে যে আমেরিকার অনেক অধিবাসীরই এই মত যে এই সঙ্কটের সময়ে আমেরিকা ইজরায়েলের সঙ্গে একত্র কিংবা মৈত্রীবদ্ধ হয়ে আমেরিকাকে প্রায় যুদ্ধের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

তবু আমেরিকার নেতারা সদম্ভে ঘোষণা করে যে আমেরিকা 'চিন্তায়, কথায় এবং কাজে নিরপেক্ষ।'

আমেরিকার সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র 'নিউজউইক'-এ তাদের বিশেষ সংবাদদাতার লেখা একটা ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে এই যুদ্ধে আমেরিকার যোগদানের সত্যতার কথা, নিরীহ্ নরনারীর ওপর তাদের নেপাম বোমা-বর্ষণের বীভৎসতার স্বরূপ।

জর্ডন অঞ্চলের দিক থেকে সংবাদ-সংগ্রহে রত এক আমেরিকান সাংবাদিক মারা যান। তাঁর মৃতদেহ আনবার জন্য 'নিউজউইক' পত্রিকার এই সংবাদদাতা ইজরায়েলি এ্যাম্বুলেন্সে করে পুরাতন জেরুজালেমে গিয়ে উপস্থিত হন। কোন রকমে দাঁড়-করানো এক

হাসপাতালের কর্তা ফাদার গোটিয়ারের সঙ্গে তিনি দেখা করলেন। যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে গোটিয়ার নাজারেথের ফরাসী মিশন থেকে এখানে ছুটে এসেছেন এবং হাসপাতাল খুলেছেন।

এই সংবাদদাতার প্রার্থনা শুনে ফাদার গোটিয়ার তাঁর হাতের রক্ত জামায় মুছে ফেলে বললেন—'মাত্র একটি মৃতদেহ নিতে এসেছেন? আমাদের এখানে এত মৃতদেহ পড়ে আছে, আর আপনি নিতে এসেছেন মাত্র একটিকে? এই মৃতদেহটি কি আর অন্য সমস্ত মৃতদেহের চেয়েও দামী? নিতে যদি হয় তবে আরো নিয়ে যান।'

তিনি ফাদারকে জানালেন যে শুধু ওই আমেরিকান সংবাদদাতার মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্যই তাঁর কাছে অনুমতি-পত্র আছে। একটি বিরাট গাদার ওপর থেকে সেই ধর্মযাজক তখন একটা কম্বল টেনে ফেলে দিলেন। সেই গাদায় পড়ে আছে দোমড়ানো মোচড়ানো পুতুলের মত কতগুলি জর্ডনীয় শিশুর মৃতদেহ এবং তাদের ওপর দুই হাত ছড়িয়ে শুয়ে আছে এক নারীর মৃতদেহ, যেন যে-বিভীষিকা হঠাৎ দেখা দিয়ে চলে গেছে তার হাত থেকে এই শিশুদের রক্ষা করার জন্য সেই নারী চেষ্টা করতে চাইছে।

ফাদার গোটিয়ার চীৎকার করে বলে উঠলেন—'এদেরও নিয়ে যান। এ সব আপনাদেরই কীর্তি।'

নিরীহ নারী ও শিশুদের ওপর আমেরিকান নেপাম বোমাবর্ষণে মর্মাহত এবং বিচলিত এই ফরাসী ধর্মযাজক আরবদের কর্মচারী নন এবং "broken, doll-like bodies of some Jordanian children and the corpse of a Jordanian woman" বলে যিনি দৃশ্যটি বিবৃত করছেন তিনি এক আমেরিকান সাংবাদিক—আরব নন।

এই সংবাদদাতাটি জানিয়েছেন যে ফাদার গোটিয়ার এই ব্যাপারে এতদূর মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন যে আমেরিকান সাংবাদিকের মৃতদেহ অপসারণে তিনি তো কোন সহযোগিতাই করেন নি, উপরন্তু

তাঁর সহকর্মী আরবদেরও কোন রকম সাহায্য করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

এই যুদ্ধের জন্য কে দায়ী সেই প্রসঙ্গে এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ডক্টর আর্নল্ড টয়েনবি নিজে ব্রিটিশ হয়েও বলেছেন: "এই যুদ্ধের জন্য নীতিগতভাবে দায়ী ইজরায়েল কিংবা আরব রাষ্ট্রগুলি নয়। দায়ী তিনটি পাশ্চাত্য শক্তি—ব্রিটেন, জার্মানি ও আমেরিকা।"

আমেরিকার এই জঘন্য নিষ্ঠুরতা ও বর্বর পশু-শক্তির প্রয়োগের বিরুদ্ধে যখন প্রতিটি সভ্য দেশ সোচ্চার, তখন নিজেদের অপরাধ গোপন করার জন্য এবং এই ব্যাপারটা যে নাসেরের এক মিথ্যা প্রচার তা প্রমাণ করার জন্য আমেরিকার সংবাদ-পত্র "টাইম" এমন এক হাস্যকর কাহিনীর অবতারণা করেছে, যা পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় এই কাহিনীর প্রকৃত উদ্দেশ্য। 'টাইম' পত্রিকার মতে মিশরের রাষ্ট্রপতি নাসের ও জর্ডনের রাজা হুসেনের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল, তা হয়েছে:

"নাসের: হ্যালো—আমরা আমেরিকা আর ইংল্যাণ্ডের নাম বলব—না শুধু আমেরিকার নাম?

হুসেন : আমেরিকা আর ইংল্যাণ্ড।

নাসের : ব্রিটেনের কি বিমানবাহী জাহাজ আছে?

হুসেন : (উত্তর বোঝা গেল না।)

নাসের : ঠিক আছে। তবে আমি একটা ঘোষণা করব এবং আপনিও একটা ঘোষণা করবেন এবং আমরা দুজনেই দেখব যে সিরিয়াও যাতে একটা ঘোষণা করে যে আমেরিকান আর ব্রিটিশ এরোপ্লেন বিমানবাহী জাহাজ থেকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এই ঘটনার ওপর আমাদের জোর দিতে হবে এবং এ ব্যাপারটা সকলের মনে গেঁথে দিতে হবে।"

বিমান আক্রমণের দায়ভাগ আমেরিকার ঘাড়ের ওপর থেকে সরানোর চেষ্টারও ত্রুটি হল না। জোর করে আকাবা উপসাগরের অবরোধ ভাঙার প্রস্তাবে ফ্রান্স সম্মত হয় নি। ১৯৫৬ সনে ফ্রান্স মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে আমেরিকার কাছ থেকে কোন সাহায্য পায় নি, তাই এবার ফ্রান্স আমেরিকাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত নয়। সুতরাং ইজরায়েলে আমেরিকার বিমান-সরবরাহের অপরাধ চাপানোর চেষ্টা করল 'নিউজউইক' ফ্রান্সের ঘাড়ে। 'নিউজউইক' জানাল যে ইজরায়েলকে ফ্রান্সই বিমান সরবরাহ করে চলেছে।

অর্থাৎ আমেরিকার কোন অপরাধ নেই, অপরাধ ফ্রান্সের।

কিন্তু লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকা "Economist" আরব-ইজরায়েল যুদ্ধে প্রকৃত নাটের গুরু আমেরিকার সম্বন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছে : "They did every thing, but did not come up themselves as their security was not directly involved."

যুদ্ধের পূর্বে ইজরায়েলের হয়ে গুপ্তচরের কাজ করে আমেরিকার কুখ্যাত সেণ্ট্রাল ইণ্টালিজেন্স এজেন্সি বা সংক্ষেপে সি. আই. এ। সমস্ত পৃথিবীতে এই কুখ্যাত চক্রের চক্রান্ত-জাল কিভাবে বিস্তৃত, তা মাত্র কয়েকদিন আগেই আমেরিকার পত্র-পত্রিকা সব তথ্য প্রকাশ করে এদের মুখোস খুলে দিয়েছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহায্য প্রভৃতির মিশনের মারফৎ কিভাবে তারা অন্য দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, কিভাবে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করে—আজ তা কারুর অজানা নেই। সেই সি. আই. এ-র ডাইরেক্টর রিচার্ড হেলমস্ আরব রাষ্ট্রসমূহের সামরিক শক্তি ও ঘাঁটির অবস্থানের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করে এবং তাদের সংবাদের ভিত্তিতেই এই যুদ্ধ পরিচালিত হয়। হেলমস্ যে সংবাদ এনে দেন আমেরিকার সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আর্ল হুইলারকে, সেই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে হুইলার

জনসনকে জানান যে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ চালানো হলে আরব রাষ্ট্রগুলি তিন চার দিনের মধ্যেই পরাজিত হবে। এ কথা জনসনের বিশ্বাস হয়, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেন না রাষ্ট্রসঙ্ঘে আমেরিকার স্থায়ী প্রতিনিধি গোল্ডবার্গ। জনসন আবার হেলমস্‌কে অনুসন্ধান করতে নির্দেশ দেন। সি. আই. এ. আবার অনুসন্ধান করে যে তথ্য সরবরাহ করে তা পূর্বের প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে মিলে যায়। সুতরাং আমেরিকা সরকার নিশ্চিন্ত মনে আরব-সংহার যজ্ঞে ব্রতী হয়।

এ সংবাদ আমেরিকারপ্রায় সব উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তবুও আমেরিকা জোর গলায় দাবী করে যে 'আমেরিকা চিন্তায়, কথায় এবং কাজে একেবারে নিরপেক্ষ।'

এবারকার আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষে ইজরায়েলদের পক্ষে আমেরিকান সাহায্যের একটি ঘটনা অন্তত হাততালির লোভে আমেরিকান 'টাইম' পত্রিকা উল্লেখ না করে থাকতে পারে নি। এটি হয়েছে এক গুপ্তচরবৃত্তির কাহিনী, যার নায়ক হয়েছেন এক আমেরিকান ধর্ম-যাজক,—তাঁর নাম রেভারেণ্ড ভেণ্ডাইল জোনস্‌। জর্ডন সীমান্তে তিনি মিশনারির কাজ করতেন, কিন্তু প্রকৃত কাজ কি ছিল তা বোঝা গেল এই যুদ্ধের সময়। ইজরায়েলি সৈন্য যখন জর্ডন সীমান্তে উপস্থিত হল, তখন খোঁজ পড়ল এই আমেরিকান ধর্ম-যাজকের। রেভারেণ্ড ভেণ্ডাইল জোনস্‌ এতদিন মিশনারির নামে খোঁজ রাখছিলেন জর্ডনের গোপন সামরিক ঘাঁটিগুলির অবস্থিতি। ইজরায়েলি সৈন্যবাহিনীকে তিনি সেই সব ঘাঁটিগুলির সংবাদ দেন গুপ্তচরের মত। এই পত্রিকাটি এই ঘটনাটি বিবৃত করে অতি উৎসাহের সঙ্গে জানাচ্ছে যে, "Using Jones as a spotter, Israelis quickly knocked out the guns and began the march that a day and a half later ended in the capture of Jerusalem's Old City."

ভারতবর্ষেও আমরা মিশনারিদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক কথা

শুনেছি। তাদের গুপ্তচরবৃত্তির কথা, শত্রুর সঙ্গে যোগসাজস করা, দেশের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করার কথা সকলেই জানে—যখনই এই সব বিদেশী মিশনারিদের আপত্তিজনক কার্যকলাপের কথা উঠেছে, তখনই তীব্র প্রতিবাদ হয়েছে। কিন্তু জর্ডনের যুদ্ধে এই আমেরিকান মিশনারির নক্কারজনক কাজের কথা আমেরিকার পত্রিকাই নিজে প্রকাশ করেছে। অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে প্রায় প্রত্যেক আরব-রাষ্ট্রে—কোথাও গুপ্তচরের কাজ করেছে মিশনারি, কোথাও এম্বাসির লোক, কোথাও বা অন্য কোন মিশনের সদস্য।

এত সব প্রমাণ থাকতেও আমেরিকা আজ অস্বীকার করছে যে তারা ব্রিটেন ও ইজরায়েলের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় নি বা এই যুদ্ধে তারা ইজরায়েলকে কোনরকম সাহায্য করে নি। ১৯৫৬ সনে সুয়েজ আক্রমণ করার সময়েও ব্রিটেন ঠিক একই রকম প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু তা যে কতদূর মিথ্যা তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে তখনকার ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ নাটিং-এর 'নো এণ্ড অব এ লেসন' গ্রন্থে। তিনি স্পষ্টই স্বীকার করেছেন যে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইজরায়েল অনেকদিন আগে থেকেই মিশর আক্রমণের পরিকল্পনা করছিল এবং ব্রিটেনের কথাতেই ইজরায়েল মিশরকে আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয়েছিল একটি সর্তে যে ব্রিটিশই প্রথম বোমারু বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে মিশরের বিমানবাহিনী ধ্বংস করবে, তারপর ইজরায়েল যুদ্ধে নামবে এবং ব্রিটেন এতে স্বীকৃত হয়ে সেইভাবে কাজ করে। এবারকার যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে ১৯৫৬ সনের যুদ্ধের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নেই। ঠিক আগের মতই প্রথমে অতর্কিত বিমান আক্রমণে আরব রাষ্ট্রগুলির বিমান ধ্বংস করা হল এবং সেই সঙ্গে ইজরায়েলি ট্যাঙ্কবাহিনী চারদিক দিয়ে আক্রমণ করল আরব-ভূমি। আমেরিকা ও ব্রিটেনের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে ইজরায়েলের মত ছোট রাষ্ট্রের এই আক্রমণ

করার সাহস হত কি ?

কিছুদিন গেলে আবার হয়তো নাটিং-এর মত কেউ এই ষড়যন্ত্রের ভেতরকার খবর প্রকাশ করবেন। তখন স্পষ্ট জানা যাবে কার দায়িত্ব কতখানি এবং আমেরিকা সত্য কথা বলছে কি না। এখনই নিজেদের কথায়-বার্তায়, ঝগড়াঝাঁটির মধ্য দিয়ে যতটুকু জানা যাচ্ছে, তাতে আরব রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্রের কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে এবং জানা যাচ্ছে যে এই ষড়যন্ত্রের প্রধান পাণ্ডা আমেরিকাই ইজরায়েলকে সাক্ষীগোপাল দাঁড় করিয়ে আরব রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

১৯৬৭ সনের গোড়ার দিক থেকেই আমেরিকা আর ইজরায়েলের এই ষড়যন্ত্র সুরু হয়েছিল।

ফেব্রুয়ারি মাসে ইজরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবা এবান ছুটে গেলেন ওয়াশিংটনে। সেখানে গিয়ে প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে দেখা করে প্রচুর সংখ্যক আমেরিকান 'স্কাইলার্ক' প্লেনের ব্যবস্থা করে ফিরে এলেন।

তারপর চলল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি পর্ব। সি. আই. এ. আরব রাষ্ট্রগুলির সামরিক শক্তি ও সামরিক ঘাঁটির সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে এনে দিল জনসনকে। আমেরিকার সামরিক কর্তৃপক্ষ সেই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে যুদ্ধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমেরিকা ভূমধ্যসাগরে পাঠাল তাদের ষষ্ঠ নৌবাহিনী, যার মধ্যে ছিল 'লিবার্টি' নামে সর্বাধুনিক রাডার ও ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ জাহাজ এবং দুটি বিমানবাহী জাহাজ 'আমেরিকা' ও 'সারাটোগা'। এই 'লিবার্টি' জাহাজ আরব রাষ্ট্রগুলির রাডার যন্ত্র বিকল করে দেয় এবং 'আমেরিকা' ও 'সারাটোগা'র থেকে আমেরিকান বিমান আরব রাষ্ট্রগুলির ওপর বোমাবর্ষণ করে। ইংল্যাণ্ডও পিছিয়ে থাকে নি। তারা এডেনে এনে উপস্থিত করল

বারোটা যুদ্ধের জাহাজ ও একটা বিমানবাহী জাহাজ।

প্রথমে স্থির হয় যে সতেরই মে এই আক্রমণ সুরু হবে, কিন্তু নাসের পূর্বাহ্নে জানতে পেরে গেলেন এ কথা। সুতরাং আক্রমণ পিছিয়ে দেওয়া হল এবং ষড়যন্ত্র হতে লাগল অতি গোপনে, যাতে বাইরে এ খবর কোনমতে জানাজানি না হয়।

আমেরিকা এবং ব্রিটেনের ইজরায়েলকে সাহায্যের কথা প্রথম প্রকাশিত হল মে মাসের "U. S. News and World Report"-এ। ইজরায়েলের প্রধান মন্ত্রী লেভি এশকোলের একটি সাক্ষাৎকার সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং সেই সাক্ষাৎকারে এশকোল আমেরিকা ও ব্রিটেনের সাহায্য প্রসঙ্গে বলেন, "Surely we expect that help especially if they were to take into consideration all promises and assurances given to Israel. We received these assurances when we asked for weapons from the U. S. A. We were told : Don't spend your money when we are here and the Sixth Fleet there."

মিশরে প্রায় তিন মাস আমেরিকার কোন রাষ্ট্রদূত ছিল না। মধ্য-প্রাচ্যের এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রদূত একজন থাকা প্রয়োজন। সুতরাং জনসন ২৩শে মে রিচার্ড নোল্টকে মিশরের রাষ্ট্রদূত করে পাঠালেন এবং তাঁর পরিচয়-পত্রেই নাসেরকে লিখলেন: 'যদি ইজরায়েল আক্রান্ত হয় তবে আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্টদের প্রদত্ত আশ্বাস অনুযায়ী ইজরায়েলকে সাহায্য করতে আমেরিকা বাধ্য হবে।'

আর ২৪শে মে ইজরায়েলের মন্ত্রী-সভায় স্থির হল যে এইবার মিশর আক্রমণ করা হোক।

কিন্তু লেভি এশকোল আমেরিকার সাহায্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্য এবং সমস্ত ঘটনা জনসনকে জানানোর জন্য আবা এবানকে ওয়াশিংটনে পাঠালেন। সেখানে আলাপ-আলোচনা শেষ করে ২৭শে মে ফেরার পথে এবান ওরলি বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের জানালেন

যে মিশর কর্তৃক আকাবা উপসাগর অবরোধ মুক্ত করার জন্য ইজরায়েলের সমস্ত কাজে আমেরিকা সর্বতোভাবে সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়েছে। ২৮শে মে লেভি এশকোল সেই একই কথার পুনরুক্তি করলেন, শুধু আমেরিকার সঙ্গে ব্রিটেনের নামও তিনি জুড়ে দিলেন। ১লা জুন এজেন্সে ফ্রাঁসে এক সংবাদে জানাল যে আমেরিকা ইজরায়েলকে শুধু ষষ্ঠ নৌবাহিনীর থেকেই বিমান-ছত্রের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

'জিরো আওয়ার' ঘনিয়ে আসছে। সুতরাং ৩রা জুন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী উইলসন ছুটলেন আমেরিকায়। জনসনের সঙ্গে গোপন শলা-পরামর্শ হল। ফিরে এলেন ৪ঠা জুন।

৫ই জুন সকালবেলায় ইজরায়েল আক্রমণ করল আরব-ভূমি।

একই সময়ে সমগ্র আরব-ভূমিতে পঁচিশটি জায়গায় ইজরায়েলি প্লেন বোমা বর্ষণ করেছিল। মিশরে বারোটি করে প্লেন তিন ঝাঁকে তেরোটি বিমানঘাঁটি আক্রমণ করে। অর্থাৎ কমপক্ষে ছয়শটি প্লেন নিশ্চয়ই এই বোমা-বর্ষণে যোগ দিয়েছিল। তাছাড়া স্থলবাহিনীর সাহায্যের জন্য আরও চারশটি ইজরায়েলি প্লেন অংশ গ্রহণ করেছিল বলে পশ্চিমী মহলের সংবাদে প্রকাশ। সুতরাং খুব কম করেও এক হাজার ইজরায়েলি প্লেন প্রথম দিন যুদ্ধে যোগদান করে। ইজরায়েলের বিমান সংখ্যা সাড়ে তিনশ'র বেশি নয়, বাকী সাড়ে ছয়'শ প্লেন এল কোথা থেকে? এর উত্তর পাওয়া যাবে আমেরিকান বিমানবাহী জাহাজ 'আমেরিকা' ও 'সারাটোগা' এবং এডেনস্থিত ব্রিটিশ বিমানবাহী জাহাজের কাছে।

এই সব প্লেনকে আরবদের গোপন বিমান-ঘাঁটির সন্ধান দিয়েছিল আমেরিকার জাহাজ 'লিবার্টি'। আমেরিকা অবশ্য অস্বীকার করে জানিয়েছে যে 'লিবার্টি' আরব-ভূমির থেকে ছয়'শ মাইল দূরে ছিল; কিন্তু আমেরিকান সংবাদ-সাপ্তাহিক "নিউজউইক" লিখছে, "About 15 miles off the coast of the Sinai Peninsula, the U. S.

navy communications ship 'Liberty' cruised slowly."
ছয়শ মাইল নয়, মাত্র পনের মাইল দূরে ছিল 'লিবার্টি' জাহাজ।
এই 'লিবার্টি' জাহাজ প্রসঙ্গে জি. রসিদি একটি প্রবন্ধে লিখছেন ঃ "It is now known that the secret of their (Israel's) success lay in the fact that U. S. communication vessel *Liberty*, with its highly sophisticated equipment for directing air-craft to their targets, was all the while feeding information to the Israeli pilots. The attacking planes did not have to locate their targets but were simply led to them."
আমেরিকার ইউ-প্লেন প্রথমে আরব রাষ্ট্রগুলির সব বিমান-ঘাঁটি ও গোপন সামরিক ঘাঁটির ফটো তুলে আনে। যুদ্ধের আগের দিন সন্ধ্যায় হঠাৎ কয়েকটি অজ্ঞাত দেশের প্লেন খুব উঁচু দিয়ে উড়ে যায়। আরব প্লেনগুলি সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে আসে। এইভাবে তারা আরবদের বিমানঘাঁটি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়। ঠিক এইভাবেই একটি অজ্ঞাত দেশের জাহাজ আকাবা উপসাগরে প্রবেশ করে। মিশরের গোপন কামানঘাঁটিগুলি গোলাবর্ষণ করলেই জাহাজটি দ্রুত চলে যায় এবং এই গোপন ঘাঁটিগুলির অবস্থিতি তারা জেনে যায়।
জি. রসিদি-র ওই প্রবন্ধ থেকে আরও জানা যায় যে, ২১শে মে মিশরের রাডারে দেখা যায় যে দশটি জেট প্লেন ইজরায়েলের লিড্ডা বিমানঘাঁটিতে পশ্চিম দিক থেকে এসে নামে। পরের দিন আরও দশটা প্লেন আসে। আমেরিকার মালবাহী প্লেন লিবিয়ার হুইলাস বিমানঘাঁটি থেকে প্রতিমুহূর্তে সমরসম্ভার নিয়ে ইজরায়েলে উপস্থিত হচ্ছিল। ৬ই জুন ৩২টি আমেরিকান প্লেন লিবিয়ার বিমানঘাঁটি থেকে ইজরায়েলে আসে। বন্দী ইজরায়েলি পাইলটরা স্বীকার করেছে যে তাদের আমেরিকান ও ব্রিটিশ হেলিকপ্টারে করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে আসা হয়।

সুয়েজ যুদ্ধের মত এই যুদ্ধেও ইজরায়েল প্রথমে চীৎকার করে উঠেছিল : মিশর প্রথমে ইজরায়েলকে আক্রমণ করেছে। ইজরায়েলের সুরে সুর মিলিয়ে এই একই কথা আমেরিকা বারবার বলে। কিন্তু আমেরিকান পত্রিকা 'নিউজউইক'-এর ভাষ্যে ইজরায়েলই প্রথমে ত্রিমুখী অভিযান চালায়। আমেরিকান পত্রিকা 'টাইম' বলে : "Israel must have struck the first blow." আর ব্রিটিশ পত্রিকা 'দি অবজার্ভার'-এর রণাঙ্গনের বিশেষ সংবাদদাতা এণ্ড্রু উইলসন জানান : "Israel opened the war."

মিশর যদি প্রথম আক্রমণ করত তবে অন্ততঃ মিশরের সৈন্যবাহিনী ইজরায়েল সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারুক, ধারে কাছে থাকতই। কিন্তু নিরপেক্ষ সংবাদদাতাদের সংবাদে কিংবা প্রকৃত ঘটনার অনুসরণে এ কথা প্রমাণিত হয় নি। এইটুকুই প্রমাণিত হয়েছে যে ইজরায়েলি ট্যাঙ্কবাহিনী ফাঁকা সিনাই মরুভূমির ভেতরে অনেকদূর অগ্রসর হওয়ার পরই মিশরীয় ট্যাঙ্কবাহিনী অপ্রস্তুত ও অবিন্যস্তভাবে তাদের বাধা দিতে অগ্রসর হয়।

বিশিষ্ট সাংবাদিক রবিন ষ্ট্যাফোর্ড ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিমানে করে সিনাই অঞ্চল পরিদর্শন করে যে সংবাদ পাঠান তার অংশ-বিশেষের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে যে সিনাই অঞ্চলে মিশরীয় সৈন্য-বাহিনী ছিল কি না :

"বিমানটি চারবার সিনাই মরুভূমিতে নামে, মরুভূমির এপাশ ওপাশ ঘুরে বেড়ায়—কোথাও প্রাণের চিহ্ন চোখে পড়ে না। শুধুই নীরবতা আর মৃতদেহ।"

"যে পাঁচটি স্থলবাহিনী এবং দুটি সাঁজোয়াবাহিনী ইজরায়েলিরা নিশ্চিহ্ন করেছে, তারা কোথায় গেল? ইজরায়েলি মুখপাত্র জানালেন : আমাদের নীতি হয়েছে যে, যে তরবারি ত্যাগ করেছে

তাকে যেতে দাও। তারা সব চলে গিয়েছে।"

"আমাদের জানানো হয়েছিল যে হাজার হাজার লোক কোনরকমে সুয়েজ খালের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এক লক্ষ সাঁজোয়া এবং স্থলবাহিনীর লোকদের কোথাও চোখে পড়ল না। তা ছাড়া প্রেসিডেন্ট নাসের যে পঞ্চাশ হাজার বিমানবাহিনী ও প্রশাসনের কর্মচারীদের পাঠিয়েছিলেন, তারাই বা গেল কোথায়?......"

"সুয়েজ খাল পর্যন্ত উড়ে গিয়েও কিছু দেখা গেল না। বিধ্বস্ত এলাকায় কিছু মৃত মিশরীয়দের নিরাবরণ দেহ গাড়ির পাশে পড়ে থাকতে দেখা গেল। প্রেসিডেন্ট নাসেরের বাকী সৈন্যরা কোথায়—সবই কেমন যেন ভূতুড়ে!"

এতেও যদি পরিস্ফুট না হয় যে কে সত্যকারের আক্রমণকারী, তবে আর কয়েকটি সংবাদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

আমেরিকার সংবাদ-সাপ্তাহিকের সংবাদঃ "Weeks before, meticulous Israeli Staff Officers had worked out their ground-war tactics down to the last detail."

আর দ্বিতীয় সংবাদটি পাওয়া গেছে ইজরায়েলের প্রধান মন্ত্রী লেভি এশকোল এবং যুদ্ধমন্ত্রী মোসে দায়ান-এর মধ্যে বিরোধের ঘটনাবলী থেকে।

ইজরায়েলের শাসন-ক্ষমতা এখন একটি যুক্ত ফ্রন্টের হাতে। এই ফ্রন্টে আছে মাপাই দল, রফি দল এবং ন্যাশানাল রিলিজিয়াস পার্টি। ১৯৪৮ সন থেকেই এই মাপাই দল ইজরায়েলে ক্ষমতাসীন, ডেভিড বেন গুরিয়ন তখন প্রধান মন্ত্রী। কিন্তু মাপাই দলের মধ্যে নেতৃত্বের লড়াই লাগে—একদিকে বেন গুরিয়ন, অন্যদিকে এশকোল। ইতিমধ্যে ১৯৫৭ সনে মোসে দায়ান মন্ত্রী হয়েছেন এবং তিনি তখন বেন গুরিয়নের সবচেয়ে প্রিয়পাত্র ও ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী। নেতৃত্বের লড়াইয়ে পরাজিত হলেন বেন গুরিয়ন, সঙ্গে সঙ্গে মোসে দায়ানের প্রধান মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন

দূর হয়ে গেল। বেন গুরিয়ন পদত্যাগ করলেন এবং মাপাই দল থেকে বেরিয়ে রফি দল প্রতিষ্ঠা করলেন। দায়ানও মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে রফি দলে যোগ দিলেন। এবারে লড়াই এশকোল আর দায়ানের মধ্যে।

দায়ান প্রথমে ইহুদি অন্তর্ঘাতী সমিতি হাগানার সদস্য ছিলেন। ১৯৩৯ সনে ব্রিটিশ তাঁকে জেলে পাঠায়। দু বছর পরে তিনি সিরিয়াতে মিত্র-বাহিনীর পক্ষে ফরাসী ভিসি-সরকারী সৈন্যের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কাজ করেন এবং যুদ্ধান্তে আবার হাগানা দলে যোগ দেন। ১৯৪৮ সনে জেরুজালেম আক্রমণকারী ইজরায়েলি বাহিনীর তিনি নেতৃত্ব করেন। ১৯৫৩ সনে ইজরায়েলি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হন এবং ১৯৫৬ সনের সুয়েজ যুদ্ধে সুনাম অর্জন করেন। সুতরাং সাধারণ ইজরায়েলির কাছে তিনি খুবই জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ দখলের জন্য তিনি ১৯৫৭ সনে চাকরি ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে যোগ দেন।

এশকোল কিন্তু দায়ানকে মন্ত্রীসভায় নিলেন না অথচ আমেরিকার চাপে পড়ে তাকে আরবদের সঙ্গে যুদ্ধে নামতে হচ্ছে। এই সুযোগ নিলেন দায়ান। তিনি যুক্তফ্রণ্টের রফি দল ও ন্যাশান্যাল রিলিজিয়াস পার্টির সদস্যদের হস্তগত করে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বললেন। ২৮শে মে মন্ত্রীসভায় স্থির হল যে মিশরের বিরুদ্ধে অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। এশকোল তখনও পর্যন্ত আমেরিকা আর ব্রিটেনের কাছ থেকে যুদ্ধ সুরু করার সবুজ আলোর সঙ্কেত পান নি। তিনি পাঠালেন আবা এবানকে আমেরিকায়। আবা এবান আমেরিকা থেকে জনসনের আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে এলেন। এবারে ছুটলেন ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী উইলসন আমেরিকায়। জনসন-উইলসন বৈঠকে আরবদের ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল। উইলসন ফিরলেন দেশে ৪ঠা জুন। যুদ্ধ ৫ই জুন; কিন্তু তখনও দায়েনকে এশকোল মন্ত্রী হতে ডাকেন নি।

দায়ান ছুটলেন রফি আর ন্যাশানাল রিলিজিয়াস পার্টির অন্যান্য

নেতাদের কাছে। সকলে মিলে চাপ দিলেন এশকোলকে। বাধ্য হয়ে এশকোল যুদ্ধ সুরু হওয়ার মাত্র আট ঘণ্টা আগে মোসে দায়ানকে যুদ্ধমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন।

যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দায়ান চুপ করে রইলেন, কিন্তু এশকোলের এই ব্যবহার তিনি ভোলেন নি। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এশকোলকে অপদস্থ করা এবং তাঁকে প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করার জন্য তিনি উঠে পড়ে লাগলেন।

ন্যাশানাল রিলিজিয়াস পার্টির এক সভায় মোসে দায়ান তাই লেভি এশকোলকে এক হাত নিলেন। সমস্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে তিনি সদস্যদের প্রশ্ন করলেন: "Why Mr. Eshkol, who claimed to have been able to get a war vote through the Cabinet at a meeting on May 24, had not exercised that power ?"

২৪শে মে-র এই সভায় যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব যে হয়েছিল, সে কথা এশকোলও স্বীকার করেছেন।

২৪শে মে-ই যদি ইজরায়েল স্থির করে থাকে আরবরাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা, তবে আক্রমণকারী কারা? আর তখন পর্যন্ত এমন কি বড় ঘটনা ঘটেছিল যে ইজরায়েলের যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে?

কারণ আরব-আক্রমণের ভয় নয়, কারণ আরও গভীর।

সেই কথায় এখন আসা যাক।

এই যুদ্ধের প্রস্তুতি-পর্ব এখন নয়। সুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সনেই—যখন আরব দেশের বুকের ওপর ইহুদিদের স্বাধীন রাষ্ট্র ইজরায়েল জোর করে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেভিনের মতে আমেরিকায় ইহুদি অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্যই আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ট্রুমানের স্বাধীন ইহুদি-রাষ্ট্র ইজরায়েল প্রতিষ্ঠায় এত

আগ্রহ। ট্রুমানের আপ্রাণ চেষ্টায় যখন আরবদের নিজেদের বসত-ভূমি থেকে উৎখাত করে ইজরায়েল প্রতিষ্ঠিত হল, তখন দামোদর শেঠের মত ইহুদিরাও এত অল্পেতে খুশি হতে পারে নি। তারা দাবী করেছিল সমগ্র প্যালেষ্টাইন এবং তাদের এই অভিলাষ পূরণের জন্য যুদ্ধ-বিরতির সময় আমেরিকা তাদের নতুন সমর-সম্ভার দিয়ে সাহায্য করেছিল।

তারপর এসে উপস্থিত হল রাষ্ট্রসঙ্ঘ। মধ্যস্থ হয়ে এলেন কাউণ্ট বার্নাদোত। বার্নাদোত যখন ইজরায়েলকে নির্দিষ্ট সীমানা লঙ্ঘন করতে নিষেধ করলেন, তখন রাষ্ট্রসঙ্ঘকে ভয় দেখিয়ে নিজেদের দাবী আদায় করার জন্য ইহুদিরা বার্নাদোতকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল। তবুও জর্ডনের হাতে রয়ে গেল প্যালেষ্টাইনের সামান্য ভগ্নাংশ এবং পুরাতন জেরুজালেম নগরী।

ইহুদিরা এটা সহ্য করতে পারছিল না।

ইজরায়েল থেকে বিতাড়িত আরব-উদ্বাস্তুরা যখন ইজরায়েল-সংলগ্ন জর্ডন নদীর ধার বরাবর জর্ডন রাজ্যে বসবাস করতে লাগল, তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ইউরায়েল। কারণ এই অঞ্চলটুকু তাদের চাই-ই। সেখানে আরব উদ্বাস্তু পুনর্বাসন চলতে পারে না। তারা উদ্বাস্তুদের জন্য স্বীকৃত ক্ষতিপূরণ দিতে যে শুধু অস্বীকার করল তা-ই নয়, নানাভাবে তাদের ওপর অত্যাচার সুরু করল। এই হল জর্ডনের ওপর রাগের কারণ। মিশরের ওপর রাগের কারণ হল এই যে, আকাবা উপসাগর, তিরাণ প্রণালী এবং নৌ-ঘাঁটি শরম এল-শেখ মিশরের হাতে থাকায় তাদের দক্ষিণাঞ্চলের বন্দর এলাথ একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছে। সিরিয়ার ওপর রাগের কারণ এই যে প্যালেষ্টাইন অঞ্চলটি প্রথমে সিরিয়ারই অন্তর্গত ছিল এবং সিরিয়া সেই জন্য প্যালেষ্টাইনস্থ আরবদের ওপর সহানুভূতিশীল।

সুতরাং ১৯৫৬ সনে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মিশরের সঙ্গে লড়াই করতে তাদের বাধে নি। এই যুদ্ধে তাদের আশা পূর্ণও

হয়েছিল। তারা শরম এল-শেখ অধিকার করে আকাবা উপসাগরকে কাজে লাগাতে পেরেছিল। তা ছাড়া তারা সিনাই অঞ্চলের অনেকখানি জায়গা অধিকার করেও বসেছিল।

কিন্তু আবার রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাদ সাধল। হৃত অঞ্চল মিশরকে তাদের ফিরিয়ে দিতে হল, যদিও শরম এল-শেখ এবং আকাবা উপসাগরের কর্তৃত্ব রইল রাষ্ট্রসঙ্ঘের ওপর এবং সেইজন্য এলাথ বন্দরটিকে তাদের কাজে লাগাতে কোন অসুবিধা হয় নি।

এবারে ইজরায়েল একটি পরিকল্পনা নিয়ে শত্রুতা করতে লাগল। জর্ডন এলাকায় ডেড্ সী-তে প্রচুর রাসায়নিক লবণ আছে। তা দিয়ে বড় ব্যবসা ফাঁদা যায়, সুতরাং ডেড্ সী তার দরকার। পুরাতন জেরুজালেম নগরীতে আছে তাদের ওয়েলিং ওয়াল—তাদের দ্বিতীয় মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, সুতরাং পুরাতন জেরুজালেম তাদের চাই। সিরিয়ার অধিকারের সী অব গ্যালিলি এবং তার আশেপাশের পাহাড়ী অঞ্চল তার চাই দুর্ভেদ্য দুর্গের জন্য। শরম এল-শেখ তার প্রয়োজন দক্ষিণাঞ্চলকে সুরক্ষিত করার জন্য। আর চাই জর্ডন নদীর ধার বরাবর জেনিন থেকে বেথেলহেম হয়ে হেব্রোন পর্যন্ত সমস্ত জর্ডন অঞ্চল যাতে সম্পূর্ণ প্যালেষ্টাইন তাদের হাতে আসে। আর চাই সুয়েজ খালের দখল।

সেইজন্য ইজরায়েল আমেরিকার শরণাপন্ন হল। আমেরিকা প্রথমে ইতস্ততঃ করল, কিন্তু যখন দেখল যে নাসেরের প্রভাব দিন দিন মধ্যপ্রাচ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে, রাশিয়াও তার প্রভাব বিস্তার করছে এবং সেই অনুপাতে আমেরিকার প্রভাব একেবারে হ্রাস হচ্ছে তখন তার একমাত্র সম্বল ইজরায়েলকে আর চটাতে আমেরিকা সাহস করল না। এখন আমেরিকার দলে আর লেবানন নেই, ইরাক নেই।—লেবানন, ইরাক, সিরিয়া, জর্ডন, সৌদি আরব, মিশর, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরোক্কো, সুদান—সব জায়গাতেই নাসেরের প্রভাব, সুতরাং তারপরেই ঢুকে পড়বে রাশিয়া।

ইজরায়েল যখন জর্ডনকে মরুভূমি করার জন্য জর্ডন নদীর জল ভিন্ন মুখে প্রবাহিত করার সঙ্কল্প করল, তখন আমেরিকা চুপ করে রইল। ১৯৬৬ সনের নভেম্বরে যখন ইজরায়েল ট্যাঙ্ক বাহিনী নিয়ে জর্ডন আক্রমণ করল তখন আমেরিকা তাকে বাহবা দিল ; কিন্তু তখনও প্রত্যক্ষভাবে আমেরিকা জড়িয়ে পড়ে নি।

কিন্তু ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ তে লাগল গোলমাল। সিরিয়ায় এক বিপ্লব হয়ে ক্ষমতাসীন দল নাসেরের অনুগামী হল। এখন বিচলিত হয়ে পড়ল আমেরিকা। এবার আমেরিকা আরবদেশের বিরুদ্ধে ইজ-রায়েলকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে নামল। এলাথ বন্দর থেকে আকাবা উপসাগর দিয়ে আমেরিকান অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ইজরায়েলি বাহিনী প্রতিদিন সিরিয়ায় আক্রমণ চালাতে লাগল। সিরিয়ার ক্ষমতাসীন দল পরাস্ত হলে ইরাক আর কতক্ষণ ; আমেরিকার মুঠোয় আসতেই হবে। আর জর্ডন এবং সৌদি আরব—এই দুই দেশের রাজাকে তো টাকা দেখিয়ে দলে নেওয়া যখন তখনই যায় !

সিরিয়া বিপদগ্রস্ত হয়ে নাসেরের কাছে আবেদন জানাল। ১৩ই মে নাসের সিরিয়াকে সাহায্য করা স্থির করলেন। আকাবা উপসাগর দিয়েই যাচ্ছে ইজরায়েলি অস্ত্রশস্ত্র, সুতরাং রাষ্ট্রসঙ্ঘকে নাসের জানালেন আকাবা উপসাগর থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী সরিয়ে নিতে। এই উপসাগর অবরোধ করলেই ইজরায়েলের নষ্টামি দূর হবে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ সমস্ত ব্যাপারই জানত। তারাও চাইছিল ইজরায়েলের গুণ্ডামি বন্ধ করতে। সুতরাং শরম এল-শেখ ও আকাবা উপসাগর মিশরের হাতে ছেড়ে দিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী চলে এল। মিশর আকাবা উপসাগর অবরোধ করল।

ইজরায়েল এটা সহ্য করতে পারে নি। তাদের ধারণা ছিল, রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী সরে গেলে এই অঞ্চল তারা পাবে। সুতরাং তারা আবার আমেরিকার কাছে ধর্না দিল।

আমেরিকা নাসেরের প্রতিপত্তি নষ্ট করার এই সুযোগ ছাড়তে চাইল

না। তা ছাড়া এক ঢিলে দুই পাখি মারতে পারবে মনে করে খুশি হয়ে উঠল। রাশিয়া সাহায্য করার চেষ্টার আগেই যদি ইজরায়েল আমেরিকান ও বৃটেনের সাহায্যে আরব রাষ্ট্রগুলোকে পরাজিত করতে পারে, তবে রাশিয়া বে-ইজ্জৎ হবে এবং আমেরিকার দাম বাড়বে। ফাউ হিসেবে নাসেরও খতম হতে পারেন।

সুতরাং ব্রিটেনকে দলে নিতে হল—চাই কি একটু এদিক ওদিক হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। ব্রিটেনের সুয়েজ হারানোর ঘা এখনো শুকোয় নি, সুয়েজ পুনরুদ্ধারের লোভে পড়ে ব্রিটেন রাজি হল।

তা ছাড়া জনসন সাহেবের আরো মতলব ছিল।

ভিয়েৎনামের যুদ্ধে আমেরিকাকে টেনে নিয়ে যাওয়াতে আমেরিকার জনগণের এক বড় অংশ জনসনের ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে। আমেরিকার ইহুদি সম্প্রদায়ও এক বিরাট মিছিল বার করে জনসনের ভিয়েৎনাম নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। জনসন আমেরিকাকে ইহুদি-রাষ্ট্র ইজরায়েলের পক্ষে যুদ্ধে নিয়ে গেলে ইহুদি সম্প্রদায় আর বিক্ষোভ প্রকাশ করতে পারবে না, কারণ রাজনৈতিক দিক দিয়ে আমেরিকার কাছে ভিয়েৎনামও যা, ইজরায়েলও তাই। ইজরায়েলে আমেরিকা যুদ্ধ করলে যদি অপরাধ না হয় তবে ভিয়েৎনামেও হওয়া উচিত নয়। একটি চালে জনসন ইহুদিদের মুখ বন্ধ করলেন।

আবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আসন্ন। আমেরিকার সাতান্ন লক্ষ বিশ হাজার ইহুদির ভোট এই নির্বাচনে হারাতে কে চাইবে?—জনসন তো নয়। ইহুদিদের ভোটের লোভও ইজরায়েলকে সাহায্য করতে জনসনকে বাধ্য করেছিল।

আমেরিকার 'লাইফ' পত্রিকায় এই কথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়:
"L. B. J.'s personal position strengthened considerably because of the way the Middle East crisis came

out.···Mediterranean episode will help rally Vietnam support for the President and tend to discourage dissent."

যুদ্ধ যে এত শীঘ্র বাঁধতে পারে—এ কথা কারো মনে ওঠবার আগেই আমেরিকা ও ব্রিটেনের সাহায্যে ইজরায়েল মরিয়া হয়ে আক্রমণ করল আরব ভূমি। রাশিয়ার সাহায্য এসে পৌঁছোবার আগেই যুদ্ধ-বিরতি।

এই যুদ্ধের ফলে ইজরায়েল তার রাজ্যের আয়তন চারগুণ বাড়িয়ে নিল। শরম এল-শেখ, আকাবা উপসাগর, তিরান প্রণালী, ডেড্ সী, জর্ডন নদীর তীর, সী অব গ্যালিলি, সুয়েজ অঞ্চল, সিনাই—সব কিছু অধিকার করে বসল।

পরিস্থিতি একটু ঠাণ্ডা হলেই সুয়েজে আসবে ব্রিটেন।

আমেরিকা রাশিয়াকে জব্দ করল ঠিকই, কিন্তু নাসেরকে হটাতে পারল না।

আজ ইজরায়েলে আনন্দের বন্যা।

অধিকৃত আরব ভূমি থেকে জোর করে, ভয় দেখিয়ে, অত্যাচার করে আরবদের বিতাড়িত করছে। আরব ভূমি থেকে আজ পর্যন্ত তের লক্ষেরও বেশি আরব গৃহহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে কয়টি আরব ইজরায়েলের অধিকৃত ভূমিতে এখনও আছে, তাদের ওপর ইহুদিদের নিপীড়ন নাৎসী-নিপীড়নকেও ছাড়িয়ে যেতে বসেছে।

এই অত্যাচার লক্ষ্য করে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক টয়েনবি অত্যন্ত ক্ষোভে বলেছেন: "It is a tragic irony that Jews, who once earned world-wide sympathy for the horrors perpetrated on them by the Nazis, should now reverse roles vis-a-vis the Arabs."

ইহুদিদের এই আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে হিব্রু-মহাপ্রবর আমোসের বাণী যেন এখনও শুনতে পাই ঃ

'ঘৃণা করি, ঘৃণার চোখে দেখি তোমাদের উৎসব,
আর তোমাদের এই আনুষ্ঠানিক সমাবেশে আমি আনন্দ পাই না।

... ...

'তোমাদের গানের আনন্দ আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও,
তোমাদের বীণার ঝঙ্কার আমি শুনতে চাই না,
কিন্তু ন্যায়-বিচার যেন জলধারার মত গড়িয়ে যায়,
এবং ঝরে পড়ে চির-প্রবাহিনী ঝর্ণার মত ন্যায়-পরায়ণতা।'

ইতিহাস আরবদের ওপর সুবিচার করে নি।

নিজগৃহে পরবাসী হয়েছে তারা পশ্চিমী শক্তির কূটচক্রে। সেইজন্যই তারা ইজরায়েলকে মেনে নিতে পারে নি। একথা স্বীকার করে নিয়েছেন প্রফেসর টয়েনবি, কিন্তু তাদের দোষ দিতে পারে নি। তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলেছেন ঃ 'তবু বলব, আপনি আমি যদি আরব হতাম, ইজরায়েল সম্পর্কে আমাদের মনোভাব ঠিক আরবদেরই মত হত।'

তিনি আরো বলেছেন ঃ 'আরব-ইজরায়েলের সমস্যা সমাধানের এক বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে পাশ্চাত্য দেশের ওপর। এই পথে পৌঁছুতে হলে প্যালেষ্টাইনের আরবদের প্রতি ন্যায়-বিচারের একটি সূত্র সন্ধান করতে হবে। কিন্তু ন্যায়-বিচারকে যেন উদ্বাস্তুরা ও সমগ্র আরব জগৎ ন্যায় বলেই মেনে নিতে পারে।......আরবদের শুভ কামনা ব্যতীত ইজরায়েলের পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়—এই কথাটি যেন যুদ্ধে বিজয়ী ইজরায়েল বিস্মৃত না হয়।'

এই দয়ামায়াহীন পার্বত্য মরুদেশে প্রায় দুই হাজার বছর আগে

নাজারেথের এক ইহুদি শান্তি, ক্ষমা এবং বিশ্বপ্রেমের বাণী প্রচার করেছিলেন। সেদিন ইহুদি-চক্রান্তে তিনি বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে আত্ম-উৎসর্গ করেন। আজ আবার ইহুদি চক্রান্তে এই দেশে শান্তি বিঘ্নিত। এই ইহুদিরা তাদের ধর্মগ্রন্থ পড়ে শুধু শিখেছে—'জীবন নিয়ে জীবন দেবে, চোখের বদলে দেবে চোখ।' পড়তে ভুলে গেছে সেই একই ধর্মগ্রন্থে মহাপ্রবর ইশায়ার বাণী ঃ 'কোন জাতি অন্য কোন জাতির বিরুদ্ধে তরবারি তুলবে না, তরবারি চালনা করতেও যেন তারা শেখে না কোনদিন।'

জেরুজালেম সম্বন্ধে ইহুদিদের মধ্যে একটি সুন্দর কথা প্রচলিত আছে। সমগ্র বিশ্বে দশ ভাগ সৌন্দর্য দেওয়া হয়েছিল—তার মধ্যে নয় ভাগ পেয়েছিল জেরুজালেম, অবশিষ্ট পৃথিবী পেল বাকী এক ভাগ।

সমগ্র বিশ্বে দশ ভাগ দুঃখ দেওয়া হয়েছিল—নয় ভাগ পেল জেরুজালেম, অবশিষ্ট এক ভাগ পেল বাকী পৃথিবী।

১৮

আরব-ইজরায়েলের যুদ্ধ নাটকীয়ভাবে সমাপ্ত হল—কিন্তু নাটকের শেষ অঙ্কের তখনও অনেক বাকী ছিল।

সেদিনের কথা ভুলব না।

৯ই জুন। নাজমার বাড়িতে আমি আর নাজমা বসে বসে গল্প করছি—নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা, মাঝে মাঝে উঠে পড়ছে এই যুদ্ধের কথাও। যুদ্ধ শেষ হয়েছে যখন, তখন হয়তো শিগ্‌গিরই প্লেন চলাচল সুরু হয়ে যাবে—আমারও এদেশ ছেড়ে ভারতের পথে পাড়ি দিতে হবে। দুজনের মনই স্বভাবতঃ বিষণ্ণ, যদিও নাজমা এবার স্বীকার করেছে আমার সঙ্গে যেতে।

ঘরের কোনের রেডিও থেকে ভেসে আসছে গান, বাজনা—কখনও বা যুদ্ধের সর্বশেষ খবর। হঠাৎ গান বন্ধ হয়ে গেল এবং পরক্ষণেই একটি বিশেষ ঘোষণা শোনা গেল। এবার আরব যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট গামাল আবদেল নাসের দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক বিশেষ বেতার ভাষণ দেবেন।

উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম দুজনে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দেশমত মিশর ইজরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র সংবরণ করেছে। আবার এমন কি ঘটনা ঘটতে পারে যে—সঙ্গে সঙ্গে নাসেরের গলা শোনা গেল। বেদনার্ত কণ্ঠস্বর, কত ক্লান্ত যেন।

দেশবাসীকে উদ্দেশ করে নাসের বললেন ঃ

"এ সত্য আমাদের কাছে আর আমরা গোপন করে রাখতে পারি না যে, বিগত কয়েক দিনের মধ্যে আমরা এক নিদারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি। এ কথা গোপন করে লাভ নেই যে, ইজরায়েলের সামরিক শক্তির কাছে আমরা পরাজিত হয়েছি।

"৫-ই জুন যখন ইজরায়েল আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন

তাদের পিছনে অন্য কয়েকটি রাষ্ট্রও ছিল। শত্রুকে সাহায্য করার জন্য তাদের দেশের সমুদ্র উপকূলে বিমানবাহী জাহাজ উপস্থিত ছিল। এ কথা আমি অকপটে এবং অত্যন্ত জোর গলায় বলতে পারি যে আমেরিকান ও ব্রিটিশ বিমান ইজরায়েলকে সাহায্য করেছিল। সে প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে।

"রাশিয়ার সর্বশেষ প্রস্তাবের ভিত্তিতেই আমরা যুদ্ধ-বিরতি মেনে নিয়েছি। আরব-অঞ্চলে আর কেউ থাবা মারবে না বলে আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার ওপর নির্ভর করেই আমরা অস্ত্র ত্যাগ করেছি।

"নিদারুণভাবে বিপর্যস্ত এক জাতির নেতৃত্ব থেকে আজ আমি বিদায় চাইছি, কিন্তু এই বিশ্বাস নিয়েই যাচ্ছি যে এই স্বল্প-স্থায়ী দুরূহ বাধা অতিক্রম করে আমার দেশ এবং আমার জাতি তার স্থির-লক্ষ্যে অগ্রসর হবেই।

"নামগোত্রহীন একজন সাধারণ নাগরিক হয়ে আবার আমি আপনাদের মধ্যেই ফিরে যাচ্ছি। সমস্ত সরকারি পদ বা রাজনৈতিক ভূমিকা থেকে আমি অবসর গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সাম্রাজ্যবাদীরা মনে করে এবং বলেও থাকে যে গামাল আবদেল নাসেরই তাঁদের শত্রু; কিন্তু তারা কি চোখ খুলে একবারও দেখে না যে একমাত্র নাসেরই তাদের শত্রু নয়—সমগ্র আরবজাতি তাদের শত্রু!

"আরব-জাতীয়তাবাদ যাঁদের দুচোখের বিষ, তারাই বলে এই আন্দোলন নাসেরের সৃষ্টি। কিন্তু ইতিহাস বলে অন্য কথা। গামাল আবদেল নাসের আসারও অনেক আগে আরব-সংহতির স্বপ্ন সকলে দেখেছিল, গামাল আবদেল নাসের চলে যাওয়ার পরেও সে স্বপ্ন সকলের থাকবে।

"আমাদের সম্মুখে—সমগ্র আরব জাতির সম্মুখে আজ এক বিরাট কর্তব্য এসে উপস্থিত হয়েছে। এই সংগ্রামের রক্তক্ষত আমাদের দেহ-মন থেকে মুছে ফেলতে হবে।—নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ, কিন্তু আমি জানি এবং সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে ভাবীকালে এই বিপর্যয়-ক্লিষ্ট

দিনগুলি আমরা মুছে ফেলতে পারব—প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে আরব জাতি আবার বিপুল মহিমায় মাথা তুলে দাঁড়াবে।
এখন কাজের সময় সমুপস্থিত—শোক প্রকাশের নয়।"

রেডিও নীরব হল।

এই নিদারুণ দুঃসংবাদে আমরা দুজনেই বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। এ ঘটনা অভাবনীয় নয় শুধু, একেবারে অবিশ্বাস্য। এতদিন ধরে আমেরিকা ও ব্রিটেন যা চেয়েছিল, আজ ঠিক তাই হল। নাসের মধ্য-প্রাচ্য রাজনীতির অঙ্গন থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

ঠিক আমাদের মতই যেন গভীর বেদনায় রেডিও-ও মূক হয়ে গিয়েছিল। একটু পরেই আবার রেডিও কথা বলতে সুরু করল : আরব যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসের পদত্যাগ করেছেন। তাঁর পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট মনোনীত হয়েছেন জাকারিয়া মহিয়েদ্দিন।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার হঠাৎ একটা শব্দে চমকে উঠে দেখলাম, নাজমা দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদছে। আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত রাখলাম। আমার কোলের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে সে অঝোরে কাঁদতে লাগল। সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পেলাম না, তার মাথায় হাত বুলোতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরে নাজমা উঠে বসল। চোখ মুখ মুছে বলল—দেখ ইন্দ্র, যুদ্ধে হার হওয়াতে এত দুঃখ হয় নি। কিন্তু নাসের যদি চলে যান তবে আর আরবদের এই দুর্যোগে কোন আশা-ভরসা থাকবে না। এই একটি লোকই নিজের আন্তরিকতা দিয়ে, নিজের ব্যক্তিত্ব জাহির করে বিভিন্ন দেশের আরবকে একত্র করতে পেরেছিলেন—কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল।

জবাব দিতে ইচ্ছা করল না, চুপ করে রইলাম।

নাজমা উঠে দাঁড়াল, বলল—আমি এক্ষুনি আসছি। তোমার জন্য একটু কফিও আনি।

নাজমা চলে যাওয়ার একটু পরেই এল বেরিন আর আলি। দুজনেই আমার খোঁজে গিয়েছিল আমার হোটেলে। সেখান থেকে খবর পেয়েই এসেছে এখানে।

নাসেরের পদত্যাগের সংবাদ তারাও শুনেছে।

বেরিন-ই প্রথম কথা বলল। বলল—যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য নাসেরকে কোন আরব দোষ দেয় নি, কিন্তু তাদের সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে দেওয়ার জন্য নাসেরকে কোন আরব ভুলতে পারবে না। আমি ইহুদি, কিন্তু তার চেয়েও বড় আমি আরব। আমি ব্যক্তিগত কারণে নাসেরকে পছন্দ করতাম না, কিন্তু আরব জাতির একমাত্র রক্ষাকর্তা বলে তাঁর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা আমার ছিল। কিন্তু নাসের এ কি করলেন? একেই বলে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া।

জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যক্তিগত কি কারণে নাসেরেকে আপনি পছন্দ করতেন না?—অবশ্য যদি বলতে আপনার আপত্তি না থাকে!

বেরিন বলল—না, আপত্তি আর কি? তবে এখন আর বলে কি হবে!

আলি বলল—ব্যাপার আর কিছুই না। ১৯৬১ সনে সিরিয়ায় বিপ্লব হল, এবং নতুন বিপ্লবীদল মিশরের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করল। এই খবর পেয়ে কায়রোর একদল লোক আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেজিরা ক্লাবে আনন্দোৎসবে মত্ত হল। নাসের বুঝলেন যে মিশরের মধ্যেও তাঁর শত্রু আছে এবং এই শত্রুর দল ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেই। অবশ্য সমস্ত ধনীই যে তাঁর শত্রু, তা নয়—কিন্তু কে শত্রু আর কে মিত্র তা বোঝা কঠিন। সুতরাং নাসের এক ডিক্রিতে প্রায় ছয়শ ধনী পরিবারের সমস্ত ধন-সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিলেন। এর মধ্যে আরবও যেমন ছিল, তেমনি ছিল কপ্ট (মিশরীয় খৃষ্টান) এবং ইহুদিরা। বেরিনের পরিবারও এই দলে পড়ে।

বেরিন বলল—কিন্তু আমাদের পরিবারের কেউ কোনদিন নাসের-বিরোধী ছিল না।

কফি নিয়ে এসেছিল নাজমা। কফি দিতে দিতে বলল—বেরিন ভাই,

মিশরের সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন আহমেদ আব্বুদ আর ফাঁসোয়া তাঘের। নাসেরের বিপ্লব পরিষদের তাঁরা প্রিয়পাত্রই ছিলেন। তাঁদের ব্যবসা বাড়ানোর জন্য নাসের-সরকার উৎসাহই দিয়েছিলেন। তাঁরাও গেজিরা ক্লাবে বোধহয় আনন্দ করেন নি। কিন্তু নাসেরের খড়গ যখন পড়ল, তখন তাঁরাও বাঁচলেন না—দেশপ্রেমিক ক্যাপি-ট্যালিস্টের সার্টিফিকেটও তাঁদের রক্ষা করতে পারল না। তোমাদের পরিবারকে ছেড়ে দিতে হলে আর সকলকেও ছেড়ে দিতে হয়।

বেরিন কি যেন জবাব দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ রেডিওয় আবার সংবাদ শোনা গেল ঃ

নাসেরের পদত্যাগের সংবাদে সমস্ত আরব জগৎ বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। লেবাননের প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে পদত্যাগ না করতে অনুরোধ করেছেন। সিরিয়া ও ইরাকের প্রেসিডেণ্টও নাসেরকে অনুরূপ অনুরোধ জানিয়েছেন।

সমস্ত পৃথিবী যখন বেদনার্ত, তখন শুধু একমাত্র ইজরায়েলেই আনন্দের উল্লাস শোনা যাচ্ছে। তেল আভিভের রেডিও জানাচ্ছে যে নাসেরের পদত্যাগে আনন্দ-প্রকাশের জন্য তেল আভিভের পথে পথে দলে দলে লোক নাচতে এবং গাইতে স্নুরু করে এবং পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে থাকে। তেল আভিভে নিষ্প্রদীপ অবস্থা তুলে নেওয়া হল বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

একটু বাদেই আবার সংবাদ :

জাকারিয়া মহিয়েদ্দিন আরব যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁর বর্তমান ভাইস-প্রেসিডেণ্টের পদে অধিষ্ঠিত থাকাই স্থির করেছেন।

আরব যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পরিষদ এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়ে নাসেরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁকে এ সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করে দেখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

বেরিন বলে উঠল—মহিয়েদ্দিন সত্যকার এক নিঃস্বার্থপরতার উদাহরণ দেখিয়েছেন। আর ন্যাশানাল এ্যাসেম্বলি আরব জাতির মনের কথা বলেছে।

আলি বলল—একটু যেন আলো দেখা যাচ্ছে, সব কিছুই এখনো হারিয়ে যায় নি।

নাজমা আমার দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা বল না—ইন্‌কলাব জিন্দাবাদ? আমারও এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওই কথা বলে চীৎকার করতে ইচ্ছা করছে।

আবার রেডিও ফ্ল্যাশ:

নাসেরের দক্ষিণ হস্ত, ভাইস প্রেসিডেণ্ট এবং আরব যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সহকারী সর্বাধিনায়ক মার্শাল আবদেল হাকিম আমের পদত্যাগ করেছেন।

আরব যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধমন্ত্রী সামশেদ দিল বাদরান-ও পদত্যাগ করেছেন। আর যাঁরা পদত্যাগ করেছেন, তাঁরা হলেন নৌবহরের প্রধান এ্যাডমিরাল ইজ্জৎ এবং বিমানবাহিনীর প্রধান জেনারেল মামুদ।

একে একে নিভিছে দেউটি।

ঘরে উপস্থিত আর তিনজনের দিকে তাকালাম। প্রত্যেকের মুখ যেন রক্তহীন হয়ে গেছে। নাসের আবার ফিরে আসবেন—আর একটু আগে এই বিশ্বাস তাদের মনে ফিরে এসেছিল, কিন্তু এখন যেন সে বিশ্বাস শিথিল হয়ে পড়েছে। আর তারা ভরসা রাখতে পারছে না।

কিছুক্ষণ পরে নাজমা বলল—কিছু ভাল লাগছে না। আর একবার কফি খাবে?

আমরা কোন উত্তর দেওয়ার আগেই আবার রেডিওর সংবাদ:

কায়রোর সংবাদ বলছি। প্রেসিডেণ্ট নাসেরের পদত্যাগ করার সঙ্কল্প ঘোষণার সংবাদ প্রচারিত হওয়ামাত্রই কায়রোর পথে পথে জনতা

'নাসের, নাসের', 'আমরা নাসেরকে চাই', 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত হোক' ধ্বনি দিয়ে ছুটতে থাকে। শহর ও শহরতলির সমস্ত অঞ্চল থেকে অসংখ্য মিছিল বার হয়। সমস্ত মিছিল নাসেরের বাস-ভবন ওলিও-জোনিসের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সকলের মুখে একই ধ্বনি : 'আমরা নাসেরকে চাই।'

নাজমা বলল—এ আর এক বিপ্লব।

আলি আমার দিকে তাকিয়ে বলল—ইন্কলাব জিন্দাবাদ!

আমি হেসে যোগ দিলাম—বন্দে মাতরম্!

নাজমা জিজ্ঞাসা করল—তার মানে কি?

উত্তর দেওয়ার আগেই আবার রেডিওর সংবাদ :

কায়রোর সংবাদ বলছি। প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসের দেশ-বাসীর সনির্বন্ধ অনুরোধে আগামী কাল পর্যন্ত পদত্যাগ স্থগিত রাখতে স্বীকৃত হয়েছেন।

বেরিন আনন্দে চীৎকার করে উঠল—মিসেস্ শেরমানি, এখন আর এখানে কফি নয়। চলুন, আজ ভেনাস-এ আমি আপনাদের খাওয়াব।

সকালেই টেলিফোন করে নাজমা আমাকে বলেছিল আবু জাকারিয়ার কফি হাউসে তার জন্য অপেক্ষা করতে। জরুরী কাজ আছে।

কফি হাউসে তখন ভীষণ ভিড়। বসার জায়গা পাওয়াই মুস্কিল। এক টেবিলে ইংরেজি কথার ছড়াছড়ি দেখে একটা চেয়ার টেনে সেখানেই বসলাম। এ কফি হাউসের রীতিনীতি জানি, টেবিলে বসলেই ভাব—কারও আপত্তি নেই, বিরক্তি নেই। স্রেফ আড্ডা মারার জন্যই এই কফি হাউস।

গল্প হচ্ছিল চোরাই চালান নিয়ে। ফরাসী এক ভদ্রলোক ইণ্টারপোলে কাজ করেন, তাঁকে নিয়েই এই আড্ডা। এই দলের মধ্যে দু'তিন জন ভারতীয়ও আছে।

ইণ্টারন্যাশানাল ক্রিমিন্যাল পোলিস্ অর্গ্যানাইজেশনের সংক্ষিপ্তরূপই হয়েছে ইণ্টারপোল। প্রায় সত্তরটি রাষ্ট্রের পুলিশবাহিনী নিয়ে এই ইণ্টারপোল গঠিত। প্রধান কার্যালয় হয়েছে প্যারিসে, ঠিকানা—৩৭ বি, রু পল ভ্যালেরি। সেক্রেটারি জেনারেল হয়েছেন ফ্রান্সের বিখ্যাত সুরেত ন্যাশানেলের মার্সেল সিকো।

রতীশ তখন বলছিল ডেভিড ওয়ালটনের গল্প। বোম্বে এয়ারপোর্টে সে ধরা পড়ে। রতীশ ভাটনগরকে আমি চিনি। লক্ষ্ণৌর ছেলে। বেইরুতে যখন দেখা হয়েছিল তখন প্রশ্ন করাতে সে উত্তর দিয়েছিল—এই এমনি এসেছি দাদা। জানেন তো কিছুই হলো না আমার।

রতীশ যে ইণ্টারপোলে জড়িত এই প্রথম জানলাম।

ওয়ালটনের মত এমন বুদ্ধিমান ঠক, জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ আর দেখা যায় নি। অনেক দেশ থেকেই অভিযোগ আসতে লাগল যে বিদেশী এক ভদ্রলোক তাদের স্ঁচ থেকে সুরু করে এরোপ্লেন পর্যন্ত সব জিনিষ বিক্রি করার চুক্তি করে অগ্রিম টাকা নিয়ে চলে গেছে, তারপর অনুসন্ধান করে সেই সব কোম্পানিরও পাত্তা পাওয়া যায় নি—বিদেশী বিক্রেতার তো কথাই নেই। খবর গেল ইণ্টারপোলে। ইণ্টারপোল করবে কি ? কেউ বলে লোকটি ইংরেজ, কেউ বলে আমেরিকান, কেউ বা ফরাসী, ল্যাটিন অ্যামেরিকান, জার্মান—

এবারে সে নাম নিল ডেভিড ওয়ালটন। খাস আমেরিকান, নিউ ইয়র্কে বাড়ি। পাসপোর্ট পাকা। সঙ্গে আরো গোটা কয়েক বিভিন্ন নামের বিভিন্ন দেশের পাসপোর্ট—সবই জাল, কিন্তু ধরে কে ? নিউ ইয়র্ক থেকে লণ্ডন, লণ্ডন থেকে প্যারিস, প্যারিস থেকে ভিয়েসবাদেন, সেখান থেকে তেল আভিভ এবং শেষ পর্যন্ত বেইরুত। কোথাও বা সে আমেরিকান ওয়ালটন, কোথাও বা বেলজিয়ান দুবোয়া, কোথাও আর্জেন্টিয়ান রোজাস, কোথাও বা ফরাসী লামু। ইণ্টারপোল তার জাল পৃথিবীর চারধারে ছড়িয়ে দিল, কিন্তু তাকে ধরা গেল না। হঠাৎ ইণ্টারপোলে একজন পুরানো ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা

ফাইল দেখে থমকে গেলেন। ভেজি নামে এক হাঙ্গারিয়ান জোচ্চোর অনেকদিন চুপ করে আছে। তার কোন সাড়াশব্দ নেই কেন? সে তো চুপ করে বসে থাকবার পাত্র নয়। তবে কি এই ওয়াল্টন-ডুবোয়া-রোজাস-লামু আর ভেজি এক? সঙ্গে সঙ্গে ভেজির ছবি সমস্ত দেশের ইন্টারপোলের শাখায় পাঠিয়ে দেওয়া হল—এ ধরনের লোককে দেখলেই গ্রেপ্তার কর। এই ছবি যেদিন বেইরুতে এল সেইদিনই ওয়াল্টন রোজাস নাম নিয়ে বেইরুত থেকে পাড়ি দিয়েছে বোম্বে। বেইরুত থেকে টেলিগ্রাম গেল—রোজাসকে গ্রেপ্তার কর।

রোজাস বোম্বেতে নামামাত্র পুলিশ এসে তাকে ধরল। আশ্চর্য হয়ে গেল সে—কি করে তাকে চিনতে পারল এরা?

নাজমাকে দরজার সামনে দেখেই উঠে পড়লাম।

নাজমা বলল—রাস্তায় যা ভিড়, যা হৈ চৈ—ঠিক সময়ে এসে উঠতে পারলাম না। নাসেরের জন্য যদি এখানেই এত গোলমাল হয়, মিশরে, বিশেষ করে কায়রোতে এখন না জানি কি হচ্ছে!

জিজ্ঞাসা করলাম—সঠিক খবর কিছু পেলে?

নাজমা উত্তর দিল—না, তবে সমস্ত আরব দেশ যেভাবে নাসেরের পদত্যাগের বিরুদ্ধে মিছিল বার করছে, যেভাবে তাঁকে পদত্যাগ করতে নিষেধ করছে—তাতে সকলের মতের বিরুদ্ধে তাঁর পক্ষে আর যাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। ওকথা যাক্, আজ তোমার কফি হাউসে যা ভিড় দেখছি তাতে নিরিবিলি বসে গল্প করা যাবে বলে তো মনে হচ্ছে না।

বললাম—তবে অন্য কোথাও চল।

নাজমা উত্তর দিল—না—না। তা হলে তো তোমাকে অন্য কোথাও অপেক্ষা করতে বলতাম, এত দূরে আসতে বলতাম না। আমার এখানেই দরকার। চল, বেলোক্লিফ ওরফে বেলসন ওরফে তোমার আবু জাকারিয়ার সঙ্গে কথা বলে আসি।

শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—ওর সঙ্গে আবার কি দরকার? যদি আমাদের চিনতে পারে?

তাতে ভয় পাবার কি আছে?—উত্তর দিল নাজমা।—চিনতে না পারলে আজ পরিচয় দেব। সেই জন্যই এখানে আসা।

আমি বললাম—তোমার সন্দেহ যদি সত্য হয়, মানে ও-ই যদি বেলোক্লিফ হয়—তবে—তবে—বুঝতেই তো পারছ কি সাঙ্ঘাতিক লোক তবে! ওকে ঘাঁটাবার আর কি দরকার?

নাজমা বলল—ইন্দ্র, আমার আর এ জীবন ভাল লাগছে না। বেলোক্লিফের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করে আমি আমার আর তোমার জীবনের সবচেয়ে ভাল কুড়ি একুশ বছর নষ্ট করেছি। এবার আমি ঘরে ফিরে যেতে চাই, ঘর বাঁধতে চাই। সেই কথাই আজ বেলো-ক্লিফকে বলে যাব। চল—

আবু জাকারিয়া আমাদের দুজনকে দেখে এক মুহূর্তের জন্য যেন কেমন হয়ে গেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সেই ভাবটা সামলিয়ে নিয়ে ছোট্ট একটু হেসে বলে উঠলেন—আসুন মিসেস্ শেরমানি, আসুন মিষ্টার সেন। অনেকদিন বাদে আবার দেখা হল।

নাজমা বলল—আজ খুব ভিড় দেখছি।

আবু বললেন—কয়েকদিন ধরেই খুব ভিড় চলছে। যুদ্ধের কয়েকদিন তো দাঁড়াবার পর্যন্ত জায়গা পাওয়া যেত না। মনে হচ্ছে, এই রকমই চলবে আর কিছু দিন।

বললাম- তার মানেই আপনার ব্যবসা ভাল চলছে।

একটু হেসে আবু বললেন—আর ব্যবসা! এবার তুলে দিচ্ছি।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন?

কেন আবার?—এমনিই, ভাল লাগছে না—বললেন আবু।

নাজমা হঠাৎ বলল—ডিক, আমাদের চিনতে পারছ?

ভয়ঙ্করভাবে চমকে উঠলেন আবু জাকারিয়া। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন নাজমার মুখের দিকে, তারপর তাকালেন আমার দিকে।

মুখের ওপর থেকে সমস্ত রক্ত কে যেন এক নিমেষে ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নিয়ে গেছে।

পরক্ষণেই সেই ভাব সামলিয়ে নিয়ে আবু বললেন –কি বলছেন আপনি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

নাজমা হেসে উঠল, বলল—সবই বুঝতে পারছ ডিক। আর অভিনয় কেন? আমিও তোমাকে চিনতে পেরেছি, তোমারও আমাকে চেনা উচিত। বল, চিনতে পারছ কি?

আস্তে আস্তে মুখ নীচু করে আবু বললেন—সেদিন সন্দেহ হয়েছিল, আজ স্পষ্ট চিনতে পারলাম। অনেকের মুখেই আমি মিসেস্ শেরমানির কথা অনেক দিন ধরেই শুনে আসছি, কিন্তু মিসেস্ শেরমানি যে নর্মা—সে কথা আমি বুঝতে পারি নি। আমার ধারণা ছিল, তুমি—তুমি আর নেই-- মানে, জর্ডনে—কিন্তু কি ব্যাপার নর্মা, তুমি মিসেস্ শেরমানি হলে কবে থেকে? আমার ধারণা ছিল সেনের সঙ্গে—

নাজমা বলল—বেলসন, আমি নর্মা নই। আমি নাজমা। যে সরিফুদ্দীনকে তুমি প্যালেষ্টাইনে হত্যা করেছিলে—আমি তার মেয়ে নাজমা। নর্মা নাম নিয়ে আমি তোমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এসেছিলাম। কিন্তু সে কাহিনী বাদ দাও। সেনের সঙ্গে এই একুশ বছর পরে আবার হঠাৎ না দেখা হলে এবার তোমার আর আমার মধ্যে একটা শেষ বোঝাপড়া হয়ে যেত, কিন্তু সেনকে ফিরে পেয়ে আমার এত আনন্দ হয়েছে যে আর আমি আগেকার শত্রুতা, ঈর্ষ্যা, হিংসা মনে রাখতে চাই না। তোমার সঙ্গে সব বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্যই আজ আমি এসেছি। তুমি আমাদের দুজনের চেয়েই বড়, তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা দুজনে সুখী হতে পারি।

আবু জাকারিয়া আমাদের দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। করুণ শূন্য দৃষ্টি। ঠোঁট দুটো একবার বেশ কেঁপে উঠল। চোখের কোনে জল জমে আসতে লাগল।

আমাদের দুজনের মাথায় হাত ছুঁয়ে বললেন—তোমাদের এখনো বিয়ে হয় নি? সেন কি এখনো তোমার দলে? ওর কথা তো কারও কাছে এতদিন শুনি নি।

নাজমা হেসে বলল—সেন কবে আমার দলে ছিল? ও তখনো সিনেমা করত, আজও সিনেমা করে। এখানে এসেছিল সিনেমার জন্য, দেখা হয়ে গেল। আমাকে চিনতেও পারল না, তোমাকেও চিনতে পারে নি। আমিই প্রথম ওকে চিনে পরিচয় দিলাম। সেন সত্যিই আমাকে ভালবাসে—এখনও পর্যন্ত ও বিয়েই করে নি।

সেনের কোন অপরাধ নেই—বললেন আবু,—আমিও তোমাকে প্রথমে চিনতে পারি নি। কুড়ি একুশ বছরে আমরা দুজনেই বদলে গিয়েছি। কিছুটা বুড়োও হয়েছি। তোমারও বদলানো উচিত ছিল। কিন্তু তোমার চেহারা আরো সুন্দর হয়েছে। তোমাকে দেখলে কেউ তোমার সত্যকার বয়স বিশ্বাস করবে না। আরো দশ বছরের ছোট বলে মনে হয়। তোমরা কি এখানেই থাকবে, না সেনের দেশে চলে যাবে?

সেনের সঙ্গেই চলে যাব—বলল নাজমা।—মিসেস্ শেরমানির মিথ্যে বোঝা বয়ে বেড়াতে আর ইচ্ছা করছে না। এবার সত্যকার মিসেস্ সেন হয়ে বসব।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কিন্তু আপনি হঠাৎ ব্যবসা তুলে দিচ্ছেন কেন? দেশে ফিরে যাবেন?

দেশ?—বললেন আবু।—না, দেশে ফেরা এখন হবে না। আমার একটা কাজ বাকী আছে। তারপর ভেবে দেখব—কোথায় যাই!

নাজমা বলল—বেলসন, যেদিন শুনলাম তুমি ইয়েলিণ্ডাকে হত্যা করেছ—

নর্মা!—এক আর্তনাদ বেরিয়ে এল আবুর কণ্ঠ থেকে। বললেন—নর্মা তুমি ভুল শুনেছ—

আমি ভুল শুনি নি, ডিক—বলল নাজমা।—তুমি ওর হাতে প্ল্যাস্টিক বোমা ভরা প্যাকেট তুলে দিয়েছিলে। তোমার ওপর লক্ষ্য রাখার জন্য

আমার লোক ছিল—

আবু বললেন—তোমার যে লোক ছিল, অর্থাৎ আমার এই কাফ হাউসের বয় আসরাফ—সে ছিল দুমুখো সাপ। আমার ওপর যেমন নজর রেখেছিল, ঠিক তেমনি তোমার ওপর তার নজর ছিল। অর্থাৎ আসলে ছিল তোমার বিরুদ্ধ দলের স্পাই। সেই আসরাফ হত্যা করেছে লিণ্ডাকে। তুমি বুঝতে পারবে না, লিণ্ডা আমার কে ছিল। লিণ্ডাকে আমি আমার মেয়ের মত ভালবেসে এখানে আশ্রয় দিয়েছিলাম। আমি জানতে পেরেছিলাম, ওর আসল পরিচয়। তোমরা বোধহয় সে পরিচয় জান না। সে যে ভেতরের সব খবর গোপনে তোমাদের জানিয়ে দিত সে খবর আমি রাখতাম, কিন্তু আমি ওকে কিছু বলি নি। কিন্তু তোমাকে যে জানাত সেটা আমি জানতাম না। জানতে পারলে, মানে আমাদের দল জানতে পারলে তুমি এতদিন বেঁচে থাকতে না।

নাজমা বলল—সায়রা আমাকে কোন দিন কোন খবর দেয় নি। আমার স্কুল ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ওর সঙ্গে ক্বচিৎ কখনো দেখা হয়েছে।

আবু বললেন—ভালই করেছে যে তোমার সঙ্গে সে দেখা করত না। আমার ওপর আসরাফ রেখেছে কড়া পাহারা। আমার দল এখন আমাকে সন্দেহ করছে, যে কোনদিন আমাকে হত্যা করতে পারে, কিন্তু তার আগে লিণ্ডার হত্যার প্রতিশোধ আমি নেব। তোমাদের আশীর্বাদ করি, তোমরা সুখী হও—আর তোমরা প্রথম প্লেনেই পালাও এদেশ থেকে। এখানে থাকলে তোমাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। এখন যাও এখান থেকে—

বেরিয়ে এলাম কফি হাউস থেকে। নাজমার কিছু মার্কেটিং করতে হবে, আমারও টুকিটাকি কিছু কেনা দরকার। দুজনে রাস্তা ধরে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছি। মুখে কথা নেই। রাস্তার ওপরে ছোটখাটো দোকান। দু-একটা দোকানে রেডিও বাজছে, অর্থাৎ মিলিটারি ব্যাণ্ড।

হঠাৎ সেই সামরিক সঙ্গীত বন্ধ হয়ে গেল। ঘোষকের কণ্ঠ শোনা গেল ঃ রেডিও কায়রো !

নাজমা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল—এবার খবর পড়বে। দাঁড়াও, একটু শুনি।

রেডিওয় শোনা গেল ঃ কায়রো থেকে বলছি। আরব জগতের বরেণ্য নায়ক গামাল আবদেল নাসের গত রাত্রে পদত্যাগের যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন, তাতে তিনি অবিচল রয়েছেন কী না তা জানার জন্য সমস্ত মিশর অধীর উৎকণ্ঠায় প্রহর গুনছিল। কায়রোর রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় ব্যানার নিয়ে অগণ্য জনতা নাসেরকে পদত্যাগ না করতে অনুরোধ জানান। প্রতি বাড়ির সম্মুখভাগে, দেয়ালে হাজার হাজার পোস্টারে সেই একই কথা লেখা। রাজপথে জনস্রোতে যান-বাহন চলাচল প্রায় বন্ধ। বহুলোক অনেকদূর পথ হেঁটে পর্যন্ত এসে এই ভাবাবেগে উদ্বেল জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে নাসেরকে পদত্যাগ না করার জন্য আবেদন জানাতে থাকেন।

আরব ঘোষকের কণ্ঠ নীরব হল। কিছুক্ষণ পরে আবার ঘোষণা এখন জাতীয় পরিষদ থেকে খবর শোনানো হবে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট নাসেরের কণ্ঠ শোনা যায় ঃ আমার পদত্যাগের বিরুদ্ধে জনগণের দৃঢ় সঙ্কল্প দেখে এই মুহূর্তে আমার মনের ভাব যে কি হয়েছে কেউ তা অনুমান করতে পারবেন না। আমি এত অভিভূত যে আমি আমার মনের ভাব প্রকাশ করার কথা খুঁজে পাচ্ছি না।

তার পরেই জাতীয় পরিষদের সভাপতি ঘোষণা করলেন ঃ প্রেসিডেণ্ট নাসের জনগণের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করে প্রেসিডেণ্ট পদে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

নাজমা আমার হাত চেপে ধরল। বলল—ইন্দ্র, কাল সারা রাত আমি এই প্রার্থনা করেছি। কাল এই শপথ নিয়েছিলাম যে মনের সমস্ত দ্বেষ, হিংসা আমি ত্যাগ করব, তার বদলে চেয়েছিলাম শুধু নাসের থেকে যান। নয়তো বেলোক্লিফ বেঁচে থাকা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে

যাওয়া আমার সম্ভব হত না।

হঠাৎ নাজমা খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল—কি অসম্ভব ছেলে-মানুষ ছিলে তুমি! জেরুজালেমের কথা মনে পড়লে তোমাকে এত ভাল লাগে! যখন তোমাকে বললাম যে বেলোক্লিফ বেঁচে থাকা পর্যন্ত তোমাকে বিয়ে করতে পারব না, ওকে আমার খুঁজে বার করতেই হবে—তখন তুমি একেবারে হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে সুরু করে দিয়েছিলে।

হ্যাঁ, কাঁদতে সুরু করে দিয়েছিলাম!—বলে উঠলাম আমি।—তুমিও তো কাঁদছিলে। কিন্তু এখন কি হবে?

বলল—তোমাদের দেশে যাব! সেখানেই বিয়ে হবে।

আমি বললাম—আমাদের দেশী মতে তো!

এই বয়সে!—নাজমা প্রায় আঁৎকে উঠল, বলল—তোমাদের বিয়ে আমি হিন্দি সিনেমায় দেখেছি। ওইভাবে সেজেগুজে—এই বয়সে—না বাব্বা!—কিন্তু বড় সুন্দর, খুব রোম্যান্টিক। খুব লোভ হয়—

সন্ধ্যার সময় আলি আমার হোটেলে এল। বলল—জান, সেন! আবু সাহেবকে পাওয়া যাচ্ছে না। কফি হাউস বন্ধ। কি হয়েছে কেউ কিছু বলতে পারছে না।

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আবু যে চলে যাবেন, তা আজ সকালেই আমাদের জানিয়েছেন। কিন্তু তা যে এত তাড়াতাড়ি-কিছুতেই ধারণা করতে পারি নি।

বললাম—আজ সকালেই আমরা ওখানে গিয়েছিলাম। কথাবার্তাও হল। তখন বলছিলেন যে দেশে চলে যাবেন। বোধহয় চলে গেছেন।—আলিকে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলতে পারলাম না। আবু জাকারিয়ার প্রকৃত স্বরূপ আমি আর নাজমা জানি, এখানকার আর কেউ জানে না। সত্য কথা বললে প্রথমত কেউ বিশ্বাস করবে না, দ্বিতীয়ত অতীতের কথা, বিশেষ করে নাজমার কথাও তবে খুলে বলতে হয়—যা

আমি চাই না। তার চেয়ে বরং আবুর সম্বন্ধে এদের যে উঁচু ধারণা আছে—তাই থাকুক। আজকের কথাবার্তায় মনে হল, বেলসন অনেক বদলেও গিয়েছে!

আলি বসে বসে মাথা নাড়তে লাগল। বলল—এত সহজ ব্যাপার নয়, সেন। জটিল কোন ব্যাপার আছে। সকলে বলাবলি করছে, কোন গুপ্ত সমিতি ওঁকে গুম্ করে রেখেছে।

হতেও পারে—উত্তর দিলাম।

হওয়া বিচিত্র নয়!

সত্য সত্যই আবু জাকারিয়ার আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না কফি হাউস বন্ধ।

১৭

এবারে ইজরায়েলের মুখোস খুলে গেল।

এতদিন ইজরায়েলি নেতারা এবং তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ওয়াশিংটন ও লণ্ডন বলে বেড়াচ্ছিল যে ইজরায়েল শুধু আত্মরক্ষার জন্যই যুদ্ধ করেছে, অন্য দেশ অধিকার করা বা যুদ্ধের পরেও তা দখলে রাখার উদ্দেশ্য তাদের কোনদিন ছিল না বা এখনো নেই। যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণার পূর্ব পর্যন্তও তাঁদের মুখে এই একই কথা ছিল। কিন্তু আজ ইজরায়েলের আয়তন পূর্বের চেয়ে চার গুণেরও বেশি হওয়ার পর এখন বিপরীত কথা শোনা যাচ্ছে।

তেল আভিভ পার্লামেণ্টে প্রধান মন্ত্রী লেভি এশকোল ঘোষণা করলেন: বিশ্বের সকল জাতিকে আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছি যে এক সপ্তাহ আগের পুরোনো পরিস্থিতিতে আর আমরা ফিরে যাব না। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে হুমকি ও অ-নিরাপত্তার মধ্যে থাকার দিন আমাদের শেষ হয়েছে।

ইজরায়েলের প্রকৃত মনোভাব আরো স্পষ্ট করে জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী মোশে দায়ান। এশকোলের কাছ থেকে প্রধান মন্ত্রিত্বের পদ ছিনিয়ে নিতে চান তিনি, সুতরাং গলা বড়ও তাঁর। টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে দায়ান জোর গলায় জানালেন: গাজা ভূখণ্ড ও সিনাই প্রদেশ মিশরকে কিংবা জর্ডন নদীর পশ্চিমাঞ্চল জর্ডনকে আমরা কোনমতেই ফিরিয়ে দেব না। জেরুজালেমও আমাদের কর্তৃত্বাধীনে থাকবে। আমাদের জয়ের পুরস্কার যাতে না হারাতে হয় সেজন্য আমরা সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টাই করব।

তিনি আরও বলেন: দখলীকৃত অঞ্চলগুলি নিয়ে ইজরায়েল কোন সামরিক সমস্যার সম্মুখীন হবে না, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাই প্রধান হয়ে দেখা দেবে। প্রসঙ্গত জর্ডন নদীর পশ্চিমাঞ্চলের পনের

লক্ষেরও বেশি আরবদের সমস্যা উল্লেখ করা যায়। এদের ইজরায়েলে বাস করতে দেওয়া যায় না, কারণ তবে ইজরায়েল হয়ে যাবে ইহুদি-আরব অধ্যুষিত রাষ্ট্র এবং তা আমরা কোনদিনই চাই নি, আজও চাই না।

কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে সূচাগ্র পরিমাণ ভূমি শত্রুর হাতে ছাড়া হবে না, সার্বভৌমত্ব কোন মতে ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া হবে না এবং ইজরায়েলকে যুদ্ধজয়ের ফলভোগ করতে দেওয়া হবে না।

দুই পক্ষেরই অনমনীয় মনোভাব। রাষ্ট্রসঙ্ঘ শুধু বক্তৃতা দেওয়ার হল-ঘর। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ বানচাল করে দিল আমেরিকা, ব্রিটেন এবং তাদের তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলি।

যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো এক প্রস্তাব করলেন, ইজরায়েল তা নাকচ করল। সুতরাং পরিস্থিতি সেই একই অবস্থায় রয়ে গেল।

আমেরিকার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সাহায্যে ইজরায়েল জয়ী হল, অথচ রাশিয়া আরবদের মৌখিক সাহায্য ছাড়া আর কিছুই করল না দেখে রাশিয়া সম্বন্ধে আরবদের মনে এসেছে সন্দেহ। রাশিয়ার প্রভাব আরব-মহলে ক্ষুণ্ণ হতে বসেছে।

অত্যন্ত সঙ্কটজনক পরিস্থিতি। মধ্য-প্রাচ্যে, বিশেষ করে আরব-মহলে, রাশিয়া তার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হতে কোনমতেই দিতে পারে না। ব্রিটিশ, ফরাসী, আমেরিকান বিরোধিতার পাঁচিলে অনেকদিন ধরে আঘাত করে মাত্র কয়েক বছর হল তারা আরব-ভূমিতে পা ফেলেছে, এখনও শক্ত মাটির আশ্রয় পায় নি। একটু ভুল পদক্ষেপে চোরাবালিতে তারা তলিয়ে যাবে।

সুতরাং সোভিয়েট রাশিয়ার খাস প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগরনি ছুটে এলেন কায়রোয়। মাঝ পথে তিনি প্রেসিডেন্ট টিটোর সঙ্গে আলোচনা করে এসেছেন। ভুল বোঝাবুঝির পালার মীমাংসা সম্ভব

হবে না শুধু রাষ্ট্রদূত দিয়ে। আরব রাষ্ট্রগুলির পাশে রাশিয়া দাঁড়িয়ে যে তাদের দাবী আদায় করতে সমস্ত সাহায্যে প্রস্তুত—সেই কথাই জানাতে এলেন পদগরনি।

ঠিক তার আগেই এসে উপস্থিত হয়েছেন রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ মার্শাল জাকারফ। সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পর মিশরের এখন কি পরিমাণ সমর-সরঞ্জাম প্রয়োজন চাক্ষুস তা যাচাই করে দেখাই তাঁর এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক প্রতিনিধিদলের মিশরে আগমনের উদ্দেশ্য। মিশরের হৃদয় জয় করার জন্য এবার রাশিয়া মিশরকে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিতে স্বীকৃত। এই অস্ত্র দিয়ে মিশর যে শুধু অধিকৃত এলাকা থেকে ইজরায়েলকে হটিয়ে দিতেই সক্ষম হবে —তা নয়, ভবিষ্যতে ইজরায়েলি আক্রমণ প্রতিহত করতেও পারবে।

রাশিয়ার উদ্বেগের এখানেই শেষ নয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘেও আরব-ভূমির দাবী জোরদার করার জন্য নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হলেন সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে ৯৯-০ ভোটে একটি প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল : ইজরায়েলকে বলা হল যে পুরাতন জেরুজালেম নগরীর দখল ছাড়তে হবে।

ইজরায়েল বলল—কখনো না।

তেল আভিভ রেডিও বলল—একটা প্রস্তাবই পাশ হয়েছে তো! তাতে কি? প্রস্তাব তো আর ট্যাঙ্ক নয় যে তার কামান দিয়ে তোমাকে লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়বে!

এখন চেষ্টা চলল কোসিগিন আর জনসন—এই দুই 'বিগ টু' বা দুই প্রধান-এর সাক্ষাতের চেষ্টা। এঁরা দুজনেই ইচ্ছা করলে এই সমস্যার মীমাংসা করতে পারেন। কিন্তু সেখানেও বাধা। কূটনৈতিক শিষ্টাচার প্রধান প্রতিবন্ধক। জনসন হচ্ছেন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট। তিনি নিউ ইয়র্কে গিয়ে কোসিগিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সম্মত নন। আর কোসিগিন নিউ ইয়র্কে এসেছেন পশ্চিম এশিয়া সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের

সাধারণ পরিষদে বিতর্কে যোগ দিতে। ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসে গিয়ে জনসনের সঙ্গে দেখা করলে আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতা করার বদনাম দিতে শত্রুপক্ষ কার্পণ্য করবে না, সুতরাং তিনিও ওয়াশিংটনে যেতে চান না।

অবশেষে দুজনেরই আগ্রহে এই মিলনের একটা পথ খুঁজে পাওয়া গেল। ফিলাডেলফিয়া থেকে পনের মাইল দূরে কলেজ-নগরী গ্লাসবরোতে দুজনে আলোচনা করতে সম্মত হলেন।

দুদিন ধরে চলল আলোচনা। আমেরিকার পক্ষে যোগ দিলেন প্রেসিডেন্ট জনসন, রাষ্ট্র সচিব ডীন রাস্ক, পররাষ্ট্র সচিব রবার্ট ম্যাকনামারা, প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী ওয়াল্ট রোস্টল, মধ্য-প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ ম্যাকজর্জ বাণ্ডি ও মস্কোর আমেরিকান দূত লিউলিন টমসন এবং রাশিয়ার পক্ষে প্রধান মন্ত্রী কোসিগিন, পররাষ্ট্র-মন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো, যুক্তরাষ্ট্রে রুশ-দূত ভোররিনিস এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে স্থায়ী রুশ-প্রতিনিধি ফেদেরেঙ্কো।

আলাপ-আলোচনা সবই হল; কিন্তু কোন ফল হল না। কোসিগিন ফিরে এলেন।

এদিকে কায়রোয় আরব শীর্ষ-বৈঠক বসল। এলেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট নুরেদ্দিন আতাসি, ইরাকের প্রেসিডেন্ট আবদুল রহমান আরিফ, আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারি বুমেদিয়েন, সুদানের প্রেসিডেন্ট ইসমাইল এল আমারি এবং জর্ডনের রাজা হুসেন। স্থির হল সমস্ত আরব রাষ্ট্র-প্রধান এর 'পর সুদানের রাজধানী খার্তুমে মিলিত হয়ে ভবিষ্যৎ পন্থা স্থির করবেন।

নাজমার কথামত বোম্বেতে আমার অফিসে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আমার এখন ফিরতে দেরিই হবে। ব্যবসা-সংক্রান্ত রিপোর্ট সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম।

এর পর আর চাকরী থাকবে না—জানিয়েছিলাম নাজমাকে। নাজমা

উত্তর দিয়েছিল—এখন তোমার চাকরি না করলেও চলবে। আমার কিছু টাকা আছে, তাইতেই চলে যাবে। এতদূর যখন এসেছ, তখন চল ইউরোপটা একবার ঘুরে দেখে আসি। তারপর তোমার দেশে গিয়ে কনে-বৌ-এর মত ঘোমটা টেনে বসে থাকব। আর তোমার যদি খুব ইচ্ছা করে তো তুমি হিন্দি বা বাঙলা ছবি তুলতে পার—টাকার জোগাড় করে দেওয়া যাবে।

এ রকম আরামের চাকরি আর কোথায় পাব! সুতরাং বোম্বের চাকরি খতম করে দিলাম।

আলি ফিরে গেছে কায়রোয়। বেরিন বেরিয়েছে ট্যুর—ইরাক, সিরিয়া। আমি পড়ে গিয়েছি একা। নাজমা ব্যস্ত তার এখানকার সব কিছু বন্দোবস্ত করে ফেলতে। তার সঙ্গে দেখা হয় সন্ধ্যাবেলায়। সব কিছু গোছগাছ শেষ হয়ে গেলে পর আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়ব ভারতবর্ষের পথে—ভায়া ইউরোপ।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় নাজমা বলল—চল সমুদ্রের ধারে। এই সময়টা বড় চমৎকার লাগে।

এর আগেও গিয়েছি রৌস-সমুদ্রতটে। বেইরুতের সবচেয়ে চমৎকার জায়গা, আর সেইজন্যেই এখানে এত ভিড়। লোক গিস্‌গিস্‌ করে সব সময়ে। কিন্তু সেদিন একেবারে ভিড় নেই—বলতে গেলে একেবারে ফাঁকা। যুদ্ধের পর থেকেই এই অবস্থা—কেউ আর বড় এখানে আসে না।

এখানে সেখানে দু-একজন লোক মাত্র বসে আছে।

একটু দূরে রেষ্টুরেণ্টটা ছাড়িয়ে একটা বেশ উঁচু টিলা—যেন সমুদ্রের ভেতর থেকে মৈনাক মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সেইদিকটা একেবারে নিরিবিলি, একটু অন্ধকার।

নাজমা বলল—চল, ওই টিলার ওপরে উঠে বসি। ওর ওপর থেকে সমুদ্রটা অপূর্ব সুন্দর দেখায়।

দুজনে গিয়ে সেই টিলার ওপরে উঠে বসলাম।

সমুদ্রের ঢেউ-এর সঙ্গে ছুটে আসছে ঠাণ্ডা বাতাস। নাজমার ওড়না সেই বাতাসে পাখা মেলে দিয়ে যেন উড়ে যেতে চাইছে। সমুদ্রের ঢেউ পাথরের ওপর আছড়ে পড়ছে, ঝিরঝিরে বৃষ্টির মত তার দু-এক ফোঁটা জল এসে এসে পড়ছে চোখে, মুখে, গায়ে। অনেকদিন আগে দেখা একটা হিন্দি ছবির গানের কথা মনে পড়ে গেল। সেই আবছা অন্ধকারে গুনগুন করে সেই গানটি ধরলাম—'হাওমে উড়তা যায়ে মেরা লাল দোপাট্টা মলমল ও জী—'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল নাজমা। গান শেষ হলে পর বলল—তুমি এখনো বেশ গান গাইতে পার, ইন্দ্র!

বললাম—জান, নাজমা! আজ আমার শুধু মনে পড়ছে সেই ডেড্ সী-র কথা। কি চমৎকার লেগেছিল সে রাতটা! আবার তোমাকে নিয়ে ওখানে যেতে ইচ্ছা করে।

হঠাৎ কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গেই লম্বা কালো কোট-পরা একটি লোক এসে উপস্থিত।

নাজমা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—আসরাফ! তুমি এখানে?

নাজমার গলা শুনেই বুঝতে পারলাম যে সে খুব ভয় পেয়েছে।

সেই লোকটা হাসল। বলল—আর কোথায় আপনার দেখা পাব, মিসেস্ শেরমানি—কিংবা নর্মা টার্নার! আপনার দরজা এখন আমার জন্য বন্ধ। পাহারা বসিয়েছেন আপনি।

নাজমা উঠে দাঁড়াল। সেই সঙ্গে আমিও।

নাজমা বলে উঠল—তুমি তো ফোনে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারতে! না হয় তুমি কাল আমার বাড়িতে এস।

এবার আমি লোকটাকে স্পষ্ট চিনতে পারলাম। আবু জাকারিয়ার কফি হাউসে আমি এই লোকটাকেই 'বয়' হিসাবে কাজ করতে দেখেছি।

আসরাফ বিশ্রীভাবে হেসে উঠল। বলল—যদি আপনি আজ বাড়িতে

ফিরতে পারেন !

মানে ?—নাজমা প্রায় চীৎকার করে উঠল।

মানে—বলেই সেই লোকটি পকেট থেকে একটা অসম্ভব পাতলা ছোরার মত স্টিলেটো বার করে বলল—মিস টার্নার ! আমি আপনার আসরাফ নই। আপনি যে কে—তা বুঝতে আমার কিছুদিন সময় লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনার জন্যই ইয়েলিণ্ডা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ! আপনিই গোপনে আমাদের সব খবর শত্রুপক্ষকে দিয়ে দিতেন। আবু জাকারিয়া বা বেলোক্লিফ ছিলেন আমাদের একজন স্তম্ভের মত। আপনার জন্যই তিনি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তাকে যখন আমরা হত্যা করা স্থির করেছিলাম তখন আপনিই তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন—যার জন্য তিনি আমাদের হাতের মুঠো থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছেন ! মিস্ টার্নার, আজ আপনার শেষ দিন।—

নাজমা বলে উঠল—মিথ্যা কথা, আসরাফ—

আসরাফের হাতের স্টিলেটো সেই অন্ধকারেও ঝকমক করে উঠল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সেই মুহূর্তেই সে সেই ছোরাটা নাজমার বুকে বসিয়ে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে পড়লাম। স্টিলেটো সমেত আসরাফের হাতটা নামার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

চকিতে যেন কি হয়ে গেল। পিঠে এক অসহ্য যন্ত্রণা—যেন হাজার কেউটে সাপ এক সঙ্গে সর্বাঙ্গে বিষ ঢেলে দিয়েছে।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ—নাজমার।

সেই টিলাটা তখন দুলছে, কালো আকাশটা আস্তে আস্তে নীচে নেমে আসছে। কানের কাছে কে যেন সাইরেন বাজিয়ে চলেছে। চোখ দুটোয় সমুদ্রের জল।—

স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আমার পা দুটো যেন ভেঙে যাচ্ছে—জানি পড়ে

যাচ্ছি। সেই সঙ্গে আর একজন কে যেন ছুটে এল। একটা চীৎকার —শয়তান! আসরাফ!—

তারপর একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি এবং একটা শব্দ।—কে যেন পড়ে গেল সমুদ্রে!

একটা ঠাণ্ডা হাত তার নরম বুকে আমাকে টেনে নিল। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজলাম। মৃত্যুর মত এক নিবিড় অন্ধকার আমার চোখে ভিড় করে এল। বুকভরা এক অসীম প্রশান্তি।

এক বিষণ্ণ অবসাদের মধ্যে জ্ঞান হল। সর্বাঙ্গে বেদনা, পিঠ থেকে বুক পর্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা। এক নতুন পরিবেশের মধ্যে আমি। আমি কোথায়, কি ভাবে এখানে এলাম, কি হয়েছিল—প্রথমে কিছুই মনে পড়ল না। তারপর আস্তে আস্তে মনে পড়ল সেদিন সন্ধ্যাবেলার কথা—রৌস সমুদ্রতট, ছুরি হাতে আসরাফ, নাজমার আর্তনাদ—কে যেন সমুদ্রে পড়ে গেল!

কি এক অসীম শক্তি যেন সারা দেহে এসে গেল। আমি বিছানায় উঠে বসলাম। নাজমা! নাজমা কোথায়!

একটা শক্ত হাত আমাকে ধরে জোর করে আবার বিছানায় শুইয়ে দিল। ডাক্তার!

চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। অস্ফুট স্বরে শুধু একটা কথা বলতে পারলাম—নাজমা!

ডাক্তার আস্তে আস্তে সরে গেলেন। তাঁর জুতোর শব্দ আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। তারপর একেবারেই থেমে গেল।

বুঝলাম সব। ডাক্তারের নীরব প্রস্থানেই সব কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল। নাজমা নেই। মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠল। আবার চোখের সামনে নিঃসীম শূন্যতা—সুদুঃসহ অন্ধকার—

এক শীতল স্পর্শে চোখ মেলে তাকালাম। কপালে হাত দিয়ে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে নাজমা। দুজনেরই চোখের জলে সুরু হল

নতুন পরিচয়।

এর পর সুস্থ হয়ে উঠতে আমার আর বেশি দেরি হয় নি। আঘাত গুরুতরই হয়েছিল, কিন্তু ডাক্তার ফৌজির শুশ্রূষা ও নাজমার সেবায় সহজেই বিপদ কাটিয়ে উঠলাম।

সেই রাতের কাহিনীর শেষটুকুও শুনলাম নাজমার মুখে।

আসরাফের হাত থেকে নাজমাকে রক্ষা করার জন্য আসরাফকে বাধা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ছোরাটা আমার পিঠে বসে যায়। পিঠ থেকে প্রায় বুক পর্যন্ত কেটে যায়। আমি রক্তাক্ত দেহে পড়ে যাই। ভয়ে চীৎকার করে ওঠে নাজমা। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন লোক ছুটে আসে সেখানে। সে আর কেউ নয়—আমাদের আবু জাকারিয়া বা বেলসন বা বেলোক্লিফ। বেলসন ঝাঁপিয়ে পড়ে আসরাফের ওপর। তুজনের ধ্বস্তাধ্বস্তি—এবং পা পিছলে তুজনেই পড়ে যায় সমুদ্রের মধ্যে। তারপর আর তাদের দেখতে পাওয়া যায় নি।

নাজমার কাছ থেকেই আরও শুনলাম যে আবু বুঝতে পেরেছিলেন যে আসরাফ এবং শিনবেটের লোকেরা তাঁকে সন্দেহ করেছে এবং তু-একদিনের মধ্যেই হত্যা করবার চেষ্টা করবে। সেইজন্য সেইদিনই তিনি সকালে কফি হাউস বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মগোপন করেন। তিনি গোপনে নাজমাকে টেলিফোন করে জানিয়েছিলেন যে শিনবেট নাজমাকেও হত্যা করতে কুণ্ঠিত হবে না। সেইজন্য নাজমা বাড়িতে পাহারা বসিয়েছিল। বোধহয় আবুও নাজমার ওপর নজর রেখে-ছিলেন এবং তিনিও দূর থেকে সমুদ্রের ধারে আমাদের লক্ষ্য করছিলেন। আসরাফকে আমাদের কাছে আসতে দেখেই তিনিও বোধহয় পিছন পিছন উপস্থিত হয়েছিলেন।

নাজমা বলল—এই বেলোক্লিফ আমার বাবাকে হত্যা করেছিল, অথচ সে নিজের প্রাণ দিয়ে আমাকে আর তোমাকে রক্ষা করল! কি অদ্ভুত মানুষের প্রকৃতি!

সারা সেপ্টেম্বর মাস কেটে গেল বিছানায় শুয়ে।

এর মধ্যে সুদানের রাজধানী খার্তুমে হয়ে গেল আরব শীর্ষ-সম্মেলন। আরব-ইজরায়েলের সম্পর্কের উন্নতির কোন পথ আবিষ্কৃত হল না। রাষ্ট্রসঙ্ঘকে দেওয়া হল সব দায়-দায়িত্ব। মিশর বন্ধ রাখবে সুয়েজ খাল। এর জন্য তার যে ক্ষতি হবে সে ক্ষতিপূরণ করবে অন্য আরব-রাষ্ট্র। জর্ডনও এই যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—তাকেও অন্যান্য রাষ্ট্র অর্থ সাহায্য করতে স্বীকৃত হল। এই অর্থ আসবে পেট্রোল বিক্রি করে, সুতরাং পাশ্চাত্য দেশকে খনিজ তেল সরবরাহ করা আবার চালু হল। ইয়েমেন নিয়ে নাসের আর সৌদি আরবের রাজা ফয়জলের মধ্যে মনোমালিন্য অনেক দিনের। সুদানের প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ মাহগুব এই দুইজনকে সুদান হোটেলে এক নিভৃত কক্ষে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করার ব্যবস্থা করে দিলেন। আরব সংহতির জয় হল। নাসের ও ফয়জল ইয়েমেন-সমস্যার মীমাংসায় উপনীত হলেন।

সাধারণ লোকের কাছে সুদানে আরব-শীর্ষ সম্মেলন বিশেষ কোন নাটকীয় ঘটনা নয়। এই সম্মেলনে যে ইজরায়েল সম্বন্ধে কোন চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে না—সে কথাও সাধারণ লোকে জানত। কিন্তু তাদের জন্যও হঠাৎ এক বিরাট নাটক অনুষ্ঠিত হল। এই নাটকের নায়ক—নাসেরের প্রাণের বন্ধু আবদেল হাকিম আমের—ইজরায়েলের যুদ্ধ পর্যন্ত যিনি ছিলেন আরব যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী রাষ্ট্রপতি এবং সৈন্য-বাহিনীর সহ-সর্বাধিনায়ক এবং রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সামরিক বিপ্লবের অন্যতম হোতা।

যুদ্ধের পরই সামরিক কাজে অবহেলা এবং গাফিলতির জন্য নাসের প্রায় সাতশ জন জেনারেল এবং অন্যান্য অফিসারদের হয় অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করেন, নয় চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। এই সব সামরিক অফিসার নাসেরের ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। আমের যদিও নাসেরের সঙ্গে সঙ্গে নিজেই পদত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু

নাসের পুনরায় রাষ্ট্রপতি হওয়া সত্ত্বেও আমেরকে তাঁর প্রাক্তন পদে ফিরিয়ে না নেওয়াতে তাঁরও অভিমান এবং ক্ষোভ কম নয়। নাসের সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও সৈন্যবাহিনী প্রকৃতপক্ষে ছিল আমেরের কর্তৃত্বাধীনে। সুতরাং এই বিক্ষুব্ধ অফিসাররা সান্ত্বনার আশায় এলেন আমেরের কাছে।

আমেরিকার কলাম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সিস্টেম প্রথমে খবর দেয় যে নাসেরকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। আলেকজান্দ্রিয়ায় নাসেরকে হত্যা করার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু মিশরের নিরাপত্তা পুলিশবাহিনী সেই ষড়যন্ত্র অঙ্কুরেই বিনাশ করে।

খার্তুমে যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায় নাসের আমেরকে নৈশ-ভোজনের নিমন্ত্রণ করলেন। একই সঙ্গে তাঁরা মিলিটারি এ্যাকাডেমিতে পড়েছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে একই সঙ্গে তাঁরা সুদানে ছিলেন, একই সঙ্গে তাঁরা বিপ্লবের পরিকল্পনা করেছেন, বিপ্লবের সাফল্যের পর নাসের হয়েছেন রাষ্ট্র-প্রধান, তিনি তাঁর সহকারী। মিশরে নাসের এক নম্বর, আর আমের দুই নম্বর।

নাসের হয়তো আঁচ করেছিলেন যে তাঁর অনুপস্থিতির সময় এক সামরিক অভ্যুত্থান হতে পারে। সুতরাং তিনিই প্রথম আঘাতের সঙ্কল্প করলেন। সেই ভোজ-সভায় নাসের আমেরকে জানালেন যে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সেই সঙ্গে কায়রোর শহরতলি গিজাতে সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে সৈন্যবাহিনী আমেরের বাসভবন ঘিরে ফেলে সেই বাড়ি থেকে শতাধিক সামরিক অফিসারকে গ্রেফতার করল। এই দলের মধ্যে পড়লেন প্রাক্তন যুদ্ধমন্ত্রী সামসেদ দিল বাদরান।

আবদেল হাকিম আমেরের জন্ম হয়েছিল ১৯১৯ সনে। কায়রোর সামরিক কলেজে তাঁর সামরিক শিক্ষা। ১৯৩৯ সনে তিনি সেকেণ্ড লেফটনান্ট হিসেবে সামরিক কলেজ থেকে পাশ করেন এবং ১৯৪৮ সনে স্টাফ অফিসারস্ কলেজ থেকে স্নাতক হন। ১৯৪৮ সনের প্যালে-

ষ্টাইনের যুদ্ধে তিনিও নাসেরের মত রণাঙ্গণে যান এবং আহত হন। ফ্রি অফিসারস দলের প্রধানদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন এবং ফারুকের বিরুদ্ধে বিপ্লবের পরিকল্পনায় নাসেরের পরেই ছিল তাঁর স্থান। বিপ্লব জয়যুক্ত হলে বিপ্লব পরিষদের নেতারা তাঁদের সামরিক পদ ত্যাগ করেন, কিন্তু ১৯৫৩ সনে মেজর আমেরকে নাসের জেনারেল পদে উন্নীত করেন এবং ১৯৫৮ সনে তিনি হন ফিল্ড মার্শাল। ১৯৫৬ সনের সুয়েজ যুদ্ধে তিনিই ছিলেন মিশরীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। এর পর থেকেই তিনি রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন। প্রেসিডেন্ট নাসের তাঁকে সিরিয়া এবং ইয়েমেন সমস্যায় তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে পাঠান। এর পর তাঁর দ্রুত পদোন্নতি হতে থাকে। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সন পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কাউন্সিলের সদস্য, আরব যুক্তরাষ্ট্রের সহ-রাষ্ট্রপতি এবং মিশরবাহিনীর সহ-সর্বাধিনায়ক। রাশিয়ার কাছ থেকে 'হিরো অব দি সোভিয়েট ইউনিয়ন' সম্মানও তিনি লাভ করলেন।

১৯৬৭ সনের এই আরব-ইজরায়েল যুদ্ধেও তিনি সর্বাধিনায়ক। যুদ্ধে পরাজয়ের পর নাসের যখন পদত্যাগ করলেন তখন আমেরও তাঁর সমস্ত পদ ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন।

এই গ্রেফতারেই কাহিনীর শেষ হল না। মিশরের নিরাপত্তা পুলিশ-বাহিনী ষড়যন্ত্রের সূত্রের সন্ধানে তাঁকে প্রতিদিন নানারকম প্রশ্নবাণে জর্জর করে তুলছিল। আমের আর পূর্বেকার আমের ছিলেন না। রাজনৈতিক জীবনে এসে একটু নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও আর আগেকার মত নিষ্কলুষ ছিল না। আমের পুলিশের কাছে টানাপোড়েন আর সহ্য করতে পারছিলেন না। একদিন পুলিশ আসতে দেখে তিনি কতগুলো বিষাক্ত বড়ি গিলে ফেলেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আপ্রাণ চেষ্টায় তাঁর জীবন রক্ষা করা হল। পুলিশ প্রহরায় তিনি আবার বাড়ি ফিরে এলেন। এসেই ঢুকলেন বাথরুমে। সেখানে তিনি আরো কতগুলো বিষ-বড়ি খেয়ে

আত্মহত্যা করলেন।

যাঁরা নাসেরকে জানেন না, তাঁরা আমেরের আত্মহত্যার জন্য নাসেরের ওপর দোষারোপ করলেন। কিন্তু নাসের এই আত্মহত্যা চান নি। অনর্থক রক্তপাত বা হত্যায় তিনি কোনদিনই বিশ্বাসী নন। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এত বড় বিপ্লবে রক্তক্ষয় একেবারে হয় নি বললেই চলে। অন্যান্য আরব-রাষ্ট্রে যেখানে পদচ্যুত রাজা বা শাসক-গোষ্ঠিকে হত্যা করা হয়েছে, মিশরে নাসের রাজা, ফারুক এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের গায়ে হাত তোলেন নি। খালেদ মহিয়েদ্দিন যখন জেনারেল নেগুইবের পক্ষে বিপ্লব পরিষদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তখন তাঁর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয় নি, তাঁকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। কিন্তু নাসের খালেদকে আবার মিশরে ফিরিয়ে এনেছিলেন। ১৯৬৪ সনে তাঁকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করেন এবং শেষ পর্যন্ত খালেদ মহিয়েদ্দিনকে অল-আখবর পত্রিকা-গোষ্ঠির ডাইরেক্টর বোর্ডের চেয়ার-ম্যান পদ দেন। নাসেরকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে জেনারেল নেগুইবের যোগসাজস ধরা পড়লেও নাসের নেগুইবকে পদচ্যুত ছাড়া আর কিছুই করেন নি। সুতরাং আমেরের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হত না, বিশেষত আমের যেখানে নাসেরের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আর হলও তাই। আমেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ভারপ্রাপ্ত অফিসারই নাসেরের আদেশে কারারুদ্ধ হলেন।

মিশরের লোকে বলাবলি করল: মিশরের জন্য আমের মাত্র দুটি ভাল কাজ করে গেছেন—নাসেরের সঙ্গে একত্র হয়ে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সফল বিপ্লব এবং এই আত্মহত্যা।

২০

পাঁচ মাস পরে আবার কলকাতা।

যেন পাঁচ বছর পরে আবার ফিরে এলাম আমার চিরকালের পরিচিত শহরে।

চিনতে অসুবিধা হয়। সেই পথ, সেই বাড়ি, সেই বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি, গাড়ি—কিন্তু নিষ্প্রাণ। কলকাতা নগরী হঠাৎ যেন তার যৌবন হারিয়ে ফেলেছে। আর পথে নেই মিছিলের জৌলুষ, নেই সেই শ্লোগানের তুবড়ি—কলকাতা থেকে বোধহয় সব বেইরুতে চালান হয়ে গিয়েছিল। ঐতিহ্যহীন এ কলকাতা।

এখনো আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারি নি, তবু কলকাতা চলে আসতে হয়েছে। আসতে আমার হতোই, হয়তো বছর খানেক বাদে ইউরোপ পরিক্রমা শেষ করে, নাজমার সঙ্গে। কিন্তু হঠাৎ চাকরি ছাড়াতে বোম্বের ফিল্ম কোম্পানি তাদের এগ্রিমেণ্ট দেখিয়ে সমস্ত কাজের হিসাব বুঝিয়ে দিতে বলল। ছয় মাসের কাজের কণ্ট্র্যাক্ট তাদের সঙ্গে—মধ্য-প্রাচ্যের সঙ্গে যৌথ ছবির ব্যবসার কথা তারা ভুলতেও পারে না এবং উচিতও নয়। তা ছাড়া ভারতবর্ষে আমার একদিন ফিরতে তো হতোই—তখনও এই ফিল্ম কোম্পানিগুলোর দিকেই আমায় তাকিয়ে থাকতে হবে। কলকাতার এক প্রোডিউসার একটা ছবির পরিচালনার জন্য লোভ দেখিয়ে নিমন্ত্রণও করলেন। সুতরাং চলো কলকাতা!

নাজমা আসতে পারল না আমার সঙ্গে। দামাস্কাস, বাগদাদ আর বেইরুতে তার যে সম্পত্তি আছে তা বিক্রি করে টাকাকড়ি কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করতে আরো মাস দুয়েক লাগবে। তাকে ছুটোছুটি করে বেড়াতে হবে ইরাক, সিরিয়ায়, লেবাননে। আমি চুপচাপ বসে থেকেই বা কি করব? নাজমা আমাকে একা পশ্চিম এশিয়ায় রাখতেও

চায় না।

ডাটনের কোন সংবাদ নেই। আলি তার নতুন ঠিকানা দিয়ে একটা চিঠি লিখেছিল। কলকাতায় ফিরে আসার আগে দুজনকেই দুটো চিঠি লিখলাম।

দিন কুড়ি পরে ডাটনের একটা চিঠি পেলাম :

সেন,

আপনার ছোট্ট চিঠি পেয়ে খুশি হলাম।

বেইরুতে আমার কাজ বাকী ছিল, ফিরে যাওয়ার কথাও ছিল ; কিন্তু ওখানে ফিরে যেতে আর ইচ্ছা করে নি। মধ্য-প্রাচ্যের কোথাও থাকতে আমার আর ইচ্ছা হয় নি। কোম্পানিকে বলে আমি ওই অঞ্চল থেকে বদলি হয়েছি। এখন আছি ছুটিতে। এবারে বোধহয় ল্যাটিন আমেরিকায় যেতে হবে।

যে-যুদ্ধ দেখবার জন্য আমি তেল আভিভে ছুটে এসেছিলাম, তা আমি দেখতে চাই নি। ইজরায়েলের যে মূর্তি আমি দেখলাম তারপর আর আরবভূমিতে মাথা তুলে যেতে পারি নি। আপনাদের চিঠি লিখতেও ইচ্ছা করে নি।

আমি রাজনীতি বুঝি না, রাজনীতি নিয়ে খেলাও করি না ; কিন্তু এখানে এসে ইজরায়েলিদের সঙ্গে কথা বলে মিশে দেখলাম—এই যুদ্ধ ইজরায়েলিরাও চায় নি। এই যুদ্ধের দুটি কারণ—এক হয়েছে এশকোল আর দায়েনের মধ্যে প্রধান মন্ত্রিত্বের লড়াই, আর দ্বিতীয় কারণ—আমেরিকান ইহুদি-সমাজ, যারা তেল আভিভের সবচেয়ে দামী হোটেলে এসে উঠে দামী গাড়িতে করে ওয়েলিং ওয়ালে চোখের জল ফেলতে যান। তাঁরা চান না যে নোংরা আরবদের ছায়া তাঁদের পথে পড়ে। প্রধান মন্ত্রী এশকোল যদিও মিশরকে

শায়েস্তা করবেন বলে শাসাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি জর্ডনের বিরুদ্ধে এভাবে লড়াই করতেন না কিছুতেই। জর্ডনের রাজা হুসেনের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক। যখন জর্ডনের প্যালেস্টাইন-উদ্বাস্তুরা রাজা হুসেনের বিরুদ্ধে গোলমাল করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন এশকোল ঘোষণা করেছিলেন যে হুসেনের কোন ক্ষতি হলে ইজরায়েল বাহিনী জর্ডন আক্রমণ করবে। ঠিক সেই কারণেই এশকোলের প্রতিদ্বন্দ্বী দায়েন জর্ডনকে এভাবে শায়েস্তা করতে অগ্রসর হলেন।

৪ঠা জুন থেকেই আমি কেমন যেন বুঝতে পেরেছিলাম, যুদ্ধ আসন্ন। পরদিন সকালেই দেখলাম, যেখানে যত গাড়ি ছিল সব বোঝাই করে দলে দলে ইজরায়েলি সৈন্য আর রিজার্ভ সৈন্য ছুটে চলল। রেডিওয় ঘোষণা হল যে মিশর ইজরাইলকে আক্রমণ করেছে, কিন্তু লোকের মুখে মুখে শোনা গেল ঠিক তার উল্টো কথা। তারা জানতই যে ইজরায়েলি আক্রমণের পাকা ব্যবস্থা ছিল। সেদিন সারা তেল আভিভে সে কি উত্তেজনা, সে কি উন্মাদনা! সকলেই রেডিও নিয়ে বসে আছে—যুদ্ধের সংবাদ ছাড়া কোন সংবাদ নেই!

যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন জয়ের আনন্দে সমস্ত ইজরায়েল ভেঙে পড়ল। নাচ, গান, উৎসব—আর সবাই ছুটে চলল জেরুজালেমে, ওয়েলিং ওয়ালে মাথা রেখে একবার কেঁদে আসবে। সরকারি প্রচারে এই ইজরায়েলিদের মনে আরবদের সম্বন্ধে এমন ভ্রান্ত ধারণা করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তারা আরবদের অত্যন্ত ঘৃণা করতে শিখেছে। অথচ এদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত, অনেক বুদ্ধিমান যাঁরা—তারা এ কথা স্বীকার করেন এবং মনে করেন যে আমেরিকার জন্যই ইজরায়েল আরবদের সঙ্গে শত্রুতা করে চলেছে, যার ফলে আরব এবং ইজরায়েল—দুই দলের রাষ্ট্রই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

ইজরায়েল অধিকৃত অঞ্চলে আরবদের দুর্গতি দেখলে সত্যকারের দুঃখ হয়। ইজরায়েল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উনিশ বছর ধরে তারা নিজেদের বাসভূমিতে ইজরায়েলি সামরিক শাসনের অধীনে আছে। তাদের স্বাধীন সত্ত্বা বলতে কিছু নেই। এবং সব চেয়ে আশ্চর্যের ও দুঃখের কথা এই যে, প্যালেষ্টাইনের যে আরবনেতা আহমেদ শুকিয়ারিকে বাইরের লোকেরা এক মহান নেতা বলে মনে করেন, তাঁকেই এঁরা মনে করেন যে ইহুদিদের দালাল।

ছবিতে ছবিতে কি দেখেছেন কত মিশরীয় সৈন্য সিনাই মরুভূমিতে মরে পড়ে আছে! এদের সম্বন্ধে যে-সব কথা শুনেছি, তা লিখতেও শিউরে উঠতে হয়। যুদ্ধে বন্দী সৈন্যদের নিয়ে এসে নিরস্ত্র করে তাদের এক জায়গায় রাখা হয়; কিন্তু ইজরায়েলি বাহিনী তা করে নি। যুদ্ধে নিহত হয়েছে অল্প, কিন্তু যুদ্ধের পর এরা মেরেছে অনেক বেশি মিশরীয় সেনা। বন্দী সেনাদের কাছ থেকে জল, খাবার সব কিছু কেড়ে নিয়ে মরুভূমির মধ্যে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় পাগলের মত তারা উত্তপ্ত মরুভূমিতে একটু একটু করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। অনেকে ছুটে যেতে চেয়েছে সুয়েজের দিকে, অনেকে পথ ভুল করেছে—সকলেরই কবর হয়েছে সিনাই মরুভূমি।

প্লেনে করে আমি একদিন গিয়েছিলাম চারদিক দেখতে। অধিকৃত জর্ডন, জেরুজালেম ছেড়ে দলে দলে আরব—শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী—প্রাণভয়ে ছুটে চলেছে। উত্তপ্ত বালুতে তাদের ক্লান্ত দীর্ঘ ছায়া। সম্মুখে পেছনে সেই চলমান ছায়ার আর শেষ নেই। যেন এই কালো ছায়ার মরুপথ ধরে অনন্ত যাত্রার কোনদিন শেষ হবে না।

আর ওপরের অগ্নিময় তামাটে আকাশে মৃত্যুর উজ্জ্বল ইসারা।

শবলুব্ধ শকুনের উৎসুক মিছিল। তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিনীচের সঞ্চরণ-শীল আরব উদ্বাস্তুদের ওপর স্থির-নিবদ্ধ। এ কথা নতুন উদ্বাস্তু-রাও জানে, অথচ পরিত্রাণ নেই। শকুনের হাত এড়ানো যাবে না। ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে। হাজার হাজার বৎসর পূর্বের আদিম বেতুইনেরা তাদের রক্তজ যাযাবর-বৃত্তি ত্যাগ করে ঘর বেঁধেছিল, কিন্তু কপালে তা সইল না। আবার নতুন করে তাদের সেই পুরাতন যাযাবর-বৃত্তি গ্রহণ করতে হল।

চিঠিতে এদের দুর্দশার সম্বন্ধে কিছু লেখা যাবে না, কিছু বোঝানো যাবে না। না দেখলে বুঝতে পারবেন না, কি রকম অভিশপ্ত এদের জীবন! জার্মান-অত্যাচারে নিপীড়িত ইহুদি-দের দুর্দশায় যাঁরা ছিলেন সোচ্চার, আজ ইহুদি-অত্যাচারে নিপীড়িত আরবদের দুর্দশায় কারো সাড়া পাওয়া যায় না।

এই সব দেখে নিজের ওপর এক ঘৃণা এসে গিয়েছে। এ মুখ নিয়ে আমি পরিচিত কারুর সামনে দাঁড়াতে পারব না। আপনার সঙ্গে আর আমার কোনদিন দেখা হবে না। আর চিঠিও লিখবেন না। বিদায়।

হার্ড ডাটন।

দিন দু'য়েক পরে বেইরুত থেকে আর একটা চিঠি। লিখেছেন ঘালি এ্যাণ্ড কার্মানি, সলিসিটর্স।

প্রিয় মিঃ সেন,

আমরা মিসেস্ নর্মা শেরমানির সলিসিটর। -

মিসেস্ শেরমানি গত ২রা অক্টোবর একটি মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। তাঁর নতুন উইল অনুযায়ী আপনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। আপনার উপদেশ পাইলে সেইসব সম্পত্তির আমরা যথাবিহিতব্যবস্থা করতে পারি।

ঘালি এ্যাণ্ড কার্মানি।

চিঠিটা হাত থেকে পড়ে গেল। কুড়িয়ে নেওয়ার শক্তিও আমার আর ছিল না। চোখের সামনে ভেসে উঠল শুধু নাজমার মুখ, কানে বাজতে লাগল তার কথা।

নাজমাকে নিয়ে থাকার জন্য এই নতুন ভাড়া বাড়িটা এতদিন মনে হত কত ছোট। কিন্তু এখন যেন এই ফাঁকা বাড়িটা আমাকে গ্রাস করার জন্য ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল।

প্যালেস্টাইনের আরবদের মত কলকাতার এক কোনে এই বড় বাড়িটাতেও সৃষ্টি হল আর এক উদ্বাস্তুর।

—শেষ—